সবজীবাগ

নবম সংস্করণ

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে প্রণীত

মূল্য এক টাকা মাত্র

সব্‌জীবাগ

(নবম সংস্করণ)

কৃষিক্ষেত্র, মৃত্তিকাতত্ত্ব, ভূমিকর্ষণ, প্রভৃতি রচয়িতা

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে

Late Fellow of the Royal Horticultural Society of London:
Late Superintendent of Gardens and Farms, Raj-
Durbhanga ; the Nizamat Gardens Murshedabad ;
Chaluvamba Vilas Park, Mysore ; formerly
of the Cossipur Institution of
Horticulture &c, &c,

প্রণীত

All rights Reserved.]

মূল্য এক টাকা মাত্র।

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

অবতরণিকা (১) ... ১
ঐ (২) ... ৩
ঐ (৩) ... ৫
ঐ (৪) ... ৯
ঐ (৫) ... ১১

দ্বিতীয় অধ্যায়

চৌকা ও পাটি ... ১৬

তৃতীয় অধ্যায়

ভাঁটী ... [illegible]

চতুর্থ অধ্যায়

বীজসংগ্রহ ও বীজ রক্ষা ২৩

পঞ্চম অধ্যায়

বীজ বপন ... ২৫
বপনের সময় ... ২৯
বীজের প্রকৃতিভেদ ... ৩১
বীজ অঙ্কুরিত হয় না কেন ? ৩২
চারা ... ৩৬

ষষ্ঠ অধ্যায়

ক্ষেত্রে চারা রোপণ ৩৯

সপ্তম অধ্যায়

সব্জীবাগের শত্রু ও মিত্র ৪১

অষ্টম অধ্যায়

সব্জীর প্রয়োজনীয়তা ৪৬

নবম অধ্যায়

বাঁধা কপি ... ৫৩
ফুল কপি ... ৫৯
ওল কপি ... ৬২
শালজম ... ৬৩
গাজর ... ৬৪
ব্রকোলি ... ৬৭
ব্রসেল্স ... ৬৯
লেটিউস্ ... ৭১

দশম অধ্যায়

মূলজ উদ্ভিদের চারা উৎপাদন ৭৩
লীক ... ৭৭
পলাণ্ডু বা পেঁয়াজ ...
গন্ধন বা গন্দিনা ... ৮১
লষুণ ... ৮১

একাদশ অধ্যায়

মটর বা কলাই সুঁটা ৮২
টমেটো বা বিলাতী বেগুণ ৮৫
গোল আলু ... ৮৮
বীন ... ৯৩
আর্টিচোক ... ৯৪
বার্ত্তাকু ... ৯৭
বাকূলা ... ১০৫
বিলাতী বাকূলা ... ১০৬
মূলা ... ১০৬
স্যালসিফি ... ১০৯
পারস্নিপ ... ১১০
মৌরী ... ১১১
শুল্ফা শাক ... ১১২
কালজিরা ... ১১২
বেতুয়া বা বেতোশাক ১১২
পালঙ ... ১১৩
চুকা পালঙ ... ১১৫
বরবটী ... ১১৫
সীম ... ১১৬
মাখন সীম ... ১১৬
চারকোণা সীম ... ১১৭
স্কোয়াস ... ১১৮
জীরা ... ১২০
শসা ... ১
লাউ ...
ভুট্টা ... ১
লঙ্কা ... ১
সেলেরি ...
আম-আদা ...
মেথি ...
ধন্যা বা ধনিয়া ...
পুদিনা ...
পিপারমেন্ট ...
টাইম ...

দ্বাদশ অধ্যায়

নটেশাক ...
ডেঙ্গো ...
লালশাক ...
পুতিকা বা পুঁই ...
বিলাতী বা মিঠে-কুমড়া
সাঁচি বা চাল-কুমড়া
তেলাকুচা ...
কাঁকুড় ...
ঝিঙ্গে ...
পটোল ...
উচ্ছে ...
করলা ...

ধুঁধুল ... ১৬২
চিচিঙ্গা ... ১৬৩
ঢেঁড়স ... ১৬৪
মেস্তা বা লাল-অম্বরী ১৬৫
শজিনা ... ১৬৫

ত্রয়োদশ অধ্যায়

চুবড়ী আলু ... ১৬৭
রাঙ্গা আলু ... ১৬৯
শকরকন্দ আলু ... ১৭১
মানক বা মানকচু ... ১৭৩
শোলাকচু ... ১৭৬
পঞ্চমুখী কচু ... ১৭৬
মুখীকচু ... ১৭৭
ওল ... ১৭৯

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

তরমুজ ... ১৮১
খেঁড়ো ... ১৮৫
খরমুজা ... ১৮
ফুটি ... ১৮৭
টেঁপারী ... ১৮৮
শাঁকালু ... ১৮৯
ষ্ট্রবেরি ... ১৯০
কেশুর ... ১৯৩

পঞ্চদশ অধ্যায়

প্রদর্শনী ... ১৯৪
প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য ও
উপকারিতা ... ১৯৭

সব্‌জীবাগ

প্রথম অধ্যায়

অবতরণিকা

(১)

সব্‌জীবাগের জন্য বারমেসে জমীর প্রয়োজন। উচ্চতা বা নিম্নতা অনুসারে ভূমি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। যে ভূমিতে বারমাসই আবাদ হইতে পারে তাহাকে 'বারমেসে', যে জমীতে সম্বৎসরে দুইবার আবাদ হইতে পারে তাহাকে 'দো-ফসলে', এবং যে জমীতে একবার মাত্র আবাদ হইতে পারে তাহাকে 'এক-ফসলে'-জমী কহে। উচ্চনিম্নতানুসারে শ্রেণীনির্দ্দেশ হইয়া থাকে। অতিরিক্ত জল সঞ্চিত হইয়া যে জমী অগ্রহায়ণ মাস বা পৌষ মাস পর্য্যন্ত ডুবিয়া থাকে তাহাই এক-ফসলে জমী, কারণ তাহাতে একটী ফসলের অধিক আবাদ চলে না। 'ভাদুই' ফসল যে জমীতে জন্মিয়া থাকে, তাহাকে দো-ফসলে জমী বলা যায়। যে সময়ের যে সব্‌জী, তাহা উৎপন্ন করিতে হইলে বারমাস যে স্থানে আবাদ করা চলিতে পারে, এরূপ স্থান নির্ব্বাচন না করিলে সমূহ বিপত্তি ঘটিবার সম্ভাবনা। ইহাতে প্রতিনিয়ত দেখা যায় যে, সামান্য বৃষ্টিপাতেই অনেক জমী ডুবিয়া যায় কিম্বা বৃষ্টির অল্পতাপ্রযুক্ত নীরস ও কঠিন হইয়া ফসলের অনিষ্টসাধন করিয়া থাকে।

ভূমি নির্ব্বাচন সম্বন্ধে আরও কয়েকটী বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। জমীর মধ্যে বিস্তৃত আওতা বা ছায়া না থাকে, জমী অতিরিক্ত উচ্চ বা ডোবা না হয় এবং অতিরিক্ত বর্ষার সময় ক্ষেত্রে যে জল সঞ্চিত হয়, তাহা অনায়াসে নির্গত হইয়া যাইতে পারে তাহার উপায় করিতে হইবে। এজন্য ক্ষেত্রের চারিদিকে অথবা ঢালুদিকে পগার থাকা উচিত। এতদ্ব্যতীত ক্ষেত্রের মধ্যে বা সন্নিকটে জল আয়োজন রাখিতে হইবে। সব্জীক্ষেত্রে প্রায় সর্ব্বদাই জলের আবশ্যক হইয়া থাকে। ক্ষেত্র হইতে অধিক দূরে পুষ্করিণী বা কূপ থাকিলে তাহা হইতে জল তুলিয়া ক্ষেত্রে আনিতে অনেক খরচ পড়ে এবং অনেক সময়ে পরিশ্রম নষ্ট করিতে হয়।

গো, মহিষ, ছাগ প্রভৃতি জন্তুগণ অনেক সময় সব্জীক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া বিশেষ ক্ষতি করিয়া থাকে, সুতরাং তাহাদিগের উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ক্ষেত্রের চারিদিকে ৩।৪ হাত উচ্চ করিয়া বেড়া দেওয়া উচিত। বেড়ার জন্য মেদি, শিয়ালকাঁটা, ভেরেণ্ডা, রাংচিত্রা, কামিনী, ডুরেণ্টা প্রভৃতি গাছ বিশেষ উপযোগী। এই সকল গাছ শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া উঠে এবং যতই ছাঁটিয়া দেওয়া যায়, ততই ঘন হইয়া থাকে। জিওল গাছেও উত্তম মজবুত বেড়া হইয়া থাকে। বয়োবৃদ্ধিসহকারে ইহাদিগের কাণ্ড সকল স্থূলতা প্রাপ্ত হইলে বেড়া অধিকতর মজবুত ও দৃঢ় হয়। উল্লিখিত গাছসকল রোপণ করিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না অথবা তাহা ব্যয়সাপেক্ষও নহে। স্থানান্তর হইতে বর্ষাকালে উহাদিগের শাখা কাটিয়া আনিয়া পুঁতিয়া দিলে একমাসের মধ্যেই শাখা-প্রশাখা উদ্গত হইয়া থাকে। তখন তাহাদিগকে চেরা বাঁশ বা কঞ্চির দ্বারা বাঁধিয়া দিতে হয়

ক্ষেত্র বিস্তৃত হইলে, তাহাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা উচিত। সাধারণতঃ এদেশে বৎসর মধ্যে তিনটী সব্জী ফসল জন্মিয়া থাকে। শীত, গ্রীষ্ম

ও বর্ষা—এই তিন ঋতুতেই ফসলগুলিকে বিভক্ত করা যায়। কপি, শালগম, গাজর, বীট, মূলা, সীম, পেঁয়াজ, লসুন, মটর, লাউ প্রভৃতি শীতকালের তরকারী। কুমড়া, ঢেঁড়স, কুলি-বেগুণ, পটোল, নটে ও ডেঙ্গো শাক প্রভৃতি গ্রীষ্মকালের তরকারী, এবং উচ্ছে, চিচিঙ্গা, ধুঁন্দুল, ঝিঙ্গে প্রভৃতি বর্ষাকালের তরকারী। একই নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে বারমাস সব্জীর আবাদ করিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয় না, অধিকন্তু এক ফসলের সময় সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ না হইতেই পরবর্ত্তী ফসলের আবাদ করিবার সময় অতিবাহিত হইয়া যায়। এই সকল কারণে তিন ঋতুর ফসলের জন্য তিনটা স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকা আবশ্যক। অবিশ্রান্ত একই ক্ষেত্রে পুনঃ পুনঃ আবাদের পক্ষে আর একটী আপত্তি—গুরুতর আপত্তি এই যে, এক আবাদ শেষ হইবার পরে তাড়াতাড়িবশতঃ যে কোন প্রকারে জমির পা'ট শেষ করিয়া দ্বিতীয়বার ফসল বুনিলে আশাজনক ফললাভ করিতে পারা যায় না। এক ফসল উঠিয়া গেলে, অন্ততঃ একমাসও সেই জমিকে বিশ্রাম দিয়া, পরে যথাবিধি প'াট করিয়া দ্বিতীয় ফসলের আবাদ করিতে হয়। এই সকল কারণ অতিশয় সামান্য বোধ হইলেও, অবশেষে যে ইহাই লাভ ও ক্ষতির মূলীভূত কারণ হইয়া থাকে, তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই বুঝেন।

অবতরণিকা

২

এই প্রস্তাবে আমরা দেখিব যে, ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা কি উপায়ে বৃদ্ধি করিতে পারা যায়। বহুল পরিমাণে সার প্রয়োগ করিলে ও বারম্বার হলচালনা করিলে ক্ষেত্র শস্যশালী হইয়া থাকে সত্য, কিন্তু তাহা পরের কথা।

কি উপায়ে মৃত্তিকার স্থায়ী উপকার সাধিত হইতে পারে, অগ্রে তাহাই বিবেচ্য।

বর্ষার জল ক্ষেত্রে অধিকক্ষণ না আটকাইয়া থাকে, ইহারই প্রতি প্রধান লক্ষ্য রাখিবে। ভূমি সমতল হইলেই যে উহা উৎকৃষ্ট হইল এরূপ মনে করা বিষম ভ্রম। সমতল ভূমিই অধিকতর দূষিত হইবার সম্ভাবনা। সমতল ভূমির জল-নিকাশ হইতে না পাইয়া ক্ষেত্র-মধ্যেই শোষিত হইয়া থাকে, তন্নিবন্ধন ভূগর্ভের উত্তাপ হ্রাস-প্রাপ্ত হয় এবং শৈত্যের আধিক্য হয়। নিম্নতল জমীতেও উত্তাপের অল্পতা হেতু তরিতরকারি উত্তম ভাবে জন্মিতে পারে না। এইজন্য সমতলতাই জমীর প্রশংসা-পত্র নহে। জমীকে ঈষৎ ঢালু বা গড়েন করিতে হইবে; কিন্তু তাহা অতি সাবধানে ও যত্ন-সহকারে করা উচিত। প্রথমতঃ, মৃত্তিকার গঠন পরীক্ষা করিয়া, পরে কিরূপ ঢালুতা তাহার পক্ষে প্রয়োজন তাহা স্থির করিতে হইবে। যে ক্ষেত্রের মৃত্তিকা অতিশয় লঘু ও জলশোষক (porous) তাহা ২০০ ফুটে ২।৩-ইঞ্চ ঢালু করিতে হইবে, কিন্তু কঠিনও এঁটেল জমীতে প্রতি ১৫০ ফুট ৩ ইঞ্চ নামাইলে ভাল হয়। উল্লিখিত প্রণালী অবলম্বিত হইলে ভূপৃষ্ঠোপরি দীর্ঘকাল জল সঞ্চিত থাকিবার তত আশঙ্কা থাকে না। অতঃপর জমীর নিম্ন-স্তরের (sub-soil) প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কেবল উপরি-স্তরের বা তলাচির (surface-soil) ৫।৭ বা ৮।১০ ইঞ্চ মাটির অবস্থা দেখিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া কোনও মতে উচিত নহে। অনেক স্থলে এরূপ দেখা যায় যে, উপরের মাটি চলনসই অথচ এক হাত নিম্নের মৃত্তিকা-স্তর এতই শক্ত এঁটেল যে, উপরিভাগের রস অধিক দূর নিম্নে প্রবিষ্ট হইতে পারে না কিম্বা শোষিত হইতে বিলম্ব হয়, তন্নিবন্ধন মাটি সর্ব্বদা অল্লাধিক সিক্ত থাকে এবং তাহাতে উত্তাপের অভাব উপলব্ধি হয়। নিম্নস্তরের মাটি যে কেবল এঁটেল হইতে পারে তাহা নহে, বালুকাময় হওয়াও অসম্ভব

নহে। নিম্নস্তর বালুকা-প্রধান বা কাঁকুরে হইলে উপরিস্তরের মাটিতে অতি সহজেই রসাভাব হয়।

ক্ষেত্রের মৃত্তিকা ২।৩ ফুট গভীর করিয়া কোদলাইয়া ও বারম্বার উলট-পালট করিয়া লইতে পারিলে স্থানীয় মাটীর যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইতে পারে। সব্জী-ক্ষেত্র হইতে নিরন্তর রাশি রাশি উদ্ভিদ্-খাদ্য নির্গত হইয়া যায়। ভূপৃষ্ঠের বহুপরিমাণ সূক্ষ্ম উদ্ভিদ্-খাদ্য রসের সহিত ভূগর্ভ মধ্যে নামিয়া যায়, কিন্তু স্বল্পজীবী তরিতরকারীর গাছপালা-সকল তাহা হইতে আহারীয় সংগ্রহ করিতে পারিবার পূর্ব্বেই মরিয়া যায় কিম্বা সংগৃহীত হয়। যে ক্ষেত্রে শৈত্য অধিক বা যে মাটি বেশী ভিজে, তাহা স্বভাবতঃই অল্পাধিক উত্তাপহীন কিম্বা তাহাতে উত্তাপের ভাগ অল্প বা নাই। তাহাকে খনন বা উলট-পালট করিয়া তবে স্থায়ীরূপে সব্জী-ক্ষেত্রে পরিণত করা উচিত, নতুবা নিম্নস্তরের দোষে উপরিভাগের মাটিও জড়বৎ হইয়া যায়। *

মৃত্তিকার ধারকতা (power of retention) বুঝিয়া জমীকে অল্পাধিক ঢালু করিতে হইবে, একথা পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে। মাটি যতই আল্‌গা অথচ দৃঢ় থাকিবে ততই তাহা সুর হইবে। কঠিন ও ঢেলা-বিশিষ্ট হইলে মাটি শুষ্ক ও নীরস হয়।

অবতরণিকা

৩

আবাদ করিবার পূর্ব্বে কয়েকটী বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ক্ষেত্রে গাছ বসাইবার অন্ততঃ ৫।৭ দিন পূর্ব্বে ভূমিকে উত্তমরূপে কর্ষণ ও মাটিকে চূর্ণ করিয়া রাখিতে হইবে। বিশ্বাসী বীজ-ব্যবসায়ীর

---

* মৎপ্রণীত 'কৃষিক্ষেত্রে' এ বিষয় বিশেষভাবে লিখিত হইয়াছে।

যায়। ইহার মধ্যে একটী কথা আছে। এক দিন বা দুই দিনের মধে জমীকে বারম্বার কোদাল দ্বারা কোপাইয়া বা লাঙ্গল দ্বারা চষিয়া চূ করিলে তাদৃশ উপকার হয় না। কেন না, ইহাতে সমুদয় মৃত্তিক অধিক্ষণ বাতাস বা সূর্য্যালোকের সংস্পর্শে থাকিতে পায় না, ফলত: উপরিভাগের মাটিরই কথঞ্চিৎ উপকার হইয়া থাকে।

এঁটেল মাটি হাল্‌কা করিতে হইলে, তাহাতে বালি-মাটি, পাতা-সার, পলি বা প্রাণীজ টাট্‌কা-সার প্রদান করা উচিত। কিন্তু ফস বুনিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে জমীতে টাটকা-সার প্রদান করিলে ক্ষেত্রে নানাবিধ কীট জন্মিয়া ফসলের ক্ষতি করে।

নিতান্ত বেলে-মাটির প্রকৃতি পরিবর্ত্তন করিয়া দোয়াঁশ করিতে হইলে, আবশ্যকমত এঁটেল-মাটি সংযুক্ত করা আবশ্যক।

বেলে-মাটির সহিত পুষ্করিণীর পাঁক-মাটি মিশ্রিত করিলে এক দিকে যেরূপ উহা হাল্‌কা হয়, অন্য দিকে সেইরূপ উর্ব্বরা হইয়া থাকে।

বাগানের জমীর পরিমাণ অল্প হইলে, এঁটেল বা বেলে-মাটির স্বভাব পরিবর্ত্তন করিয়া 'বারমেসে' বা সাধারণ ফসলোপযোগী করিয়া লওয়া আবশ্যক, কিন্তু জমীর পরিমাণ অধিক হইলে এরূপ আড়ম্বর করিয়া মাটি সংস্কার করিবার প্রয়োজন নাই, কারণ সেই সকল জমীতে যে ফসল জন্মিতে পারে, তাহারই জন্য উহা স্বতন্ত্র রাখিলেই চলিতে পারে।

এঁটেল-মাটি সূক্ষ্মপরমাণুবিশিষ্ট বলিয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত উহার মধ্যে রস সঞ্চিত থাকে, সুতরাং উহাতে শীত ও গ্রীষ্মকালেও ফসল জন্মিতে পারে, কিন্তু বর্ষাকালে শীঘ্র জল শুষ্ক হইতে না পারিয়া, জমীকে অত্যন্ত আর্দ্র করিয়া রাখে। উত্তাপের অল্পতা বা আধিক্যবশতঃ

ফসলও সমধিক আশানুরূপ হইতে পারে না। অন্য দিকে আবার বেলে-মাটি এত শীঘ্র নীরস হইয়া পড়ে যে, শীতকালে ও গ্রীষ্মকালে ধুলাবৎ হইয়া যায়। ইহাতে ফসলের বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে; কিন্তু মাটি দো-বরা অর্থাৎ দোয়াঁশ হইলে তাদৃশ ভয়ের কারণ থাকে না।

অবতরণিকা

৪

একই জমীতে বারমাস আবাদ না করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ঋতুর ফসলের জন্য ভিন্ন ভিন্ন জমী নির্দ্দিষ্ট রাখিতে পারিলে ভাল হয়। জমীতে আবাদ হইলেই তাহার অল্পাধিক সারাংশ হ্রাস পাইয়া থাকে, সুতরাং উপর্য্যুপরি তাহাতে আবাদ করিলে মাটি শীঘ্র হীনতেজ হইয়া পড়ে। একটী ফসল উৎপন্ন করিয়া লইয়া, যদি সে জমীকে কিছুদিন, অন্ততঃ ২।১ মাসও পতিত রাখা যায়, তাহা হইলে মৃত্তিকা বিশ্রাম পায়, এবং সেই অবসরে রৌদ্র, বায়ু ও শিশিরের সংস্পর্শে,—সম্পূর্ণরূপে না হইলেও, অনেক পরিমাণে উহা পূর্ব্বাবস্থাপন্ন হইয়া থাকে। ইহা সচরাচর দেখা যায় যে, কৃষকগণ অবিশ্রান্তভাবে জমী হইতে ফসল উৎপন্ন করিয়া জমীকে একেবারে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলে, অবশেষে সে জমী পরিত্যাগ করিয়া অন্য জমীর অন্বেষণ করে। কিন্তু জমীকে মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম দিলে সেরূপ ঘটিবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। কয়েক মাস জমী পতিত থাকিলে একদিকে যেমন তজ্জন্য খাজনার দায়ী হইতে হয়, অন্য দিকে

তেমনই পরবর্ত্তী ফসলের দ্বারা তাহা অপেক্ষা অধিকতর লাভবান হইবার আশা থাকে এবং অধিক লাভ হইয়া থাকে।

সকল জমীই যে এক ফসলের পরে পতিত রাখিতে হইবে তাহার কোন প্রয়োজন দেখি না। যে জমীতে নগণ্য শাকসব্জী জন্মিয়া থাকে, তাহা পতিত রাখিবার প্রয়োজন হয় না; তবে যে জমীতে অর্থকরী, মূল্যবান্ ও উপাদেয় তরকারীর আবাদ করিতে হইবে, সে জমীকে পতিত রাখা নিতান্ত প্রয়োজন।

এরূপ অনেক জমী আছে, যাহাতে সুচারুরূপে কোন ফসল জন্মে না; কিন্তু সেই জমীকে উর্ব্বরা করিবার জন্য তাহাতে নানাবিধ সার প্রয়োগের ব্যবস্থা আছে। এবম্প্রকারের জমীতে চূণ প্রদান করিলে মাটির অনেক দোষ সংশোধিত হইয়া যায়, মাটিও উর্ব্বরা হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত চুণ দ্বারাও এঁটেল মাটি আল্‌গা হইয়া থাকে।

ক্ষেত্র মধ্যে আগুন জ্বালাইয়া দিলেও তাহার অনেক উৎকর্ষ সাধিত হইয়া থাকে। ক্ষেত্র মধ্যে আগুন জ্বালাইতে হইলে প্রথমতঃ জমীকে একবার কোপাইয়া, পরে তাহার স্থানে স্থানে শুষ্ক তৃণ জঙ্গলাদি একত্র করিয়া আগুন দিতে হয়। সেই সকল জঙ্গলাদি যাহাতে প্রজ্বলিত না হইয়া, গুমাইয়া-গুমাইয়া পুড়িতে পারে, সেজন্য স্তূপের উপরে ও মধ্যে কাঁচা ঘাস বা জঙ্গলাদি মিশাইয়া দিতে হইবে। স্তূপের সমুদয় জঞ্জাল শুষ্ক থাকিলে সহজেই জ্বলিয়া উঠে, কিন্তু গুমাইয়া পুড়িয়া অর্দ্ধ-দগ্ধ হইলে জল সিঞ্চন দ্বারা নির্ব্বাপিত করিয়া দিলে যে অংশ অবশিষ্ট থাকে, তাহা পূর্ণদগ্ধ ভস্ম অপেক্ষা মূল্যবান্ হয়। ক্ষেতের মধ্যে অধিকক্ষণ বা অতিরিক্ত পরিমাণে আগুন জ্বলিলে আর একটী অনিষ্ট ঘটবার আশঙ্কা এই যে, মৃত্তিকান্তর্গত অনেক জৈব (organic) সারাংশ পুড়িয়া যায়, ফলতঃ মৃত্তিকা লোকসান হইয়া যায়। মাটী পুড়িয়া গেলে, তাহার মধ্যস্থিত কীটপতঙ্গাদি বিনষ্ট

হইয়া যায়, মাটীর দূষিত বায়ু সংশোধিত হয়, এবং মৃত্তিকায় কার্ব্বণের বা অঙ্গারের ভাগ বর্দ্ধিত হইয়া বায়ুমণ্ডল হইতে নাইট্রোজেন ও আমোনিয়া আকর্ষণ করে, তন্নিবন্ধন ক্ষেত্রের প্রভূত উপকার সাধিত হইয়া থাকে ।

অবতরণিকা

৫

সব্জীবাগে সাধারণতঃ গোয়াল বা অশ্ব-শালার আবর্জ্জনা, খৈল, লবণ, অস্থিচূর্ণ প্রভৃতি সার ব্যবহৃত হইয়া থাকে । প্রত্যেক সারের কার্য্য স্বতন্ত্র, সুতরাং স্বতন্ত্রভাবে তাহার আলোচনা করিতেছি । গবাদিজাত সার কিম্বা খৈল উত্তমরূপে না পচাইয়া কোন ফসলে ব্যবহার করা উচিত নহে । ঐ সকল সদ্য-আনীত সার ব্যবহৃত হইলে ক্ষেত্র নানাবিধ কীটপতঙ্গাদির আকর হইয়া উঠে । অনেকে ক্ষেত্রে চারা রোপণ বা বীজ বপন করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে মৃত্তিকার সহিত সার মিশ্রিত করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহা দ্বারা যে ঘোর অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে তাহা বোধ হয় তাঁহাদিগের জানা নাই । প্রথমতঃ দেখা যায় যে, উহা যত দিন পর্য্যন্ত না উত্তমরূপে পচিয়া যায়, ততদিন উদ্ভিদ্-শরীরে সারের কোন কার্য্য বা ফল হয় না । দ্বিতীয়তঃ নূতন সার-প্রদত্ত-স্থানে চারা বসাইলে, সেই সার বিগলিত হইবার সময় এতই উত্তপ্ত হইয়া উঠে যে, তাহাতে চারা গাছের প্রভূত অনিষ্ট হয় । অতঃপর দেখা যায় যে, সেই সার পচিয়া উদ্ভিদের আহরণের উপযোগী হইবার পূর্ব্বেই গাছ অনেক বড় হইয়া পড়ে ; ফলতঃ সেই সারের কার্য্য তৎসমুদয় উদ্ভিদের পক্ষে অধিক ফলপ্রদ হয় না । এই জন্য ক্ষেত্রে লাঙ্গল দিবার সময়েই এক দফা সার সংযোজিত করিলে জমীর পরবর্ত্তী পরিচর্য্যা-

কালে মাটির সহিত উহা মিশিয়া যায়। পরে ফসলের সময় যদি পুনরায় কোন সার দিবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে উত্তম অর্দ্ধ পুরাতন সার দিলেই চলিতে পারে। ক্ষেত্রে চারা রোপিত হইবার অন্ততঃ ১৫।২০ দিন পূর্ব্বে খৈল কিম্বা গবাদি পশুর সার সংযোজিত করা উচিত। অস্থিচূর্ণ বিগলিত হইতে ঋতুভেদে ২।৩ মাস হইতে ৫।৬ মাস সময় লাগে। বলা বাহুল্য, শীতকাল অপেক্ষা গ্রীষ্মবর্ষাদিতে অপেক্ষাকৃত শীঘ্র বিগলিত হয়।

লবণ-প্রয়োগে জমীর পোকা মরে এবং গোড়ায় অল্পাধিক পরিমাণে লবণ প্রদান করিলে গাছ অতি দ্রুতভাবে বাড়িয়া থাকে। লবণ সাধারণ সাররূপে গণ্য নহে; কিন্তু উহার সংযোগে মৃত্তিকান্তর্গত গলনীয় পদার্থ সকল অপেক্ষাকৃত শীঘ্র বিগলিত হয়। কোন কোন ফসলের পক্ষে লবণ বিশেষ উপকারী। লবণ-প্রয়োগে বিশেষ সাবধানতার প্রয়োজন। লবণের মাত্রা অধিক হইলে উদ্ভিদের ক্ষতি হইয়া থাকে। সাবধান, যেন গাছের মূলদেশে লবণ কোনওরূপে সংস্পৃষ্ট না হয়।

প্রাণিজ আবর্জ্জনা সব্‌জীবাগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী, কিন্তু ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে উহাকে উত্তমরূপে বিগলিত করিয়া লইতে হইবে। এজন্য ক্ষেত্রের কোনও নিভৃত স্থানে নির্ম্মিত পাকা হৌজ মধ্যে সার সঞ্চিত করিয়া রাখা উচিত। সারের সহিত খণ্ড খণ্ড বিচালি বা খড় মিশাইয়া রাখিলে উহা অপেক্ষাকৃত শীঘ্রই পচিয়া যায়। অনেকে গর্ত্তের মধ্যে সার রাখিয়া মাটি চাপা দিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাতে সার পচিতে বিলম্ব হয় এবং তন্মধ্যে উত্তাপ জন্মে। ফলতঃ স্তূপান্তর্গত অনেক সারাংশ নষ্ট হইয়া যায়। এজন্য গর্ত্তের উপরিভাগে ঘনভাবে মাটি চাপা না দিয়া উপরে বরং চালা বাঁধিয়া দিলে সমধিক উপকার দর্শিয়া থাকে। চালা বাঁধিয়া দিতে অসুবিধা হইলে সারসঞ্চিত গর্ত্তের মধ্যস্থিত আবর্জ্জনারাশির উপরিভাগে

চেটাই বা ঝাঁপ প্রসারিত করিয়া তদুপরি মাটী চাপা দেওয়া উচিত। উপরে চাপা না দিলে সারের জলীয় ভাগ শুষ্ক হইয়া যায় এবং বাষ্পীয় সারাংশ সেই সঙ্গে উড়িয়া যায়। অতঃপর ইহাও দেখিতে হইবে যে, বৃষ্টির জলে সার না ধৌত হইয়া চলিয়া যায়। এজন্য তাহার প্রতিরোধস্বরূপ হয় গর্ত্তের চারিদিকে দৃঢ়রূপে আল দিতে হইবে কিম্বা গর্ত্তটী সার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে ভরাট না করিয়া জমীর উপরিভাগ হইতে আধ হাত নিম্নদেশ পর্য্যন্ত ভরাট করা ভাল। আপাত-ব্যবহার্য্য বলিয়া সার-সম্পর্কীয় সূক্ষ্মাংশেরই মূল্য অধিক। উক্ত সূক্ষ্মদশাপ্রাপ্ত পরমাণুরাশি যদি বিধৌত হইয়া বহির্দ্দেশে নির্গত হইয়া যায় তাহা হইলে অবশিষ্ট স্থূলাংশ দ্বারা ফসলের আশু উপকারের বিশেষ আশা করা যাইতে পারে না।

সব্জীসারের মধ্যে ক্ষেত্রস্থিত লতা-পাতা, আগাছা, পুষ্করিণীর পানা, শেওলা, কচুরী প্রধান এবং সহজলভ্য। আগাছা-আবর্জ্জনা করিয়া ক্ষেত্রে প্রদান করিতে পারিলে প্রভূত উপকার দর্শিয়া থাকে। পাতাসার অনেক স্থলে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু শুষ্নী-কল্মী পানা বা শেওলা কিম্বা কচুরী (hyacinth) কদাচ ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। অনেক পুষ্করিণী, জলা ও বিলে উল্লিখিত আগাছাসকল প্রভূত পরিমাণে জন্মিয়া থাকে, কিন্তু সাররূপে ব্যবহার নাই বলিয়া তৎসমুদায় অনর্থক নষ্ট হইয়া থাকে। পুষ্করিণী হইতে যখন শেওলা বা পানা পরিষ্কৃত হয়, তখন তাহা যথেচ্ছ ফেলিয়া না দিয়া ক্ষেত্রের মধ্যে কয়েক দিবস প্রসারিত রাখিলেই তৎসমুদায় অচিরে পচিয়া যায় এবং তখন ক্ষেত্রে হলচালনা করিলেই মাটির সহিত মিশিয়া যায়।

অনেক সব্জীর পক্ষে তরল-সার বিশেষ উপযোগী; কিন্তু আশু উপকার লাভের জন্যও তরল-সার ব্যবহৃত হইতে পারে। এতদ্দ্বারা যেরূপ তৎপর উপকার দর্শিয়া থাকে, সেইরূপ ইহার উপকারিতা বড়ই ক্ষণিক। যাহা হউক, তরল-সার প্রস্তুত করিতে হইলে গবাদি পশু এবং পক্ষীদিগের

সার সংগ্রহ করিয়া, কিম্বা খৈলচূর্ণ কোন বৃহৎ গামলায় রাখিয়া তাহাতে প্রচুর পরিমাণে জল দিতে হয়। এইরূপে ১০।১৫ দিবস জলে ভিজিলে, এক খণ্ড যষ্টি দ্বারা সেই সারবিশিষ্ট জল ক্ষণকাল আন্দোলিত করিলে জলের সহিত গলিত সার উত্তমরূপে মিশ্রিত হইয়া যায়। এইরূপে তরল-সার প্রস্তুত করিয়া প্রথমাবস্থায় গাছের গোড়ায় দিলে গাছের তেজ বৃদ্ধি হয় এবং মধ্যমাবস্থায় দিলে ফসলের বৃদ্ধির উপকার দর্শিয়া থাকে।

পোড়ামাটী অনেক সব্জীতে প্রয়োজন হয়। উনানের মাটী গাছের গোড়ায় দিলে প্রত্যক্ষ ও প্রভূত উপকার পাওয়া যায়। দুই চারিটী গাছের জন্য প্রয়োজন হইলে উনানের মাটীতেই কাজ চলিতে পারে। রন্ধনশালার উনান ভাঙ্গিয়া গাছের গোড়ায় দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে, কিন্তু বর্জ্জিত উনানের মাটী পাওয়া গেলে মন্দ হয় না। গৃহস্থ বাটীতে চুল্লি-ভাঙ্গা মাটী সকল সময় পাওয়া যায় না, এবং যদিও পাওয়া যায় তাহার পরিমাণ অধিক হয় না। যেস্থলে বহু গাছ বা বৃহৎ ক্ষেত্রের জন্য পোড়া-মাটী আবশ্যক, সে স্থলে স্বতন্ত্রভাবে উহা প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে। পোড়া-মাটী তৈয়ার করিবার জন্য মাটীর চাপড়া, জঙ্গল ও তৃণাদি স্তরে স্তরে সাজাইতে হইবে। নিজের প্রয়োজন বুঝিয়া পাঁজার আকার ছোট বা বড় করিতে হইবে এইরূপে মাটীর চাপড়া ও জঙ্গলাদি স্তরে স্তরে সাজাইয়া যে পাঁজা নির্ম্মিত হয়, তাহাকে ইষ্টকের পাঁজার ন্যায় উত্তমরূপে কর্দ্দম দ্বারা লেপ দিতে হইবে। সেই পাঁজার উপরে ও চারিদিকে কর্দ্দমের প্রলেপ দিয়া, পাঁজার নিম্নে আগুন জ্বালাইয়া দিতে হয়। ক্রমে পাঁজার সমুদায় জঙ্গলাদি পুড়িয়া গেলেই পোড়া-মাটী (charred turf) প্রস্তুত হইল। পাঁজা পুড়িবার সময় আগুন জ্বলিয়া উঠিতে দেওয়া নিষিদ্ধ। কিন্তু যদি জ্বলিয়া উঠে, তাহা হইলে জলের ছিটা দিয়া অগ্নির তেজ নির্ব্বাপিত করিতে হইবে।

সুচারুরূপে গুমাইয়া পুড়িয়া যে পোড়্-মাটী উৎপন্ন হয়, তাহাই বিশেষ উপকারী।

ঝুল ও ভুষা অনেক সময় আবশ্যক হইয়া থাকে, এজন্য কারখানা বা রন্ধনশালার ঝুল বা ভুষা যত্নসহকারে সঞ্চয় করিয়া রাখিলে সময়ে সময়ে সব্জীবাগানে অনেক কাজে লাগিতে পারে। বাসগৃহ অপেক্ষা রন্ধনশালা বা কারখানার ঝুল সমধিক সারবান্, সুতরাং শেষোক্ত প্রকারের ঝুলই আদরণীয়। আবার কোক-কয়লা-জাত ঝুল কাষ্ঠাদি-জাত ঝুল অপেক্ষা মূল্যবান। প্রথম প্রকারের ঝুলে শতকরা ১৮ হইতে ৪৮ ভাগ খনিজ পদার্থ বিদ্যমান। এইজন্য ইহা সমধিক আদরণীয়। আমি ইহা জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সব্জীক্ষেত্রে ব্যবহার করিয়া সময়ে সময়ে বিশেষ উপকার লাভ করিয়াছি। গাছকে তেজোবান্ করিবার জন্য হউক বা গাছের শ্রীবৃদ্ধি করিবার জন্য হউক অথবা ফসলের আকার বা পরিমাণ বৃদ্ধির জন্যই হউক, ইহা ব্যবহার করিলে যে বিশেষ উপকার পাওয়া যাইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ঝুল ও ভুষা এতই হাল্কা যে, সহজে উহা জলের সহিত মিশিতে চাহে না, এজন্য উহাকে এক খণ্ড কাপড়ে বা চটের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া তাহার সহিত এক খণ্ড প্রস্তর বা ইষ্টক বাঁধিয়া, জলের গামলায় ফেলিয়া দিতে হয়। অতঃপর নিমজ্জিত ভুষা ভাসিবার সুযোগ না পাইয়া অল্পাধিকক্ষণ মধ্যেই জলে ভিজিয়া যাইবে, অতঃপর আবশ্যকমত জলের সহিত মিশাইয়া ব্যবহার করিতে হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

চৌকা ও পটী

কাজের সুবিধার জন্য পরিমিত আকারে যে জমী বিভক্ত ও আলবেষ্টিত করা যায় তাহাকে চৌকা কহে। উদ্যানস্বামীর উদ্দেশ্য এবং ক্ষেত্রের পরিমাণানুসারে চৌকার আকার ক্ষুদ্র বা বৃহৎ করিতে হইলে চৌকার আকার প্রয়োজনানুরূপ বড় হওয়া আবশ্যক ; নতুবা ছোট ছোট চৌকাতেই কাজ চলিতে পারে। স্বতন্ত্র তরকারীর জন্য এক একটী চৌকা নির্দ্দিষ্ট থাকা উচিত, নতুবা পাট-পরিদর্শনের অসুবিধা ঘটিয়া থাকে। চৌকার পদ্ধতি অনুসরণ করিবার অন্যতম উদ্দেশ্য,—ইহাতে জন-মজুর খাটাইবার সুবিধা হয়, চৌকার পরিমাণ-অনুসারে তাহাতে কত সার লাগিতে পারে, জলসেচন করিতে কত মজুরী পড়ে, চৌকার উৎপন্ন সামগ্রীতে লাভ কি লোক্‌সান হয়,—এ সব তথ্য সহজেই হিসাব করা যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত, চৌকা দ্বারা বাগানেরও শ্রীবৃদ্ধি হয়, তাহাও যে অবিবেচনার কথা তাহা নহে। চৌকা সমচতুর্ব্বাহু ও সমকোণ (square) অপেক্ষা ঈষৎ লম্বা ধরণের (oblong) রচিত হইলে ভাল হয়। সমচতুর্ব্বাহু অর্থে ক্ষেত্রের চারিটী বাহু সমান বুঝায়। আর লম্বা বলিলে বিপরীত দুই বাহু যে মাপের, অপর বিপরীত বাহুদ্বয়ের পরিমাণ তাহা অপেক্ষা বড় কিম্বা ছোট বুঝায়। চৌকার প্রান্তভাগ হইতে কার্য্য আরম্ভ করিলে যতটুকু কাজ হয় তাহা পূরাপূরি হইতে পারে, কিন্তু সুবৃহৎ সমচতুর্ব্বাহুবিশিষ্ট ক্ষেত্রে তাহা অনেক সময় সুবিধা হয় না।

বেগুণ, পটোল, কপি প্রভৃতি যে সকল গাছের আয়তন বড়, তাহাদিগের জন্য চৌকা-প্রথা প্রশস্ত।

চৌকাকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করিলে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চৌকা উৎপন্ন হয় তাহাদিগকে পটী কহে। মূলা, শালগম, গাজর, বীট, পেঁয়াজ ও নানাবিধ ক্ষুদ্র জাতীয় শাক পটীতে ভাল জন্মে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পটীতে ইহাদিগকে আবাদ করিলে পাট-পরিচর্য্যার বিশেষ সুবিধা হয়। এই সকল ক্ষুদ্রজাতীয় ফসলের সর্ব্বদা পাট আবশ্যক হইয়া থাকে। কিন্তু ইহাদিগকে যদি পটীর পরিবর্ত্তে চৌকায় স্থান দেওয়া যায়, তাহা হইলে জন-মজুরগণ তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া কাজ করিবার সময় অনেক গাছ পদদলিত হইবার সম্ভাবনা। পটীর পরিমাণ প্রস্থে তিন হাতের অধিক হওয়া কোন মতে উচিত নহে। ঈদৃশ ফসলের জন্য পটী সকলকে দশ হইতে বিশ হাত পর্য্যন্ত লম্বা করিলে চলিতে পারে। পটীর প্রস্থ তিন হাতের অধিক হইলে জন-মজুরগণ দীর্ঘভাগের আলের উপর বসিয়া পটীর মাঝখান পর্য্যন্ত হাত প্রসারিত করিতে পারে না, কিন্তু যদি তিন হাতের অধিক প্রশস্ত না হয়, তাহা হইলে তাহারা পটীর মধ্যে প্রবেশ না করিয়াই উভয় পার্শ্ব হইতে কাজ করিতে পারে। অনন্তর পটী দ্বারা আরও লাভ,—উহার মধ্যে আবশ্যকমত জল পূরিয়া আবদ্ধ রাখিতে পারা যায়।

চৌকা বা পটীর যে আল বাঁধিতে হইবে, তাহা অন্ততঃ এক হাত চওড়া হওয়া আবশ্যক। ইহা অপেক্ষা কম হইলে আলের উপর দিয়া মানুষ যাতায়াত করিতে পারে না এবং যাতায়াত করিলেও আল ভাঙ্গিয়া যায়, সময়ে সময়ে ফসলেরও অনিষ্ট হইয়া থাকে।

চৌকার আল,—মধ্যবর্ত্তী জমী হইতে ৩।৪ ইঞ্চ এবং পটীর আল,—দুই ইঞ্চ উচ্চ করিতে হয়। আল ঈষৎ উচ্চ থাকিলে চৌকায় জল আটক রাখিতে পারা যায়। ক্ষেত্র মধ্যে জল ক্ষণকাল আবদ্ধ থাকিলে সমুদয়

জলই মাটীতে শোষিত হয়, সুতরাং মাটী শীঘ্র শুষ্ক হয় না। জমীতে আল না থাকিলে জলসেচনকালে সমুদয় জল ক্ষেত্রমধ্যে সমভাবে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে না, আবার কোন স্থানে আদৌ পড়ে না। আল না রাখিবার পক্ষে আরও এক আপত্তি এই যে, জলসেচনকালে বা বৃষ্টির সময় জলের বেগে ক্ষেত্রের মাটী বিচলিত হয় এবং জলের সহিত সূক্ষ্ম মৃত্তিকাকণা সকল উচ্চ স্থান হইতে নিম্নস্থানে গিয়া সঞ্চিত হয়, সুতরাং তাহাতে ফসলের অনিষ্ট হইয়া থাকে।

ক্ষেত্র মধ্যে যে সকল চৌকা বা পটী রচনা করিতে হইবে তাহা যেন পরস্পর সংলগ্ন থাকে। অবিমৃষ্যভাবে যথা-তথা চৌকা বা পটী রচিত হইলে বর্ষাকালে অনেক সময় নষ্ট হয়, পরিদর্শনের অসুবিধা ঘটে এবং মজুরীও অপেক্ষাকৃত অধিক পড়িয়া যায়। কিন্তু চৌকা বা পটীগুলি পরস্পর-সংলগ্ন থাকিলে কাজের বিশেষ সুবিধা হয়।

ভেলি ও জুলি—এতদুভয়ের পরস্পরে অতি নিকট সম্বন্ধ। ভেলি রচিত হইলেই জুলি স্বতঃই দেখা দেয় এবং জুলি কাটিলেই ভেলিও আপনা হইতে উৎপন্ন হয়। চৌকার মধ্যে নিয়মিত স্থান ব্যবধানে যে সরাসরি দীর্ঘ অগভীর নালা রচিত হয় তাহাকে জুলি কহে। অনেক গাছ আছে যাহাদিগকে সমতলভূমি হইতে কথঞ্চিৎ নিম্নে বসাইলে তাহাদিগের উপকার হয়। এই জন্যই তাদৃশ উদ্ভিদসকল জুলি মধ্যে রোপিত হইয়া থাকে। আবার অনেক গাছ অতিশয় আর্দ্রতা সহ্য করিতে পারে না। এই কারণে তাদৃশ উদ্ভিদগণকে অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্থান দিতে হয় সেই জন্য তাহাদিগের গোড়ায় ভেলি তুলিয়া দেওয়া উচিত। জুলির বিপরীত ভাবই ভেলি অর্থাৎ জুলির জন্য সমতল স্থানের মাটী কাটিয়া নালা (furrow) প্রস্তুত করিতে হয়, ভেলির (ridges) জন্য তেমনি সমতল জমীর উপরেও পরিমিত স্থান ব্যবধানে আলের

ন্যায় মাটী উচ্চ করিতে হয়। দুই ভেলির মধ্যস্থিত খাদকে জুলি এবং দুই জুলির মধ্যবর্ত্তী আল্‌কে ভেলি কহে।

পূর্ব্ব প্রস্তাবে বলা গিয়াছে যে, সমতল ক্ষেত্রে সমভাবে জল সঞ্চারিত হয় না; কিন্তু জুলি থাকিলে তন্মধ্যে জল অনেকক্ষণ আবদ্ধ থাকে, ফলতঃ ভূগর্ভের ভিতর প্রবিষ্ট হয়।

ক্ষেত্রের প্রস্থভাগে জুলী ও ভেলী রচনা করিতে হয় এবং ক্ষেত্রের দীর্ঘ-ভাগের দুই শেষাংশে বরাবর একটী করিয়া ঈষৎ প্রশস্ত জুলি রাখিতে হয়। পার্শ্বস্থিত জুলির সহিত ক্ষেত্রমধ্যস্থিত অপর যাবতীয় জুলির সংযোগে রাখিতে হইবে, কারণ চৌকার পার্শ্বস্থ প্রধান জুলির মধ্য দিয়া সেচিত বারি প্রবাহিত হইয়া ক্ষেত্রের মধ্যস্থিত জুলিতে প্রবেশ করে। চৌকা কুড়ি হস্তের অধিক প্রশস্ত হইলে প্রত্যেক কুড়ি হস্তের উপরে এক-একটী অতিরিক্ত জুলি আবশ্যক।

পটীর জন্য জুলি বা ভেলি আবশ্যক হয় না; কারণ পটীগুলি নিজেই জুলিরূপে পরিগণিত হইতে পারে।

শশা, করলা, ঝিঙ্গে, উচ্চে, কাঁকুড়, তরমুজ, লাউ প্রভৃতির বীজ-রোপণের জন্য ক্ষেত্রের স্থানে স্থানে এক হাত হইতে দুই হাত ব্যাস-বিশিষ্ট গর্ত্তকে থালা বা মাদা কহে। থালা প্রস্তুত করিবার জন্য প্রথমতঃ নির্দ্দিষ্ট স্থান এক হাত হইতে দুই হাত গভীর করিয়া খনন করিতে হইবে। অতঃপর তাহার মধ্যস্থিত মাটীকে উত্তমরূপে চূর্ণ করতঃ সেই মাটীর সহিত বিবেচনামত সার মিশাইতে হইবে। অনন্তর সেই গর্ত্তের বেষ্টনে ৩।৪ অঙ্গুলি উচ্চ করিয়া মাটীর একটী আল দিবে। আলের মধ্যস্থিত মাটী অনেক গাছের থালার জন্য এইরূপ বিশেষে প্রয়োজন।

তৃতীয় অধ্যায়

ভাঁটী

যে নির্দ্দিষ্ট স্থানে বীজ হইতে চারা উৎপন্ন করা যায় অথবা যথায় চারাগুলিকে লালনপালন করা যায়, তাঁহাকে ভাঁটী কহে। জেলা বা প্রদেশবিশেষে ইহার নাম,—'হাপর' বা 'বীজতলা'।

অনেক গাছের বীজ ক্ষেত্রে প্রসারিত করিলে অঙ্কুরিত হয় না, অথবা অঙ্কুরিত হইয়াও যথোপযুক্ত পরিচর্য্যার অভাবে মরিয়া যায়, এজন্য তাহাদিগকে ভাঁটীতে বপন করিতে হয়। বিস্তৃত স্থানে বীজ বপন করিয়া তাহার তদ্বির করা এবং চারা সকলকে প্রতিপালন করা অসম্ভব। বীজ অঙ্কুরিত করা উদ্যান-কলার একটী প্রধান ও কঠিন কার্য্য। বীজ অঙ্কুরিত করিতে বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিতে হয়, সুতরাং পরিমিত স্থানে তাহা সহজে হইয়া থাকে।

ক্ষেত্রমধ্যে ক্ষেত্রস্বামী বা তাঁহার প্রতিনিধি যে স্থানে থাকেন, তাহার সন্নিকটেই ভাঁটী প্রস্তুত করিলে বিশেষ সুবিধা হয় কারণ তাহা হইলে সর্ব্বদা ভাঁটী পরিদর্শন করিবার সুবিধা হইয়া থাকে। শিশির, বৃষ্টি, রৌদ্র ও আলোক সমধিক পরিমাণে ভাঁটীতে লাগিতে দিলে, বীজের ও চারার অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে, কিন্তু ভাঁটী নিকটে থাকিলে তাহাকে আবশ্যকমত শিশির, বৃষ্টি ও রৌদ্র খাওয়াইতে পারা যায়।

ভাঁটীর জন্য সতর্কতার সহিত স্থান নির্ব্বাচন করিতে হইবে। স্থান-

নির্ব্বাচনকালে কয়েকটী বিষয় বিবেচ্য আছে। যে স্থানে ভাঁটি রচিত হইবে, তাহা যেন নিম্নতল না হয়, অথবা তাহার সন্নিকটে জঙ্গল, জঞ্জাল-স্তূপ কিম্বা ইষ্টক বা রাবিশের রাশি না থাকে। ভাঁটীর জমি নাবাল হইলে যে কেবল তথায় বর্ষায় জল দাঁড়ায় তাহা নহে, জমীর প্রকৃতিও আর্দ্র হইয়া যায়। চারাগাছের পক্ষে সিক্ত বা রসা-জমী একেবারেই স্পৃহনীয় নহে। অতঃপর ভাঁটীর নিকটে জঞ্জাল বা জঙ্গল থাকিলে তন্মধ্যস্থিত পোকা মাকড়ে চারাগাছ খাইয়া ফেলে অথবা কাটিয়া দেয়। ছায়াজাত গাছ রুগ্ন, ক্ষীণ, বিবর্ণ ও কুক্ষিভগ্ন হয়। আবার সূর্য্যালোক ও বাতাসই গাছের প্রাণ, সুতরাং ইহাদিগের অভাবে গাছ যে রুগ্ন হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? এজন্য উন্মুক্ত, বায়ুসঞ্চারিত ও পরিষ্কৃত স্থানে ভাঁটী ও চারাবাড়ী প্রস্তুত করিতে হইবে।

উল্লিখিত অত্যাবশ্যক বিষয়গুলি মনে রাখিয়া যথাযোগ্য স্থান নির্দ্দেশ করিতে হইবে। ভাঁটী দীর্ঘে যত বড় হয় তাহাতে ক্ষতি নাই, তবে বিশ হাতের অধিক না হইলেই ভাল হয়, কিন্তু প্রস্থে দুই বা আড়াই হাতের অধিক হওয়া উচিত নহে।

ভাঁটী স্থাপনার্থ পরিমিত ভূমিখণ্ডের চতুষ্কোণে এক একটী খোঁটা পুঁতিয়া দড়ির সাহায্যে চতুর্দ্দিকে রেখা টানিতে হইবে। তদনন্তর রেখার মধ্যবর্ত্তী ভূমির ৮।৯ অঙ্গুলি মাটী কাটিয়া ও তুলিয়া ফেলিয়া তাহার মধ্যে ঝামা বা খোয়া বিস্তৃত করিয়া দিলে ভাল হয়। অতঃপর সেই প্রসারিত ঝামা বা খোয়াকে কোন কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা পিটিয়া সমতল করা হইলে, তাহার উপর ৫।৬ বা ৭।৮ আঙ্গুলি ঝুরা সার-মাটী দিতে হইবে। পার্শ্বস্থিত মাটী ধসিয়া না পড়ে এজন্য তাহার চারিপার্শ্ব উত্তমরূপে পিটিয়া দেওয়া আবশ্যক। ভাঁটীর অন্তর্ব্বর্ত্তী মাটীর উপরভাগও কিঞ্চিৎ লঘুভাবে চাপিয়া দিলে ভাল হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ভাঁটীতে বীজ বপন ও চারা-পালন করিে হয়। পোয়ালি বা চারা অবস্থা হইতে যত্ন পূর্ব্বক লালন-পালন না করিে ভবিষ্যতে তাহারা বিপুল চেষ্টা ও যত্ন সত্ত্বেও আশানুরূপ ফল প্রদান কে না। এই কারণে ভাঁটীর মাটী খুব সারবান ও লঘু হওয়া উচিত উত্তম দো-আঁশ মাটী ও পাতাসার বা পুরাতন গোবরসার দ্বারা সে উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে।

রৌদ্র, বৃষ্টি, আলোক ও বাতাসের সামঞ্জস্য রক্ষা করিবা জন্য ভাঁটীর উপরে কোন আবরণের বন্দোবস্ত করিতে হয় ভাঁটী অনাবৃত রাখিলে অতিরিক্ত আলোকে ও রৌদ্রের উত্তাপে বীজ অঙ্কুরিত হইতে বিলম্ব হয় এবং অনেক সময়ে অঙ্কুরিত হয় ও না। অনাবৃত স্থানে বীজ বপন করিবার পরে বৃষ্টি হইলে মাটী দৃঢ় হইয় চাপিয়া যায়, ফলতঃ কোমল অঙ্কুর মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উঠিতে পারে না, অথবা বৃষ্টিতে মাটী অতিরিক্ত ভিজিয়া বীজ নষ্ট করিয়া দেয়, সুতরাং তাহাতে আর বীজ অঙ্কুরিত হইবার আশা থাকে না। এই সকল কারণে ভাঁটীতে আবরণ থাকা আবশ্যক। আবরণের জন্য হোগ্লা, দরমা বা উলুঘাসের ঝাঁপ প্রশস্ত। উক্ত আবরণ দো-চালা করিলেই ভাল হয়। ঝাঁপগুলি আবশ্যকমত সঞ্চালনের সুবিধার জন্য ৩।৪ হাতের অধিক দীর্ঘ করা উচিত নহে। ভাঁটী হইতে তাহার চালের পার্শ্বদিক ১॥০ ফুট উচ্চ রাখিলেই চলিবে।

ভাঁটির চাল প্রাতে ও বৈকালে ক্ষণকালের জন্য অপসারিত করিয়া দিলে চারাগাছের বিশেষ উপকার হয়। চারাগাছ একেবারে অধিক রৌদ্র সহ্য করিতে পারে না, এজন্য ক্রমে ক্রমে উহা সহ্য করাইতে হইবে। সহ্যকরণ পদ্ধতি (accustoming) শব্দ দ্বারা অভিহিত হইয়া থাকে। আবরিত উদ্ভিদের আবরণ সহসা উন্মোচিত হইলে কচি চারা ‘আম্লে’

বা ঝিমাইয়া যায়। বৃষ্টির সময় ভাঁটী ঢাকিয়া রাখা প্রয়োজন। আকাশ পরিষ্কার থাকিলে রাত্রিকালে ভাঁটী খুলিয়া রাখিতে হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

বীজ সংগ্রহ ও রক্ষা

এদেশে বীজসংগ্রহ বিষয়ে বিশেষ যত্ন দেখা যায় না। এই জন্য স্বদেশজাত বীজমাত্রের উপর সাধারণের তাদৃশ শ্রদ্ধা নাই, ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয়। অনেক স্থলে দেখা যায়, ক্ষেত্রের যাবতীয় অপকৃষ্ট ফল বীজের জন্য রক্ষিত হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে উৎকৃষ্ট তরিতরকারি উৎপন্ন করিতে হইলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফলই বীজের জন্য রাখা উচিত। প্রতি বৎসর উৎকৃষ্ট তেজাল ফলবন্ত গাছের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল সুপক্ক করিয়া রাখিতে পারিলে উৎকৃষ্ট বীজ লাভ করা যায়। এতদ্দ্বারা নিজের উপকার হয়, দেশেরও উপকার হয়।

ক্ষেত্রমধ্যে যে কয়টি ফল সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, সুপুষ্ট ও নীরোগ, তাহাই বীজের জন্য স্বতন্ত্র ভাবে চিহ্নিত করিয়া সেই সকল গাছের বিশেষভাবে তদ্বির করিলে নিশ্চয়ই তাহার ফল অপেক্ষাকৃত সুপুষ্ট হইবে। চিহ্নিত ফলগুলি সুপক্ক হইয়া উঠিলে গাছ হইতে ভাঙ্গিয়া আনিয়া তাহাদিগকে রৌদ্রে উত্তমরূপে শুষ্ক করিতে হয়। লাউ, কুমড়া প্রভৃতি বৃহজ্জাতীয় ফল শুষ্ক হইতে অনেক বিলম্ব হয়, সুতরাং তাহাদিগকে কর্ত্তনপূর্ব্বক বীজ

বাহির করিয়া উত্তমরূপে শুষ্ক করিতে হইবে। মেঘাচ্ছন্ন দিবসে কিম্বা অপরাহ্নে এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে। মেঘ বা বাদল-শূন্য প্রত্যূষে সংগৃহীত বীজ বিধৌত করিতে হইবে। বীজ অধিকক্ষণ সিক্ত থাকিলে অঙ্কুরিত হইবার সম্ভাবনা।

বীজগুলি উত্তমরূপে শুষ্ক হইলে পরিষ্কার কাল বোতলের মধ্যে রাখিয়া ছিপি দ্বারা মুখ উত্তমরূপে অাঁটিয়া দিতে হয়। সেই বীজসমেত বোতল কোন শুষ্ক গৃহমধ্যস্থিত সিন্দুক বা আলমারি মধ্যে রাখিতে হইবে। ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলে বীজ খারাপ হইয়া যায়, সুতরাং অনেক সময়ে অঙ্কুরিত হয় না। মধ্যে মধ্যে রৌদ্রে না দিলে বীজে ছাতা ধরিয়া থাকে। এস্থলে ইহাও জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, উত্তপ্ত বীজ বোতলের মধ্যে অথবা উত্তপ্ত বোতলে বীজ রাখা উচিত নহে। রৌদ্র হইতে বোতল ও বীজ গৃহের মধ্যে বা ছায়ায় আনিয়া, যখন এতদুভয় ঠাণ্ডা হইবে, তখন আধার মধ্যে বীজ তুলিতে হয়। নতুবা উত্তপ্ত বোতলের বা বীজের উত্তাপ জলে পরিণত হইয়া বীজের অনিষ্ট সাধন করে। যাবৎ বপনের জন্য আবশ্যক না হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে বীজ সকলকে শুকাইতে দেওয়া ভিন্ন কদাচ তাহাদিগকে বাহির করা উচিত নহে। যে দিন সমধিক বর্ষা হইবে, সে দিন আদৌ বীজের বোতল বা সিন্দুক খোলা উচিত নহে। তবে নিতান্ত আবশ্যক হইলে গৃহের দ্বার-জানালাদি অবরুদ্ধ করিয়া বীজ বাহির করিয়া লইয়া, পুনরায় যথাস্থানে রাখিয়া দিতে হইবে।

দেশীয় অপেক্ষা বিলাতী বীজ রক্ষা সম্বন্ধে এই নিয়ম অধিক পালনীয়। বিলাতী বীজে সামান্য বাতাস বা ঠাণ্ডা লাগিলে বীজ খারাপ হইয়া যায়।

লাউ, কুমড়া, ঝিঙ্গে প্রভৃতি কঠিন ত্বকবিশিষ্ট বীজ অল্পক্ষণের জন্য উন্মুক্ত থাকিলে ক্ষতি নাই, কিন্তু যে সকল বীজের আবরণ বা ত্বক কোমলও

শোষক তাহারা অল্পাধিক রসা বাতাসেই স্ফীত হয়, সুতরাং তাদৃশ বীজ —যথা কপি শালগম্‌, গাজর, বীট প্রভৃতি সামান্য সিক্ত বাতাসেই স্ফীত হইবার সম্ভাবনা। এইজন্য ঈদৃশ কোমলত্বক বীজসমূহকে বিশেষ সাবধানে রক্ষা করিতে হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়

বীজ-বপন

যে সকল চারা স্থানান্তরিত (transplant) করিতে হয় তাহাদিগের বীজ ভাঁটিতে কিম্বা গামলায় বপন করা উচিত। বপনের পক্ষে অপরাহ্ন কালই প্রশস্ত।

বীজ বপনের পূর্ব্ব দিবস বীজ-তলা বা ভাঁটির মাটি আলগা ও ঝুরা করিয়া রাখিতে হইবে। মাটি ভিজা বা কর্দ্দমবৎ থাকিলে আপাততঃ তাহাতে হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে। এতদবস্থায় মাটি বিচলিত হইলে তাহাতে 'কাঁচল' ধরে, মাটীতে ঢেলা বাঁধে এবং সে সকল ঢেলা চূর্ণ হয় না। মাটির শুষ্কাবস্থায় বীজতলা প্রস্তুত করিতে হয়। বীজতলার মাটি ঝুরা ও আঁশাল হওয়া উচিত। এজন্য মাটি ঝুরা করিয়া লইতে হয় এবং মাটির সহিত অল্পাধিক চূর্ণ পাতা-সার, গোবর বা ঘোড়ার নাদি মিশ্রিত করিয়া দিলে ভাল হয়। অতঃপর উহাতে অল্পাধিক জল বাঁধিয়া রাখিতে হয়। পরদিবস যো হইলে মাটি আর একবার উলট-পালট

করিয়া ধীরে ধীরে চাপিয়া দিয়া যথাসময়ে ভাঁটির আয়তনমত বা নিজের প্রয়োজন মত বীজ লইয়া তাহাতে ছড়াইয়া দিতে হইবে। বীজগুলি যাহাতে সমভাবে ও সুশৃঙ্খলে বিস্তৃত হইয়া পড়ে, সে দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। অব্যবসায়ী বা অনভ্যস্থ ব্যক্তির দ্বারা বপনকার্য্য সুশৃঙ্খলে সম্পাদিত হওয়া কঠিন। অতর্কিতভাবে বীজ বপিত হইলে কোথাও বীজ ঘন হইয়া পড়ে, আবার কোথাও অতিশয় পাতলা ভাবে পড়িয়া যায়। ঘনভাবে পাতিত হইলে বীজ যখন অঙ্কুরিত হইয়া উঠে, তখন চারাগুলি এতই ঘন হইয়া জন্মে যে তাহার ফলে চারাগুলি শীঘ্রই শীর্ণ, অবশেষে রুগ্ন হইয়া পড়ে এবং অনেক চারা তন্নিবন্ধন মরিয়া যায়।

অধিক এবং ভারি মাটি চাপা দিলে বীজ অঙ্কুরিত হইয়া মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উঠিতে পারে না। সেই জন্য বীজের উপরে হাল্‌কা ও ঝুরা মাটি চাপা দেওয়া উচিত। বীজের স্থূলতা অনুসারে অল্প বা অধিক মাটি চাপা দিতে হইবে অর্থাৎ এরূপ পরিমাণে উহার উপরে মাটি দিতে হইবে যে, বীজগুলি মাত্র ঢাকা পড়ে। বীজ বপন করিয়া অনেকে তাহাতে জলসেচন করেন, কিন্তু আমরা এ প্রথার অনুমোদন করি না। বীজগুলি যাবৎ না অঙ্কুরিত হইয়া উঠে, তাবৎ তাহাতে জলসেচন করায় বিশেষ কোন ফল নাই, বরং তাহাতে মাটি বসিয়া গিয়া বীজ অঙ্কুরিত হইবার পক্ষে ব্যাঘাত ঘটায়। ভাঁটীর মাটি যদি নিতান্ত শুষ্ক হয়, তাহা হইলে বরং বীজ রোপণ করিবার ৩।৪ ঘণ্টা পূর্ব্বে অল্প জল দিয়া মাটি সরস করিয়া লওয়া উচিত। নীরস মাটিতে বীজ অঙ্কুরিত হইতে বিলম্ব হয়।

প্রত্যেক জাতীয় বীজেরই অঙ্কুরিত হইবার একটা কাল নির্দ্দিষ্ট আছে, কিন্তু বীজ রোপণ করিবার পরে, অঙ্কুরিত হইবার কাল অতীত হইলে দুই একবার আবশ্যক মত জলসেচন করিয়া তাহার উদ্গমের কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত কিন্তু সেই সময়ের মধ্যেও যদি অঙ্কুরিত না হয়,

তবে সে বীজের আশা পরিত্যাগ করিয়া দ্বিতীয়বার বীজ বপন করিতে হইবে।

বীজে জলসেচন করা বিশেষ সাবধানতার কার্য্য। সূক্ষ্মছিদ্রবিশিষ্ট ঝাঁঝরা বা বোমার দ্বারা জলসেচন করিতে পারিলে জলের ভারে মাটি বা বীজ বিচলিত হয় না। জলপাত্র মাটির সংলগ্নপ্রায় করিয়া জলসেচন করিলে মাটি গর্ত্তময় হয় এবং বীজও নড়িয়া যায়।

শীঘ্র শীঘ্র চারা উৎপাদনের জন্য কোন কোন প্রকারের বীজের জন্য বিশেষ বিশেষ উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে। কোন কোন বীজকে বোতলের মধ্যে কর্পূরের জল পুরিয়া, তন্মধ্যে ক্ষণকাল রাখা হয়। আবার কোন কোন কঠিনত্বক বীজ সকল ঈষদুষ্ণ জলে রক্ষিত হইলে স্ফীত হইয়া উঠে। তখন সেই বীজ রোপিত হইলে শীঘ্র অঙ্কুরিত হয়। তরমুজ, ফুটি, লাউ, কুমড়া, করলা, চিচিঙ্গা প্রভৃতির বীজ আর্দ্র খড়ের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাকাল রাখিয়া পরে ক্ষেত্রে রোপণ করিলে শীঘ্র অঙ্কুরিত হয়। যে সকল বীজের জন্য এইরূপ বিশেষ পা'টের আবশ্যক তাহা যথা স্থানে বিবৃত হইবে।

কপি, শালগম, গাজর, বেগুণ, লঙ্কা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ ভাঁটিতে ছড়াইয়া দিয়া উল্লিখিত মতে ঝুরামাটি চাপা দিতে হয়। বীট, শশা, কুমড়া, লাউ প্রভৃতির বীজ অপেক্ষাকৃত বড় এবং ইহাদের এক-একটি বীজ স্বতন্ত্রভাবে মাটির মধ্যে পুতিয়া দিতে হইবে, কারণ এ সকল বীজের ত্বক কঠিন বলিয়া অঙ্কুরিত হইতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয়। কিন্তু অর্দ্ধ হইতে এক ইঞ্চ মাটির ভিতর বীজ থাকিলে উপরের মাটি শুষ্ক হইলেও ভিতরে যথেষ্ট রস থাকে ফলতঃ শীঘ্র অঙ্কুরিত হয়।

ভাঁটীর বাহিরে অর্থাৎ ক্ষেত্রে যে সমুদয় বীজ বপন করা যায়, যতদিন তাহা না অঙ্কুরিত হয়, ততদিন উলুঘাস বা গমের বিচালি চাপা দিয়া

রাখিলে রৌদ্রে মাটি শুষ্ক হইতে পায় না এবং তাহাতে জলসেচন করিলে মাটি কঠিন বা বিচলিত হয় না, অথবা সেই জল টানিয়া গেলে মাটি ফাটিয়া যায় না। মাটি সরস না থাকিলে, কুমড়া লাউ, শশা, ঝিঙ্গে, উচ্ছে, তরমুজ প্রভৃতির রোপিত বীজে মধ্যে মধ্যে জল সেচন করিতে হইবে। এই সকল বীজে মধ্যে মধ্যে জলসেচন না করিলে বীজ অঙ্কুরিত হইতে কেবল যে বিলম্ব হয় তাহা নহে, বীজের অন্তর্ব্বর্ত্তী রস মৃত্তিকায় শোষিত হইয়া অঙ্কুরের শক্তি হ্রাস করিয়া দেয় এবং অঙ্কুরিত হইলেও চারা সুপুষ্ট ও সবল হয় না।

কীট-দষ্ট, দাগী বা অপুষ্ট বা ফোক্‌লা বীজ কোন মতে ব্যবহার করা উচিত নহে। সুপুষ্ট, সজীব ও পূর্ণ বীজ ব্যবহার করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কুঞ্চিত বা শীর্ণ বীজ বপন করিলে কেবল যে একবারের ফসল নিরেশ হয় তাহা নহে, সেই বীজোৎপন্ন গাছে যে ফসল হয় তাহা ত ভাল হয়ই না, অধিকন্তু সেইসকল ফসলের বীজহইতে ভবিষ্যতে স্বীয় বা নিকট-বর্ত্তী ব্যক্তিদিগের ক্ষেত্রেও তদনুরূপ বা তদপেক্ষা নিকৃষ্ট ফসল উৎপন্ন হইয়া থাকে। এক ক্ষেত্রে বীজ থাকিলে অনেক স্থলে প্রতিবেশী দশ জনে তাহা লইয়া গিয়া ক্ষেত্রে রোপণ করে ফলতঃ একজনের বীজ নিকৃষ্ট হইলে ক্রমে গ্রামান্তরে অধিক কি, দেশান্তরে গিয়া পড়িতে পারে, ফলে দেশময় সেই নিকৃষ্ট বীজই স্থায়ী হইয়া যায়।

সর্ব্বদা উৎকৃষ্ট অর্থাৎ পরিপুষ্ট, সুপক্ক, নীরোগ দানা ব্যবহারের চেষ্টা করিতে হইবে। নিম্নশ্রেণীর বীজ ব্যবহারে প্রারম্ভিক ব্যয়ের পরিমাণ লঘু হইতে পারে কিন্তু মজুরী, তদ্বির খরচ প্রভৃতির সমষ্টির সহিত ফসলের মূল্যের রেওয়া নিকাশ করিলে আমাদের অদূরদর্শিতার পরিণাম কি তাহা বেশ উপলব্ধি হয়।

বপনের সময়

বীজ বপনের জন্য নির্দ্দিষ্ট কালের অপেক্ষা করিতে হইবে। অসময়ে বীজ বপন করিলে সমধিক পাট-তদ্বির করিতে হয় এবং তাহা সত্ত্বেও বীজ সকল সুচারুরূপে অঙ্কুরিত হয় না। যেগুলি অঙ্কুরিত হয়, সেগুলি আশানুরূপ পরিপুষ্ট হয় না, অনেক চারা মরিয়া যায়। সকল ফসলই ঋতুর অধীন। কতক বীজ গ্রীষ্মে, কতক বর্ষায় এবং কতক শীতে, বপন করিতে হয়। অসময়ে বীজ বপন করিলে অঙ্কুরে ব্যাঘাত হয়, অনেক বীজ আদৌ অঙ্কুরিত হয় না। তাহা ব্যতীত এতজ্জাত চারা তাদৃশ দীর্ঘজীবী, পরিপুষ্ট ও ফলপ্রদ হয় না। এই সকল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যথাসময়ে বীজ বুনিবার জন্য একদিকে যেরূপ তাড়াতাড়ি করা উচিত নহে, অন্যদিকে সেইরূপ সময় অতীত হইতে দেওয়াও উচিত নহে। সকল বিষয়েরই একটী নির্দ্দিষ্ট সময় আছে।

এ স্থলে সময় নিরূপণ জনিত ভেদর্থে জাতি শব্দ প্রযুক্ত হইল। একই মূল জাতি হইতে ভিন্ন ভিন্ন জাতি উৎপন্ন হইয়াছে, দৃষ্টান্ত স্বরূপ,—একটী কুমড়া গাছ। সকল কুমড়ারই মূল বা পূর্ব্বপুরুষ এক ; কিন্তু তাহার বীজ সময়বিশেষে রোপিত হইলে তজ্জাত গাছে যে ফল জন্মিবে, তাহার বীজ হইতে চারা উৎপন্ন করিতে হইলে পূর্ব্ব গাছের বীজ যে সময় অর্থাৎ যে ঋতুতে এবং ঋতুর যে সময় রোপিত হইয়াছিল, ঠিক সেই সময় বপন করিলে তাহার পূর্ব্বার্জ্জিত প্রকৃতি অনুসারে বীজ অঙ্কুরিত এবং চারা বর্দ্ধিত ও পুষ্পিত হইবে কিন্তু দ্বিতীয় বারের বীজ অপর সময়ে বপিত হইলে তাহা হইতে যে গাছ উৎপন্ন হয় তাহার বৃদ্ধি এবং ফলন-ফুলন অন্যরূপ হইয়া যায়। মানুষের চেষ্টায় এইরূপে একই ফসলের নানা জাতি

উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই জন্য আমরা দেখি, কোন কুমড়া গ্রীষ্মকালে, কোন কুমড়া বর্ষাকালে বা শীতকালে ফল প্রদান করে। ফুলকপি, বাঁধাকপি প্রভৃতি তরকারির মধ্যেও সাধারণতঃ তিনটী বিভাগ দেখা যায় যথা, আশু (early) মাধ্যমিক (intermediate), এবং নাবী বা নামলা (late)। প্রত্যেক ঋতুকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া উল্লিখিত তিনটী বিভাগের উদ্ভব হইয়াছে।

আমরা ইচ্ছা করিলে প্রত্যেক ফসলের প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত করিতে পারি। আশু জাতীয় লাউ, কুমড়া, কপি, কড়াই প্রভৃতি ঋতুজীবী বা মরসুমী (annual) উদ্ভিদগণকে নাবী (late) পর্য্যায় পরিণত করিতে পারা যায় কিন্তু সে জন্য আমাদিগের চিন্তিত হইবার প্রয়োজন নাই, কারণ উহা স্বতন্ত্র বিষয়। যথাসময়ে বীজ বপন করিলে উক্ত বীজ তৎসাময়িক জল-বায়ু হইতে প্রভুত উপকার পায়, তজ্জাত চারাও নিজস্বভাবানুরূপ প্রাকৃতিকতার সাহায্য পাইয়া যথাযোগ্য বৃদ্ধি পায় এবং ফল ফুল প্রদানে সমর্থ হয়। সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলে বা বিগতপ্রায় হইলে যে সকল বীজ বপিত হয় তাহারা তাদৃশ ফলদায়ক বা বৃদ্ধিশীল হয় না। এতদ্ব্যতীত এইরূপে অনর্থক সময় নষ্ট হইলে উদ্ভিদগণও বৃদ্ধির সময় পায় না। উদ্ভিদের প্রকৃতি অনুসারে কোন উদ্ভিদ একমাস, আবার কোন উদ্ভিদ ২।৩ মাস বা ততোধিক কাল সময় না পাইলে ফলপুষ্প-ধারণের যোগ্য হয় না, ইতিমধ্যে ঋতুরও অবস্থা অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, ফলতঃ উদ্ভিদ কোনও গতিকে ফল প্রদান করিয়া থাকে। ইহাকে অকালপক্কতা বলিলে ক্ষতি হয় না।

শীতকালের ফসলের বীজ ফাল্গুন-চৈত্র মাসে বপন করিলে তজ্জাত গাছ ফলফুল প্রদান করা দূরে থাকুক, চারা গাছও উত্তরোত্তর উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে বর্দ্ধিত হইতে না পারিয়া মরিয়া যায়। সকল ফসল সম্বন্ধে

একথা বলিতে পারা যায়। এই জন্য যথাসময়ে বীজ বপন করিতে হইবে।

বীজের প্রকৃতি ভেদ

আকার এবং প্রকার (variety) ভেদে বীজের অনেক রকম আছে। সূক্ষ্ম সূচ্যগ্রভাগসদৃশ বীজ হইতে তাল, নারিকেল পর্য্যন্ত যত প্রকার বীজ আছে তৎসমুদায়ের এক একটী দানা শ্রেণীবদ্ধভাবে কোন স্থানে সজ্জিত করিলে দেখা যায়, আকারের তারতম্যানুসারে কত প্রকারের বীজ বর্ত্তমান। বৃহজ্জাতীয় গাছ হইলেই যে তাহার বীজ বৃহৎ হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই, কারণ আমরা দেখিতে পাই, অশ্বত্থ বা বট-বর্গীয় উদ্ভিদগণ মহীরুহ মধ্যে পরিগণিত, কিন্তু তাহাদিগের বীজ কত ক্ষুদ্র। সে অনুপাতে নারিকেল কত ছোট। কারণ একটী নারিকেল বৃক্ষ, একটী অশ্বত্থ বা বটের একটী শাখার তুল্য মাত্র। পৃথিবীতে যেরূপ অসংখ্য প্রকার উদ্ভিদ আছে, সেইরূপ অসংখ্য আকারের বীজও আছে; তামাক, পোস্ত, সর্ষপ প্রভৃতির বীজ কত ক্ষুদ্র, আবার সীম বা মটরের বীজ কত বড় !

অতঃপর বীজের খোসা বা আবরণের কোমলতা বা কঠিনতা অনুসারে বীজের রকমের সংখ্যা করা যায় না। অনেক বীজ সহজেই উপ্ত হয়, আবার অনেক বীজ অঙ্কুরিত হইতে ২।৪ মাস বা ততোধিক কাল সময় লাগে।

আবার ইহাও দেখা যায় যে, সকল বীজের প্রকৃতি সমান নহে। অনেক রকম বীজ ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলেই অঙ্কুরিত হয়, অনেক বীজ সমধিক

উত্তাপ না পাইলে চেতনা প্রাপ্ত হয় না, ফলতঃ সহজে অঙ্কুরিত হয় না। কপি, মূলা, মটর প্রভৃতি ঈষৎ সর্দ্দিময় স্থানে পতিত হইলে ২।৩ দিন মধ্যেই অঙ্কুরিত হয়, কিন্তু তাল, নারিকেল গুবাক, প্রভৃতির 'কল্' উদ্গত হইতে মাসাধিককাল সময় লাগে।

বীজের সহিত যাঁহাদিগের সম্বন্ধ আছে, তাঁহারা এই সকল ক্ষুদ্র তথ্য বিশেষ অবগত থাকেন ইহা বড়ই বাঞ্ছনীয়। বীজের প্রকৃতি অবগত থাকিলে বীজবপনাদি কার্য্য অতি সহজ হয়। একথা অনেকের নিকট শুনিতে পাই যে, অমুক বীজ অঙ্কুরিত হয় নাই ইত্যাদি। বীজ অঙ্কুরিত না হইলে অনেকেই বীজের, তথা বীজব্যসায়ীর উপর দোষারোপ করেন, কিন্তু তাঁহারা একথা ভাবিয়া দেখেন না যে, বীজের প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁহাদিগের জ্ঞান কতটুকু, বীজবপনের প্রণালী এবং বপনান্তর পরিচর্য্যা বিষয়েই বা তাঁহাদের অভিজ্ঞতা কতটুকু! আমি দীর্ঘকাল এই কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া বুঝিতে পারিলাম না যে, সময়ে সময়ে বীজ কেন উপ্ত হয় না। কৃষি ও উদ্যানকার্য্যের উপযোগী যত প্রকার সুবিধা থাকা উচিত, তৎসমুদায়ই পাইয়াছি,—অর্থ, উপকরণ ও জন-সাহায্য—তাহাও যথেষ্ট পাইয়াছি, তথাপি সময় সময় বীজ অঙ্কুরিত করিতে পারা যায় নাই!

বীজ অঙ্কুরিত হয় না কেন?

বীজ অঙ্কুরিত না হইবার কয়েকটী বিশেষ কারণ আছে তন্মধ্যে বিশেষ বিশেষ কয়েকটী কারণের উল্লেখ করিব।

অপরিপুষ্ট, অপক্ক ও অশুষ্ক বীজ সংরক্ষিত হইলে অল্পদিন মধ্যে

তাহাতে 'ছাতা' ধরে। উত্তপ্ত বীজ শিশি বা বোতল বা অন্য কোন পাত্রে সদ্য-সদ্য রাখিলে বীজের উত্তাপ আবদ্ধ পাত্র হইতে নির্গত হইতে না পারিয়া বাষ্পে পরিণত হয়, ফলতঃ বীজে 'ছাতা' ধরে, বীজ পচিয়া যায়। ছাতা-ধরা বীজে স্যাঁতানি গন্ধ হয়। ঈদৃশ ছাতা-ধরা বীজ অবশ্য-পরিহার্য্য।

বায়ুমণ্ডলের আর্দ্রাবস্থায় বীজের পাত্র উদ্ঘাটিত হইলে তন্মধ্যে সিক্ত বাতাস প্রবিষ্ট হইয়া বীজের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, বীজ অঙ্কুরিত হইবার চেষ্টা পায়, কিন্তু তাহাতে বাধা পাইয়া ক্রমে নিঃস্ব হইয়া পড়ে; ফলতঃ বীজগর্ভস্থ প্রকৃত বীজাণুর নিদ্রিত 'কল' বিনষ্ট হয় অর্থাৎ বীজের বহির্ভাগে দূষনীয় কোন চিহ্ন না থাকিলেও বীজ অঙ্কুরিত হয় না। এরূপ বীজ প্রায় পূতিগন্ধময় হইয়া থাকে। যতই উৎকৃষ্ট বীজ হউক, সে বীজও গৃহে থাকিবার পর অযত্নহেতু জীবনীশক্তি হীন হইতে পারে।

মাটির দোষেও বীজ অঙ্কুরিত হইতে পারে না। অনেক সময় নোনা মাটিতে বীজ অঙ্কুরিত হয় না, আবার অনেক সময় অঙ্কুরিত হইয়াও মাটির লবণাধিক্যবশতঃ কচি চারার গোড়া অল্পাধিক ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া ভূশায়ী হইয়া পড়ে, ক্রমে মরিয়া যায়। গোবর, খৈল প্রভৃতি উত্তাপজনক টাট্কা সার ভূমিতে সংযোজিত হইবার পর মাটিতে উত্তাপ উদ্ভাবিত হয়। এরূপ সারপ্রদত্ত মাটিতে বীজ বপন করিলে তজ্জাত উত্তাপে বীজ মরিয়া যায়, ফলতঃ চারা জন্মে না।

অনন্তর ইহাও নিত্য ঘটনা যে, আর্দ্র মাটিতে বীজ বপন করিলে উপ্ত হইবার পূর্ব্বেই অতিরিক্ত রস হেতু মরিয়া যায়, অন্যদিকে অতিশয় নীরস মাটিতেও বীজ হইতে সহজে চারা উৎপন্ন হয় না। বীজের উপর সিক্ত ভারী, কিম্বা অধিক মাটি চাপা পড়িলে অঙ্কুরের ব্যাঘাত হয়। গামলা, বাক্স বা ভূমি হউক, যেখানে বীজ বপন করিতে হইবে, তথাকার মাটি

গুঁড়া ও লঘু হওয়া যেমন প্রয়োজন, সরস ও ঝুরা হওয়া তেমনি আবশ্যক। মাটি উত্তমরূপে চূর্ণ করণান্তর তাহার সহিত পাতা-সার বা অর্দ্ধ বিগলিত গোবর-চূর্ণ মিশ্রিত করিলে মাটি হালকা ও ঝুরা হয়। অতঃপর বীজবপনের ২।৩ ঘণ্টা পূর্ব্বে মাটিতে উত্তমরূপে জলসেচন করিয়া রাখিলে সেই জল তাহাতে শোষিত হইয়া যাইবে। অতঃপর সেই মাটি উলট-পালট করিলে বীজ বপনের যোগ্য মাটি প্রস্তুত হয়। বলা বাহুল্য, মাটি যেন কাদাটে না হয়—সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যদি কাদাটে হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহাতে আরও কিছু শুষ্ক মাটি মিশাইয়া দিতে হইবে।

উল্লিখিত উপায় সকল অবলম্বিত হইলেও কোন কোন স্থলে বীজ অঙ্কুরিত হয় না। অনেকেই বীজ বপন করিবার পরেই তাহাতে জল সেচন করেন, তাহার ফলে মাটি দৃঢ়রূপে চাপিয়া যায়, ২।৪ দিন মধ্যে মাটির উপরিভাগ ফাটিয়া যায় এবং সেই সকল ফাটলের ভিতর দিয়া রৌদ্র ও বাতাস প্রবেশের পথ পাইয়া সমগ্র মাটিকে শক্ত করিয়া দেয়, মাটির রস মরিয়া যায়, ফলতঃ বীজের অঙ্কুরোদ্গমে বাধা পড়ে। আবার ইহাও দেখা যায়, প্রতিদিন জলসেচনের ফলে বীজে সর্দ্দি সঞ্চিত হয়, তন্নিবন্ধন বীজ পচিয়া যাইবারও সম্ভাবনা। প্রকৃতপক্ষে বীজবপনের পর জলসেচনের প্রয়োজন হয় না। ক্ষুদ্র ও কোমল বীজ সম্বন্ধে ইহা ধ্রুব সত্য। যে সকল বীজ দীর্ঘকাল পরে অঙ্কুরিত হয় তাহারা গামলায় বা বাক্সে বপিত হইয়া থাকিলে মধ্যে মধ্যে তাহাতে জলসেচন প্রয়োজন। অল্পায়ু তরিতরকারি বা ফুলের বীজ অঙ্কুরিত হইতে সাধারণতঃ ২।৩ দিন, সময় লাগে। এরূপ স্থলে বীজবপনের পর জলসেচন করা কর্ত্তব্য নহে। মাটিতে যে রস থাকে অঙ্কুরোদ্গমের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। বীজ বপিত হইবার পর হইতে অঙ্কুরোদ্গম-কাল পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে পাছে

মাটিতে রসাভাব হয়, এই জন্য বপনের পূর্ব্বে মাটিতে অল্পাধিক পরিমাণে জলসেচনের ব্যবস্থা আছে।

মাটির রস ও ভূমির উত্তাপে ন্যূনাধিক্য না হয় এবং বপিত স্থানের মাটি না বিদীর্ণ হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। উত্তাপ ও রসের সমতা রক্ষার উদ্দেশ্যে বপনকার্য্য শেষ হইলে আধারের উপর একখণ্ড সমতল তক্তা বা একখানি কাগজ প্রসারণ পূর্ব্বক তাহার উপর ঈষৎ দৃঢ় অথচ ধীরভাবে হস্ত সঞ্চালন করিতে হয় এবং তাহা হইলে মাটীর স্ফীতি দূর হয়, বীজ ও মাটি পরস্পর সংলগ্ন হইয়া যায়।

বপনসংক্রান্ত সকল কার্য্য সমাধা করিবার পরেও সাধারণতঃ একটি কার্য্য বাকী থাকিয়া যায়, কিন্তু যে পর্য্যন্ত তাহা শেষ না হয়, সে পর্য্যন্ত বপনের তাবৎ কার্য্যই বাকী বলিয়া মনে হয়। যে কোনও কাজ হউক, তাহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে সম্পন্ন না হওয়া এবং কার্য্যের সমস্তই বাকী থাকা—একই কথা। কোন কাজ অঙ্গহীনভাবে সমাধা করা উচিত নহে। যে কাজের সাড়ে পনর বা পৌনে ষোল আনা নিষ্পন্ন হইয়াছে, তাহার আধ বা সিকি আনা বাকী থাকিলে আমার মনে হয় কাজটার সমস্তটাই বাকী, অধিক কি কাজে যেন হস্তক্ষেপ করা হয় নাই। এক্ষণে যে কাজটী বাকী আছে তাহা সম্পন্ন করিলেই বীজবপনের কার্য্য শেষ হইল। বপন সংক্রান্ত যে ক্ষুদ্র কার্য্যটী বাকী আছে তাহা বীজবপিত স্থানে আবরণ দান। উক্ত আবরণ বা আস্তরণ ইংরাজিতে mulching নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এতদর্থে দানাদার গোবর-সার বা পাতা-সারের মোটা গুঁড়া দ্বারা বপিত বীজ ঢাকিয়া দিতে হয়। এতদ্দ্বারা মাটির মধ্যে যে রস থাকে তাহা শীঘ্র শুষ্কহইতে পায় না, বরং সেই রস অপেক্ষাকৃত ধীরে ধীরে উপরে উঠিয়া উপরিভাগের মাটি সরস রাখে, রৌদ্রের উত্তাপে মাটি অধিক উত্তপ্ত হয় না, মাটি বিদারিত হইতে পায় না।

আস্তরণের আরও উপকারিতা আছে। বীজ বপনের পর কিম্বা বীজ অঙ্কুরিত হইবার পরে বীজপাত্রে বা বীজতলায় জলসেচন করিতে হইলে জলের পতনে মাটি বিচলিত হয় না, উপরিভাগে জল সঞ্চিত হইতেও পারে না, ফলতঃ মাটি দৃঢ় হইতে পায় না। এই সকল কারণে বীজ বপনের পর বীজ-পাত্র বা বীজতলার উপরিভাগে বীজের আকারানুসারে এক যব হইতে ২।৩ যব পুরু করিয়া আস্তরণের উপকরণ প্রসারিত করিয়া দিলে ভাল হয়।

চারা

সব্জীর বীজ অঙ্কুরিত হইতে সাধারণতঃ ২ দিন হইতে ৮।১০ দিন সময় লাগে। ক্ষুদ্র এবং লঘুত্বকাবশিষ্ট বীজ ২।৪ দিবসের মধ্যে অঙ্কুরিত হয় কিন্তু লাউ, কুমড়া প্রভৃতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে ৬।৭ দিন হইতে ৮।১০ দিন সময় লাগে। ভূমিতে রোপিত বড় বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠিলেই তাহার সন্নিহিত তৃণাদি তুলিয়া ফেলিতে হইবে। ভাঁটীতে বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠিলে নবজাত চারাগুলিকে প্রথমতঃ প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে বাতাস লাগাইতে হয় এবং চারাগুলি দিন দিন যত বর্দ্ধিত হইতে থাকে, ততই তাহাদিগকে রৌদ্রাদি সহ্য করাইতে হইবে। এই প্রথাকে Seasoning বা Accustoming কহে। রৌদ্র, বাতাস ও আলোক সংস্পর্শিত না হইলে কচি গাছের কাণ্ডাদি পরিপুষ্ট, সবল ও দৃঢ় হয় না। যে মুহূর্ত্তে বীজ ভেদ করিয়া চারা জন্মে, সেইক্ষণ হইতেই তাহার রৌদ্র আলোক ও বাতাস আবশ্যক হয়।

বীজতলায় চারা ঘনভাবে জন্মিলে অল্পাধিক চারা সাবধানতার সহিত

তুলিয়া লইয়া খালি জায়গায় পুতিয়া দেওয়া উচিত, নতুবা অনেক চারা ঘনভাবে একত্র থাকিলে মরিয়া যাইবার সম্ভাবনা।

চারা যখন নিতান্ত ক্ষুদ্র থাকে তখন তাহাদিগকে প্রচণ্ড রৌদ্র হইতে রক্ষা করিবার জন্য মধ্যাহ্ন হইতে অপরাহ্ন ৪।৫ ঘটীকা পর্য্যন্ত ঢাকিয়া রাখা উচিত। বীজে যেরূপ অতি সাবধানে জলসেচন করিতে হয়, চারা গাছেও সেইরূপ না করিলে জলের আঘাতে ও ভারে কোমল চারা ভাঙ্গিয়া যায় কিম্বা হেলিয়া পড়ে। ঝাঁজরা বা বোমা ভাঁটীর সংলগ্ন করিয়া জল দিলে আর সে আশঙ্কা থাকে না। জল সেচনের অব্যবহিত পরেই গাছ ঢাকা দিলে তাহাতে জল বসিয়া থাকে এবং সেজন্যও অনেক চারা মরিয়া যায়। অতএব চারার অঙ্গের জল যতক্ষণ না শুকাইয়া যায়, ততক্ষণ ভাঁটী খুলিয়া রাখিতে হয়। আকাশ পরিষ্কার থাকিলে নবোদ্গত চারাদিগকে আবরিত করিবার প্রয়োজন নাই।

চারায় জলসেচন করিবার পর মাটি ঈষৎ শুষ্ক হইলে ভাঁটীতে নীড়ান করা আবশ্যক। ২।৩ বার জলসেচনের পর একদিন নীড়ান করিলেই যথেষ্ট। মাটি দৃঢ়ভাবে বসিয়া গেলে জলসেচনে চারার বিশেষ উপকার হয় না, কারণ তখন আর জল মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না। উপরিভাগের মাটি ভিজিয়া গেলেও ভিতরের মাটি সিক্ত হয় না, অগত্যা চারাগাছের রসাভাব হইয়া থাকে। ক্রমে কোমল চারাগুলি বিমর্ষ হইয়া নেতাইয়া পড়ে। ভূপৃষ্ঠের মাটি ঝুরা থাকিলে কোন গাছই সহজেই ম্রিয়মান হয় না। কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, উদ্ভিদকে যথাযোগ্য জল সরবরাহ না করিলে উহাদিগের শ্রীবৃদ্ধি হয় না, ফলন-ফুলনও আশানুরূপ হয় না।

মাটি লোণা হইলে চারাগাছের গোড়া ভাজিয়া যায়, চারা সকল পড়িয়া যায়। যখন চারাগুলি এইরূপে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে দেখা যাইবে,

তখন ভাঁটীর চতুর্দ্দিকে ২।৩ অঙ্গুলি পরিমিত উচ্চ আল বা বাঁধ নির্ম্মাণ করিয়া সেই আল-বেষ্টিত স্থানটী উত্তমরূপে জলপ্লাবিত করিয়া দিলে উপরিভাগের লবণ ভূগর্ভে নামিয়া যাইবে। ভূগর্ভের লবণ উপরিভাগে আসিয়া চারার গোড়া ক্ষত করে। ভাঁটী তৈয়ার করিবার সময়ে তাহার নিম্নে খোয়া বা ঝামা দিবার ব্যবস্থা করা গিয়াছে, তাহার ইহাও একটী কারণ। সমধিক জল দ্বারা মাটি ভিজাইয়া দিলে অতিরিক্ত জলের অংশ নিম্নদেশে চলিয়া যায় এবং সেই সঙ্গে মৃত্তিকাস্থিত লবণাংশকে নিম্নে লইয়া যায়। ইহা বিশেষ স্মরণ রাখা উচিত যে, যে মাটিতে লবণাংশ আছে তাহা শুষ্ক হইলেই উপরিভাগে লবণ ভাসিয়া উঠে, কিন্তু উল্লিখিত প্রণালীতে জল বাঁধিয়া রাখিতে পারিলে লবণাংশ নিম্নে চলিয়া যায়। কোমল চারার মূলদেশ দীর্ঘকাল জলপ্লাবিত থাকিলে চারা মরিয়া যায়। উভয় দিকের সামঞ্জস্য রক্ষার্থ ঈদৃশ স্থানে খৈল বা গোবরের তরল সার দিতে পারিলে ভাল হয়।

কপি, শালগম, বেগুণ প্রভৃতির চারা জমিতে স্থায়ীভাবে রোপিত হইবার পূর্ব্বে ২।৩ বার নাড়িয়া পুতিতে হয়। এই সকল চারায় যাবৎ ৪।৫টী পাতা উদ্গত না হয়, তাবৎকাল তাহাদিগকে স্থানান্তর (transplant) করা উচিত নহে। প্রথমবার চারা স্থানান্তরকরণের সময় ২।৩ অঙ্গুলি ব্যবধানে, এবং দ্বিতীয়বার ৫।৬ অঙ্গুলি ব্যবধানে রোপণ করিতে হইবে। ভাঁটীর চারা সচরাচর দুইবার এবং কখন কখন তিনবার স্থানান্তর করিবার পর স্থায়ীভাবে রোপণ করিতে হয়। চারা উত্তোলনকালে এরূপ সাবধানতা আবশ্যক যে, চারার কোন অঙ্গে বিশেষতঃ মূলাংশে কোনরূপে আঘাত না লাগে। হাপোর বা ভাঁটী হইতে চারা উত্তোলনের পক্ষে দীর্ঘফলক নীড়ান ব্যবহারই প্রশস্ত। হাপোর প্রভৃতি হইতে ঘনভাবে উক্ত চারাদিগকে উঠাইবার জন্য নীড়ান বা খুরপী ব্যবহার না করিয়া

কাষ্ঠ শলাকার সাহায্য লইলে ভাল হয়। কারণ প্রথমোক্ত যন্ত্র ব্যবহারে অনেক গাছের সুকুমার মূল ও কাণ্ড কাটিয়া বা ছিঁড়িয়া যায়, শেষোক্ত প্রকার শলাকা ব্যবহারে সে আশঙ্কা থাকে না।

নানা জাতীয় আলু, মূলজাতীয় আর্টিচোক, ওল, বিভিন্ন জাতীয় কচু প্রভৃতি কতকগুলির মূলকে সচরাচর লোকে বীজ বা 'মুকী' কহে, এবং এই 'মুকী' হইতেই তাহাদিগের চারা উৎপন্ন করিতে হয়। এতদ্‌সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য তাহা প্রস্তাবান্তরে আলোচিত হইল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ক্ষেত্রে চারা রোপণ

একদিকে ভাঁটীতে যেমন চারা প্রতিপালিত হইতে থাকে, অন্যদিকে ইতিমধ্যে জমী কুদ্দালিত করিয়া এবং লাঙ্গল ও মই পরিচালনা দ্বারা মাটি প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হইবে। অল্প-পরিসর-স্থানে লাঙ্গল বা মই পরিচালিত হওয়া সম্ভব নহে, সুতরাং ঈদৃশ স্থানে কোদাল দ্বারাই মাটিকে চূর্ণ করিয়া লওয়া ভিন্ন উপায় নাই। যাহা হউক, মাটি তৈয়ারীর সঙ্গে সঙ্গে তাহাতে সার মিশাইয়া রাখিতে হয়। ক্ষেত্রে চারা রোপনের ২।১ দিন পূর্ব্বে শেষবারের মত মাটিকে একবার উত্তমরূপে উলট-পালট ও সমতল করিয়া ভেলি ও জুলি প্রস্তুত করিতে হইবে। এই সকল কার্য্য যথাসময়ে ঠিক করা থাকিলে পরে অনেক দিকে সুবিধা হয়।

অপরাহ্নে ক্ষেত্রে চারা বসাইতে হয়, কিন্তু আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকিলে

কিম্বা মাটিতে যো না হইলে চারা রোপণ আপাততঃ স্থগিত রাখিয় পরিষ্কার দিনের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে। ইহাতে যদি চারা রোপ করিতে ২।১ দিন বিলম্ব হয় তাহাতে ক্ষতি নাই। যথানিয়মে চারাগু ক্ষেত্রে রোপিত হইলে তাহাতে উত্তমরূপে জলসেচন করিতে হইবে। পর দিন হইতে ৪।৫ দিন দিবাভাগে নবরোপিত চারাগুলিকে কদলী-পেটিকা কচুপাতা বা কলাগাছের বাইল দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিতে হইবে, নতু স্থানান্তরিত চারাগুলি ঝিমাইয়া পড়িবে। গাছগুলি যখন সরলভা দাঁড়াইতে পারিবে তখন বুঝিতে হইবে যে, গাছের শিকড় মাটিতে সংল হইয়াছে। এক্ষণ হইতে আর তাহাদিগকে ঢাকা দিবার আবশ্যকত নাই। রুগ্ন, ক্ষীণ বা মৃতপ্রায় চারা আদৌ ক্ষেত্রে রোপণ করা উচি নহে। অনেক স্থলে ক্ষেত্রে চারা রোপণের সময় গাছের গোড়ায় সা দিবার নিয়ম আছে কিন্তু এক্ষণে যে সার দিতে হইবে তাহা যেন পুরাত ও ঝুরা হয়, নতুবা নূতন সারের সহিত জল সংযুক্ত হইলে মাটির মধে উত্তাপ জন্মিয়া চারাগাছের বিশেষ অনিষ্ট করে। এতদ্ব্যতীত নূতন সা প্রয়োগ করিলে ক্ষেত্রে বিস্তর কীটের উপদ্রব হয় এবং সেই সকল কীট ক্রমান্বয়ে বংশবৃদ্ধি করিয়া সমুদায় ক্ষেত্রের গাছগুলিকে এরূপ নির্দ্দয়ভাবে আক্রমণ করে যে, তাহাদিগের রক্ষা পাইবার আর আশা থাকে না। সারের সহিত রন্ধনশালার বা চিমনীর ভূষা মিশ্রিত করিয়া দিলে পোকা-মাকড়ের তত ভয় থাকে না, তাহা ব্যতীত ভূষার দ্বারা সারের কার্য্যও হইয়া থাকে।

সপ্তম অধ্যায়

সব্‌জীবাগের শত্রু ও মিত্র

এস্থলে ফসলের শত্রুই আমাদিগের শত্রু। আমরা কত যত্ন, কত পরিশ্রম, কত অর্থব্যয় করিয়া চাষ-আবাদ করি, কিন্তু অসংখ্য কীটপতঙ্গ তাহা নষ্ট করিতে যেন বদ্ধপরিকর। এই সকল রক্তবীজের বংশকে ক্ষেত্র হইতে বিদায় করিতে না পারিলে সুশৃঙ্খলে চাষ-আবাদ করা অসম্ভব। ব্যাধির উপশম করিবার চেষ্টা অপেক্ষা তাহা নিবারণের উপায় অবলম্বন করা সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ, কিন্তু ব্যাধি উপস্থিত হইলে তাহারও প্রতিবিধান করা আবশ্যক। সচরাচর যে সকল উদ্ভিদ-শত্রু আমাদিগকে উদ্ব্যস্ত করিয়া থাকে, এস্থলে তাহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করিব। নানাবিধ কীটপতঙ্গ ক্ষেত্রের বিষম শত্রু। উহারা একবারে রাশি রাশি ডিম্ব প্রসব করে এবং সেই সকল ডিম্ব যদি বিনষ্ট করা না যায়, তাহা হইলে তজ্জাত প্রত্যেক কীট যথাসময়ে ডিম্ব প্রসব করিলে কত পোকা জন্মে। এইরূপ দুই তিন বংশকে বিনষ্ট না করিলে সব্‌জীর আবাদ উঠিয়া গিয়া সে ক্ষেত্র ক্রমে কীটেরই আবাদে পরিণত হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং, ক্ষেত্রমধ্যে ইহাদের একটীকেও স্থান দেওয়া কোন মতে উচিত নহে। মৃত্তিকা-মধ্যে বা গাছের কাণ্ডে বা পাতার নিম্নে ডিম বা পোকা দেখিবামাত্র তাহাদিগকে ক্ষেত্র হইতে দূরে ফেলিয়া দিয়া আসা উচিত, বিনষ্ট করিতে পারিলে ভালই হয়। সেই সঙ্গে কীটদষ্ট গাছটীকেও উৎপাটিত করিয়া ফেলিয়া দিলে ভাল হয়, কারণ তাহার কোনও অংশে একটী মাত্র ডিম্ব বা কীট থাকিলে ক্রমে তাহা হইতে নূতন কীট-বংশের উদ্ভব হইবার

সম্ভাবনা। একটী ডিম্বও যদি ভূমিতে স্থান পায়, তাহা হইলে সেই ডিম্ব ফুটিয়া ক্ষেত্রময় ব্যাপিয়া পড়িবে। ইহাদিগের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য অনেকে অনেক ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। আমরা যে সকল উপায়ে অনিষ্টকারী কীট-পতঙ্গের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইয়াছি, এস্থলে তাহারই উল্লেখ করিব।

যে সকল গাছ কীটাক্রান্ত হইয়াছে তৎসমুদায়কে সমূলে উৎপাটিত করিতে পারিলে উত্তম হয় কিন্তু তাহাতে অসুবিধা বোধ করিলে ক্ষত অংশকে সাবানের জলে উত্তমরূপে বারম্বার বিধৌত করিয়া দিতে হয়। মাটির ভিতরে কীটগণ আশ্রয় লইয়া থাকিলে তথায় লবণ, ঝুল, কর্পূর কিম্বা হুঁকার জল অথবা তামাক পাতার জল দিলে উপকার পাওয়া যায় এবং ভবিষ্যতে নিবারণের জন্য গাছের ক্ষত স্থানে ও তাহার চারি পার্শ্বে গন্ধক, তামাক, কর্পূর প্রভৃতির গুঁড়া দিলেও চলিতে পারে। ছাই এবং হরিদ্রাচূর্ণ, কেরোসিন তৈল প্রভৃতি পিপীলিকা-নিবারক। জলের সহিত অতি সামান্য পরিমাণে হিং ও সর্ষপ-খৈল মিশাইয়া ক্ষেত্রে প্রসারিত করিয়া দিলে উইপোকা নষ্ট হয় এবং তথায় আর জন্মে না। গাছের পক্ষে হিং অনিষ্টকারী, সুতরাং উহা যেন গাছে না স্পর্শিত হয় কিম্বা যদিও উহা ব্যবহার করা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে অধিক জলের সহিত অতি সামান্য পরিমাণে ব্যবহার করিতে হইবে।

মাটির মধ্যে কোন স্থানে ইন্দুর বা গন্ধমূষিকের বাসা থাকিলে তাহাতে প্রচুর পরিমাণে গরম জল ঢালিয়া দিলে অথবা গন্ধকের ধোঁয়া দিলে তাহারা পলায়ন করে, কিন্তু এতদপেক্ষা বিষমৌষধি—তাহাদিগের বাসস্থান নষ্ট করিয়া দেওয়া।

রাত্রিকালে নানাজাতীয় কীট পতঙ্গ আসিয়া গাছের কচি পাতা, ফল প্রভৃতি ভক্ষণ করে, গাছের গোড়া কাটিয়া দেয়, ফলতঃ অনেক সময়

আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। পতঙ্গদিগকে দিনের বেলায় অল্পাধিক দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু ধৃত করিতে পারা যায় না। রাত্রিতেই ইহাদিগের উপদ্রব বাড়ে। সব্জীবাগের মধ্যে যে সকল গর্ত্ত থাকে কিম্বা যথায় আবর্জ্জনারাশি সঞ্চিত থাকে সেই সকল স্থানেই উহারা বাস করে। সকল ছিদ্রকে জল প্লাবিত করিয়া দিলে মাটির ভিতর হইতে উহারা উপরে আসে, তখন উহাদিগকে ধরিয়া যাহা কর্ত্তব্য তাহা করা উচিত। ফড়িং, উইচিংড়ী প্রভৃতি পতঙ্গজাতীয় শত্রুদিগকে ধরিবার আর একটী উপায় এই যে, রাত্রিকালে বাগানের মধ্যে স্থানে স্থানে উজ্জ্বল আলোক (hurricane lamp) কিংবা মশাল জ্বালাইয়া ক্ষণকাল রাখিয়া দিলে অনেক দূর হইতেও উহারা সবেগে আসিয়া সেই আলোকের উপরে পড়ে' অনেকে আপনা হইতেই জলন্ত শিখায় পড়িয়া প্রাণ হারায়। যাহারা বাঁচিয়া যায় তাহাদিগকে ধরিয়া পূর্ব্বোক্ত মত ব্যবস্থা করিবে। এই সকল গর্ত্তের মধ্যে অত্যুষ্ণ জল বা তীব্র চুণের জল ঢালিয়া দিলেও উহারা মরিয়া যায় কিম্বা আড্ডা ছাড়িয়া পলায়ন করে।

কীটের উপদ্রব হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য উহাদিগকে প্রতিনিয়ত অন্বেষণ করিয়া ধরিতে হয়। যে সকল গাছের পাতা কোঁকড়াইয়া গিয়াছে অথবা ছিদ্রময় হইয়াছে, তাহার নিকটে খুঁজিলেই প্রায় ইহাদিগকে পাওয়া যায়। তাহা ব্যতীত, যে সকল পাতায় উহারা ডিম্ব প্রসব করে, সেই সকল পাতা সংগ্রহ করিয়া ভূগর্ভ মধ্যে পুতিয়া ফেলা উচিত কিম্বা জ্বালাইয়া দিলেও হয়। দিবাভাগে নানা জাতীয় প্রজাপতি ক্ষেত্রে আসিয়া গাছে ডিম্ব প্রসব করিয়া যায়, ক্রমে সেই সকল ডিম্ব হইতে কীট উৎপন্ন হয়, সুতরাং ক্ষেত্রে প্রজাপতি দেখিলেই ধৃত করা উচিত।

Large white cabbage butterfly জাতীয় যে কীট, তাহা প্রায় দুই ইঞ্চ দীর্ঘ এবং তাহার বর্ণ সবুজ। এক্ এক পত্রে বা গাছে ২।৩ শত কীট জমা হইয়া কাণ্ড পত্রাদি ভক্ষণ করে। ইহাদিগকে ধৃত করাই প্রকৃষ্ট উপায়। দুই দিনের অবহেলায় ইহারা সম্বৎসরের পরিশ্রম ব্যর্থ করিয়া দেয়। ক্ষেত্রে এই সকল কীট-পতঙ্গের উপদ্রব হইলেও উল্লিখিত প্রণালী অবলম্বনীয়।

শৃগাল অতি ধূর্ত্ত ও অনিষ্টকারী। রাত্রিকালে ইহারা দলে দলে আসিয়া ক্ষেত্রের ফসল নষ্ট করে। ইহাদিগকে তাড়াইতে হইলে ক্ষেত্রে দুই একটী কুকুর রাখা আবশ্যক। উক্ত কুকুরদিগকে দিবাভাগে বাঁধিয়া রাখিতে এবং সায়ংকালে ছাড়িয়া দিতে হয়। এরূপ করিলে রাত্রিকালে উহারা আর তথায় আইসে না।

সময়ে সময়ে ক্ষেত্রমধ্যে খরগশ আসিয়া তরিতরকারী নষ্ট করে। ইহারা বড় ভীরুস্বভাব। ক্ষেত্রের চারিদিকে কাঁটা-গাছ, ধঞ্চে বা পাটের কাঠি পুতিয়া দিলে অথবা ক্ষেত্রমধ্যে রাত্রিতে আলোক রাখিলে উহারা ভয়ে তথায় আইসে না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মুরশিদাবাদে 'রইসবাগ' নামক বাগানে বড়ই খরগশের উপদ্রব হওয়ায় উক্ত উপায়াবলম্বনে বিশেষ উপকার পাওয়া গিয়াছিল।

গো, মহিষ, ছাগল প্রভৃতি পশুগণও বাগান-বাগিচার নিত্য শত্রু। ইহাদিগকে কোন মতে ক্ষেত্রমধ্যে প্রবেশ করিতে দেওয়া উচিত নহে। ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবামাত্রই ইহাদিগকে খোঁয়াড়ে প্রেরণ করা উচিত।

নানাবিধ কীট-পতঙ্গাদির উপদ্রব হইতে গাছপালা রক্ষা করিতে হইলে বাগান বা ক্ষেত্রের মধ্যে কোন প্রকার জঞ্জাল বা আগাছা, বন-জঙ্গল থাকিতে দেওয়া উচিত নহে। এই সকল নিভৃত স্থানেই ইহারা উপনিবেশ স্থাপন করিয়া নিরাপদে বাস করে, ঋতুবিশেষে ফসল

বিশেষকে আক্রমণ করে। রাত্রিকালে ইহারা আপনাপন বাসায় গিয়া আশ্রয় লয় এবং দিবাভাগে গাছের পাতা ফুল প্রভৃতি ভক্ষণ করে। পার্শ্ববর্ত্তী জঙ্গল বিনাশ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলে না। দিবাভাগে তাহারা দূর হইতেও আসিয়া ক্ষেত্রস্থিত গাছপালায় ডিম্ব প্রসব করিয়া যায়। ক্রমে সেই সকল ডিম্ব প্রস্ফুটিত হইয়া রাশি রাশি কীট উৎপন্ন হয়। সচরাচর ডিম্ব পত্রের নিম্নতলে দেখিতে পাওয়া যায়। ২।১টী পাতায় ছিদ্র বা আকুঞ্চন দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, ক্ষেত্রে কীট জন্মিয়াছে. তখন যাহা কর্ত্তব্য তাহা বলিয়াছি; কিন্তু ইহাদিগের মূল—প্রজাপতি, ফড়িং প্রভৃতি উড্ডনশীল জীবদিগকে ধ্বংশ করাই প্রশস্ত। এতদুদ্দেশ্যে রাত্রিকালে,—বিশেষতঃ সন্ধ্যার পর, ক্ষেত্রের স্থানে স্থানে শুষ্ক আগাছা বা জঞ্জাল জ্বালাইয়া দিলে বহু পতঙ্গ আসিয়া সেই অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দেয়। ২।৪ দিন উপর্য্যুপরি এইরূপ করিলে তাহারা সমূলে বিনষ্ট হয়। বেহার ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে এই সকল কীট পতঙ্গ ‘কীড়ি’ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

অন্য উপায় এই যে, বাগান বা ক্ষেত্রের মধ্যে রাত্রিকালে একটী জলপূর্ণ পাত্র বা বৃহৎ গামলা রাখিয়া তাহার উপরে বা পার্শ্বে একটি প্রদীপ বা অন্য কোন আলো রাখিয়া দিলে বহুসংখ্যক পতঙ্গ আসিয়া গামলায় পড়িয়া মরিয়া যায়।

বাগ-বাগিচার সর্ব্বাপেক্ষা বিষম শত্রু,—জন-মজুর ও মালীগণ। অনুনয়-বিনয়ে ইহারা গ্রাহ্য করে না, অর্থদণ্ড করিলে অধিকতর চুরি করে, এবং কর্ম্মচ্যুত করিলে গ্রাহ্য না করিয়া অন্য স্থানে গিয়া কাজে নিযুক্ত হয়। যে ব্যক্তি চুরি করে তাহাকে শাস্তি দিলেও অবশিষ্ট লোকের কিছুমাত্র শিক্ষা হয় না। সুতরাং এই পাষণ্ডদিগকে শাসন করিতে হইলে চৌর্য্যাপরাধে কিছুতেই ক্ষমা না করিয়া থানায় চালান

দেওয়ায় কোন দোষ বা অখ্যাতি নাই। প্রথমতঃ,—ইহারা চুরী করিয়া বীজ বিক্রয় করে, অতঃপর ফসল ব্যবহারোযোগী হইলে তাহাও বিক্রয় করে এবং গৃহে লইয়া যায়। এইরূপে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত চুরি করিয়া যাহারা প্রভুর সর্ব্বনাশ করে, তাহাদিগের প্রতি কঠোর হওয়ায় দোষ নাই।

কুকুর, বিড়াল, কাক, ভেক প্রভৃতি কয়েকটী জন্তুর দ্বারা বাগানে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়, সুতরাং তাহাদিগকে না তাড়াইয়া বরং প্রশ্রয় দেওয়া উচিত। ক্ষেত্রে কুকুর থাকিলে তথায় কোন অপরিচিত লোক বা চোর কিম্বা শৃগাল বা খরগশ আসিতে পারে না। বিড়াল থাকিলে ইন্দুরের উপদ্রব কম হয়। শালিক ও কাক থাকিলে তাহারা অনেক পোকা মাকড় ধরিয়া খাইয়া ফেলে। ভেকগণও অনেক পিপীলিকা ও কীট ধরিয়া ভক্ষণকরতঃ ক্ষেত্রস্বামীর প্রভূত উপকার করিয়া থাকে।

অষ্টম অধ্যায়

সব্জীর প্রয়োজনীয়তা

এদেশে শীতকালে কিছুদিন পূর্ব্বে ব্যবহার্য্য উপাদেয় তরকারী ছিল না। লাউ,কুমড়া, ধুঁদুল, ঝিঙে, বার্ত্তাকু, নানাবিধ শাক প্রভৃতি আমাদিগের দেশজ তরকারী, কিন্তু বিগত ৪০।৫০ বৎসরের মধ্যে অনেক প্রকার বিলাতী তরকারী—নানাজাতীয় কপি, শালজম, গাজর, বীট প্রভৃতি প্রবর্ত্তিত হওয়ায় আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য ব্যঞ্জনাদির অনেক পরিবর্ত্তন

হইয়াছে, অনেক প্রকার তরকারী ভক্ষণ করিয়া আমরা তৃপ্ত হইয়া থাকি। প্রতিদিন একই রকম তরকারী মুখরোচক নহে, অধিকন্তু স্বাস্থ্যদায়কও নহে। কিন্তু ইদানীং এই সকল তরকারীর নূতন নূতন রকমেরও আবির্ভাব হইতেছে। আমরা যত প্রকার তরকারী ব্যবহার করিতে জানি, যত প্রকার ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া থাকি, ভারতের কোনও জাতি সেরূপ পারে না। কপি প্রভৃতি পাশ্চাত্য সবজী বটে, কিন্তু সে সকল দেশের অধিবাসীগণ এই সকল তরকারী হইতে আমাদের মত এত অধিক প্রকারের, এবং এমন উপাদেয়, ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতে জানে না। রন্ধনকার্য্যে বঙ্গমহিলা চিরদিনই সিদ্ধহস্তা, এই জন্যই আমাদের দেশে বহুবিধ তরকারী ও ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিবার প্রথা চলিয়া আসিতেছে। আমাদিগের অন্তঃপুর মহিলাগণ ইচ্ছা করিলে ব্যঞ্জনের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করিতে পারেন, কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, এক্ষণে রমণীগণ রন্ধন কার্য্য যে শিক্ষণীয় কার্য্য তাহা মনে করেন না, এই জন্য সে দিকে তাঁহাদিগের ইদানীং ঔদাস্য দেখা যায়। ক্রমে সেই পরম প্রয়োজনীয় নিত্য কলা বাঙ্গালা দেশ পরিত্যাগ করিবে, ফলতঃ পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইবে। অপরাপর দেশে আমাদের রন্ধন প্রণালী প্রচলিত থাকিলে কিংবা প্রবর্ত্তিত হইলে, এতাদৃশ বৃহৎ গার্হস্থ্য কলার একবারে তিরোধান হইবার আশঙ্কা থাকে না, কিন্তু আমাদের রন্ধন-প্রণালী আমাদের বাঙ্গালা দেশ ও বাঙ্গালী জাতির মধ্যেই আবদ্ধ আছে, অপর জাতি গ্রহণ করে নাই, সুতরাং বাঙ্গালা হইতে ইহা বিলুপ্ত হইলে পৃথিবী হইতে ইহা অন্তর্হিত হইবে—ইহা নিশ্চিত।

রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি যত নীতি আছে, তৎসমুদায়ের মধ্যে উদরনীতি যত প্রয়োজনীয় ও সমাজের পরিপুষ্টিজনক এমন আর কিছুই নহে। যে দেশে এত প্রকার ব্যঞ্জন-প্রস্তুত-প্রণালী দীর্ঘকাল হইতে চলিয়া

আসিতেছে; সেখানে ব্যঞ্জনের প্রকার হ্রাস পায়, উপাদেয়তা বিকৃত হয়. ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয়, জাতীয়তার পক্ষেও ঘৃণার কথা।

উল্লিখিত নানাপ্রকার বিলাতী তরকারী এদেশে এখনও বাহুল্যরূপে প্রচলিত হয় নাই। দূরস্থ পল্লীগ্রামে এখনও সে সকল সব্‌জী বিলাসীর ভোগ্যরূপে বিবেচিত হয়, এখনও অনেক স্থানে এ সকল তরকারীর আবাদ পর্য্যন্ত প্রবর্ত্তিত হয় নাই, স্থানীয় কৃষক ও সবজী ব্যবসায়ীগণ আবাদের প্রণালীও জানে না। উত্তম খাদ্য বা পরিধেয় যাহাতে সর্ব্বসাধারণের ভোগ্য হয়, তদ্বিষয়ক চেষ্টা মনুষ্য মাত্রেরই থাকা উচিত। তরকারী ও ব্যঞ্জনের প্রকারাধিক্যের সহিত ক্ষুৎপিপাসায় যেরূপ নিগূঢ় সম্বন্ধ ব্যঞ্জনের উপাদেয়তা সেইরূপ ক্ষুন্নিবৃত্তির ও আস্বাদ-লালসা-তৃপ্তির সেইরূপ সহায়ক। হিন্দু-ভারতবাসী স্বভাবতঃ মৎস্যজীবী নহে, অধিকাংশই নিরামিষাশী, তথাপি আমরা সকলেই যে খাঁটি নিরামিষাশী, তাহা নহে সাধারণ বাঙ্গালী মৎস্য-প্রিয়, সেই সঙ্গে তরকারী-প্রিয়। মৎস্য না হইলে যে আমাদের চলে না তাহাও নহে, কারণ আমাদের মধ্যে বহু ব্যক্তিই একবারে নিরামিষাশী। যাহা হউক আমরা মৎস্য-প্রিয় হইলেও, নানা প্রকার ব্যঞ্জনের মধ্যে মৎস্যের ব্যঞ্জনও আমাদিগের নিকট আদরের সামগ্রী। মোটের উপর আমরা ক্ষেত্রজাত তরিতরকারীর উপর যতটা নির্ভর করি, মৎস্যের উপর তেমন নির্ভর করি না। বিগত ১০।১৫ বৎসর মধ্যে মৎস্যের মূল্য এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে সর্ব্বসাধারণের পক্ষে, অধিক কি, মধ্যবিত্ত গৃহস্থদিগের পক্ষেও যথাযথ পরিমাণে মৎস্য-ভক্ষণ ক্রমে হ্রাস পাইতেছে। মৎস্য-পালন ও মৎস্য ব্যবসায় ধীবরদিগেরই পুরুষানুক্রমিক বৃত্তি এবং তাহাদিগের পক্ষেই উহার আবাদ ও ব্যবসায় সম্ভবপর, কিন্তু সবজী উৎপন্ন করা সকলের পক্ষেই সম্ভব ও সাধ্যায়ত্ত। গৃহস্থ-

মহিলা ও বালকবালিকাগণ বিশ্রামকালেও দু-দশটা গাছ পালন করিয়া অল্পাধিক তরকারী উৎপাদন করিতে, ফলতঃ তদ্দ্বারা সংসারের সাশ্রয় করিতে সমর্থ হইত।

ইদানীং যাবতীয় তরিতরকারী এত মহার্ঘ হইয়াছে যে, গৃহস্থ লোকের পক্ষে তাহা ক্রয় করিয়া ব্যবহারে নিয়োজিত করা অসম্ভবপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের এই নিত্যবৃদ্ধিশীল অভাবের অভিযোগ রাজদ্বারে উপস্থাপিত করিলে কোনই ফল হইবে না। যাহাতে দেশে অধিক ও উত্তম তরকারী উৎপন্ন হইতে পারে, সে বিষয়ে আমাদিগকেই যত্নবান্ হইতে হইবে। যাহার আয়ত্তে যতটুকু ভূমি আছে, তাহাই কার্য্যে নিয়োজিত করিলে সকলের নিজ নিজ অভাব সম্পূর্ণরূপে না হউক, কতক পরিমাণে দূর হইবে—ইহা নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারা যায়।

কৃষিকার্য্য শিক্ষার বিষয়। অনেকে মনে করেন ২।১০টা তরিতরকারী উৎপন্ন করা অতি সহজ কার্য্য, কিন্তু তাহা নহে। ইহার মধ্যে শিক্ষণীয় অনেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আছে। বীজ পুতিলে গাছ জন্মে, তাহাতে ফল-ফুল উৎপন্ন হয়,—এ সবই সত্য, কিন্তু তাহা অন্ধকারে ঢিল নিক্ষেপ মাত্র, কারণ এরূপে বীজ বপনের পরিণাম অনিশ্চিত। হয়ত সে গাছ ফলন্ত হইতে পারে, হয়ত তাহাতে পর্য্যাপ্ত ফল উৎপন্ন হইতে পারে। একদিকে যেরূপ স্বপ্নাতীত সাফল্য লাভের সম্ভাবনা, অন্যদিকে সকল শ্রম, সকল ব্যয়, সকল আশার বিনিময়ে নৈরাশ্য লাভও আশ্চর্য্যের কথা নহে। এইরূপ অনিশ্চিয়তার উপর নির্ভর করিয়া কোন কাজ করা উচিত নহে। কেবল যে গাছটির আবাদ-প্রণালীর প্রক্রিয়া জানিলেই বিচক্ষণ হইতে পারা যায় তাহা নহে। এ সম্বন্ধে মূল সূত্র বিষয়ক জ্ঞান লাভ করিবার চেষ্টা করা উচিত, মাটির উৎকর্ষতা বিধানের জন্য যে সকল উপায় অবলম্বন করা উচিত তদ্বিষয়ে সমধিক লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। কেবল সার-প্রদান, বা

জলসেচনই পরিচর্য্যার চূড়ান্ত নহে। ইহাদিগের মূল উদ্দেশ্য, ক্রিয়া প্রভৃতি অবগত হওয়া আবশ্যক- তবেই কৃষিকার্য্যে সাফল্যলাভ করিতে পারা যায়।

সবজী উৎপাদনের আরও একটী দিক আছে। নানাবিধ সবজী উৎপাদন দ্বারা আমাদের উদরপূর্ত্তি ও রসনাতৃপ্তি হয় তাহা পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছি। সবজী আবাদের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এক্ষণে অন্য দিক দিয়া বিচার করিব। এ কথাও পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, নিত্য ব্যবহার্য্য তরকারীসমূহ যাহাতে সহজলভ্য হয়, সকলেই যাহাতে নানাবিধ তরকারী ব্যবহার করিতে পারে, এই উদ্দেশ্যে ইহার আবাদ বিস্তৃত হওয়া প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। পল্লীমধ্যে এক গৃহস্থের বাড়ীতে কোন তরকারী উৎপন্ন হইলে প্রতিবেশীগণেরও তাহা ভোগে আসে। এ দেশে কেহ কোন জিনিস একাকী ভোজন করিতে জানে না। ক্ষেত্রে হউক বা অঙ্গিনায় হউক, যাহা কিছু শাক পাতা, ফল মূল উৎপন্ন হয়, তাহা পড়্সীকে না দিয়া কেহ খায় না, ইহা আমাদের সনাতন নিয়ম। পল্লীর মধ্যে সকলের বাড়ীতে অল্পাধিক তরিতরকারী উৎপন্ন হইলে পরস্পরের আদান-প্রদানে সকলেই নানাবিধ তরকারী ভক্ষণ করিতে পায়—ইহা কম আহ্লাদের কথা নহে, কম লাভেরও কথা নহে।

কতকগুলি তরকারী অন্ন উদরস্থ করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়, আবার কতকগুলি, শরীরের পুষ্টিসাধনের উদ্দেশ্যে রন্ধনাদিতে নিয়োজিত হয়। কেবলই যে, শাক-পাতা দ্বারা উদরপূর্ণ করিতে হইবে তাহা নহে, উপাদেয় ও পুষ্টিকর তরকারীও ব্যবহার করিতে হইবে। গোল আলু, রাঙ্গা আলু সর্করকন্দ প্রভৃতি পুষ্টিকর সবজী, সুতরাং এ সকলের আবাদ যাহাতে প্রভূত পরিমাণে বিস্তৃত হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। এই সকল তরকারীর আরও বিশেষত্ব এই যে, ভূমি হইতে উত্তোলিত হইবার পরেও দীর্ঘকাল ঘরে থাকিতে পারে সুতরাং ফসলের সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও

নানাজাতীয় আলু, মাণকচু, বীট, শালগম প্রভৃতি তরকারী ভবিষ্যতের কয়েক মাস পর্য্যন্ত ব্যবহারে নিয়োজিত হইতে পারে। পল্লীগ্রামের অনেক গৃহস্থ মরসুমের সময় আলু ক্রয় করিয়া রাখেন, ফলে বারমাসই ব্যবহার করিতে সমর্থ হন। যথাসময়ে রক্ষণীয় তরকারী সঞ্চয় করিয়া রাখিলে সে সকল দ্রব্য অসময়ে ক্রয় করিতে যত অর্থ ব্যয় হয়, তাহাপেক্ষা অনেক কম খরচ হইয়া থাকে, কারণ মরসুমে ফসলের আধিক্যবশতঃ বাজারে তাহার মুল্য কম থাকে। যাঁহারা মরসুমকালে ঈদৃশ তরকারী অধিক পরিমাণে ক্রয় করিয়া যত্নসহকারে রক্ষা করিতে পারেন, তাঁহারা 'দুনা' লাভ করেন, ১ম,—মুল্যের সুলভতা হেতু এক দফা আর্থিক লাভ ; ২য়,—অসময়ে ব্যবহার।

অনন্তর লাভের দিক দিয়া আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, তরি-তরকারীর আবাদ সমূহ লোভনীয়, কারণ একেই ত এক এক বিঘা জমির ধান্য বা গোধুম বা ডাল কলাই অপেক্ষা সেই পরিমিত স্থানে নানাবিধ তরকারি জন্মিলে অপেক্ষাকৃত অধিক লাভ হয়। এই জন্য কৃষক অপেক্ষা সবজী উৎপাদনকারী মালীগণ অধিক অর্থ উপার্জ্জন করে। মালীরা অল্প জমিতে আবাদ করে, কৃষক তাহাপেক্ষা অনেক অধিক জমি আবাদ করে, কিন্তু মালী সেই অল্প জমিতে আবাদ করিয়া স্বচ্ছন্দে দিনাতিপাত করে, আর চাষী সারা বৎসর রৌদ্রবৃষ্টিতে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়াও দুই বেলা আহারের সংস্থান করিতে পারে না।

এতদ্দ্বারা এমন কথা বলা যায় না যে, কৃষকগণ লাঙ্গল-বলদ বিক্রয় করিয়া সবজীর কারবারে প্রবৃত্ত হউক। কৃষক ও উদ্যানক,—উভয়ের ভূমি ও মাটি স্বতন্ত্র, পরিচর্য্যা প্রণালী বিভিন্ন। এই জন্য কৃষকের কার্য্য কৃষকের পক্ষে যেরূপ শোভনীয় ও সুবিধাজনক, মালীর কার্য্য মালীর পক্ষে সেইরূপ উপযোগী ও অবস্থানুকূল। মালী ও কৃষক স্বতন্ত্র বৃত্তিধারী।

মালী পরিশ্রমী, সারা বৎসর সে জমির পরিচর্য্যা করে, বারমাস তাহা হইতে সময়োপযোগী ফসলোৎপাদনের জন্য পরিশ্রম করে, ফলতঃ বারমাসই তাহার উপার্জ্জন, কিন্তু কৃষক ফসলের সময় অল্পাধিক কাজ করিবার সুবিধা পায়, কারণ তাহার যেটুকু জমি তাহা আবাদে নিয়োজিত হইলে অপর কাজ করিবার সময় থাকিলেও স্থান কোথায়? পূর্ব্বেই বলিয়াছি অল্প জমিতেই মালীর যথেষ্ট কাজ হয়। তাহা ব্যতীত মালী নানাবিধ তরিতরকারীর আবাদ করে বলিয়া এক সবজীর সময় অতীত হইতে-না-হইতে অন্য সবজীর আবাদের সময় উপস্থিত হয়, সুতরাং তাহার কাজের অভাব হয় না, জমি পতিত থাকিতে পায় না।

মালীগণ মাটি হইতে ফসল উৎপন্ন না করিয়া সার হইতে তাহা করিতে চেষ্টা পায়। মালীর জমি অল্প, কাজেই সে তাহাতে যথেষ্ট পরিমাণে সার দিতে পারে, জলসেচন করিতে পারে। কৃষকের জমি অধিক কিন্তু তাহাতে যথাবিধি সার দিবার সঙ্গতি তাহার নাই। কৃষকের 'মাটি' প্রায়ই মাঠে ময়দানে বা গ্রামের বাহিরে, অনেক স্থলে অনেক দূরে। এইজন্যও কৃষকগণও সমধিক ও যথাযোগ্য সার ক্ষেত্রে দিতে পারে না। মাঠ-ময়দানের জমি সচরাচর বর্ষায় জলমগ্ন হয় কারণ তাহার নাবাল জমি, সুতরাং বারমাস সবজী আবাদের পক্ষে সুবিধাজনক নহে।

আজকাল দেশের চারিদিকে কৃষি-বিস্তারের কথা যেরূপ আলোচিত হইতেছে, তাহাতে মনে হয় শিক্ষিত ও ভদ্রলোকদিগকে যদি কৃষিকার্য করিতে হয় তাহা হইলে সবজী বা ফল ফুলের আবাদ,—এক কথায় গার্হস্থ্য উদ্যান-কার্য্যই তাঁহাদিগের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক, স্বাস্থ্যকর ও আরামদায়ক।

নবম অধ্যায়

বাঁধা কপি (Cabbage)

এদেশে ক্রমেই ইহার আবাদ বৃদ্ধি পাইতেছে। পূর্ব্বে চাষীগণের ক্ষেত্রে এবং ধনীদিগের উদ্যানে ইহার আবাদ হইত, কিন্তু এক্ষণে অনেক গৃহস্থই ইহার আবাদ করেন। চাষীগণ ব্যতীত অপর লোকের তাহা তাদৃশ আশানুরূপ হয় না। ধনী ও গৃহস্থ লোকের বাগানে কেন যে সুচারুরূপে ফসল হয় না তাহা সামান্য অনুসন্ধান করিলেই বুঝিতে পারা যায়। সব্জী চাষীদিগের অমানুষিক পরিশ্রম ও যত্নই যে তাহাদিগের সাফল্যলাভের কারণ, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই। ইহাদিগের জমির যেরূপ পাট হইয়া থাকে, অপর লোকের জমিতে তাহা হয় না। কৃষকগণ জমিতে গভীর চাষ দেয়, প্রচুর সার দেয়, জমি কোপায় এবং ছেঁচ দেয়। সখের বাগানে মালী-মজুরে যাহা করে, ক্ষেত্রস্বামীকে তাহার উপরেই নির্ভর করিতে হয়। উভয়ের ফসলের তারতম্যের ইহাই মূলীভূত কারণ।

জীরেণ-লব্ধ জমিতে বাঁধাকপি, ফুলকপি, ওলকপি প্রভৃতি মুখরোচক মূল্যবান বিবিধ উৎকৃষ্ট তরকারির আবাদ করা উচিত। বারমাস যে জমিতে কোন-না-কোন তরকারি বা ফসল উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহা স্বভাবতঃই ক্ষীণতেজ হইয়া থাকে। বহু পরিশ্রমে এবং সদ্য সদ্য বহু সার প্রদানেও তাদৃশ ভূমিকে আপাততঃ কার্য্যকরী করিতে পারা যায় না। এইজন্য যে সকল ক্ষেতে কপি প্রভৃতি মূল্যবান ফসলের আবাদ করিতে হয়, সে সকল জমিতে বারমাস ফসল উৎপন্ন করা উচিত নহে।

বিঘাপ্রতি জমিতে কত গাড়ী বা কত মণ সার দিতে হইবে তাহার-

নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারা যায় না। তবে সচরাচর মাটির অবস্থানুসারে বিঘাপ্রতি ৫।৬ হইতে ১০।১২ গাড়ী গোবর দিতে পারা যায়। বেলে ও এঁটেল মাটিতে সমধিক সার দেওয়া উচিত। যে জমিতে কপি জন্মে, তাহাতে অপর কোন ফসলের আবাদ করা উচিত নহে। কপির জন্য ভাদ্র মাসের মধ্যে জমি প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হয়, এজন্য জ্যৈষ্ঠ-আষাড় মাসের মধ্যে ক্ষেত্র কোপাইয়া ক্ষেত্রের আয়তন বিস্তৃত হইলে বারম্বার লাঙ্গল ও মই দিতে হইবে, নতুবা বারম্বার কুদ্দালিত করা উচিত। যত বার লাঙ্গল দেওয়া হইবে, ততবার উত্তমরূপে মই দেওয়া আবশ্যক। প্রথম কোপান্ দিবার পরেই ক্ষেত্রে সার ছড়াইয়া দিতে হয়। সার দিবার পরে যত অধিকবার জমীতে লাঙ্গল ও মই দেওয়া হইবে ততই মাটির সহিত সার ঘনভাবে মিশিয়া যাইবে এবং মাটী আলগা ও ঝুরা হইবে। প্রথমবার হলচালনার সময় হইতে যাবৎ ক্ষেত্রে চারা রোপিত না হয়, তাবৎকাল মধ্যে মধ্যে একবার লাঙ্গল ও মই দিলে তৃণজঙ্গলাদি বিনষ্ট হয় এবং তৎসমুদয় পচিয়া গিয়া মাটীর সহিত মিশিয়া যায়, ফলতঃ ভূমি আরও উর্ব্বরা হয়।

এ সময়ে বর্ষার প্রাদুর্ভাববশতঃ অনেকে ভাঁটির পরিবর্ত্তে গাম্‌লা, বাক্স কিম্বা টবে বীজ বপন করিয়া চারা উৎপন্ন করেন। যাহাতেই বীজ বপন করা হউক, পাত্র বা আধার যেন অপরিষ্কার না হয় এবং পাত্রের তলায় যেন দুই-চারিটী ছিদ্র থাকে। টব বা গামলার মধ্যে এক স্তর খোলা বা পাটকেল প্রসারিত করতঃ হাল্‌কা ও সারযুক্ত মাটি দ্বারা উহা পূর্ণ করিবার পর বীজ বপন করিতে হইবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজের জন্য বাগানের ভাল মাটির সহিত চূর্ণীত পুরাতন পাতাসার বা গোবর-সার মিশাইয়া যে মাটি প্রস্তুত হয় তাহাই প্রশস্ত। এঁটেল, চট্‌চটে বা ভারি মাটিতে বীজ অঙ্কুরিত হইতে বিলম্ব হয়, অনেক স্থলে সুচারুরূপে বীজ অঙ্কুরিত হয় না।

নাবী (late) জাতির বীজ ভাদ্র মাসের শেষভাগ পর্য্যন্ত বপন করা যাইতে পারে।

বাঁধাকপি আশু (early), মাধ্যমিক (intermediate) ও নাবী (late)—এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। বাঁধাকপির অন্য এক উত্তম জাতি আছে—তাহাকে সেভয় কপি (savoy cabbage) কহে। সচরাচর ইহার পাতাগুলি কোঁকড়ান থাকে। এই জাতীয় কপি সচরাচর বাজারে বিক্রয়ার্থ আসে না এবং সাধারণ চাষীগণও ইহার আবাদ অধিক করে না। কিন্তু ইহা যে বাগানে স্থান পাইবার যোগ্য, সে বিষয়ে সংশয় নাই।

বীজ বপন।—বাক্স বা গাম্‌লায় যথানিয়মে বীজ বপন করিয়া বীজের উপরে পাতলাভাবে হাল্‌কা সারাল মাটি চাপা দিয়া হস্ত দ্বারা ধীরে ধীরে চাপিয়া দিতে হইবে। তদনন্তর বীজ-পাত্র দিনের বেলায় অন্ধকার গৃহমধ্যে এবং আকাশ পরিষ্কার থাকিলে সন্ধ্যার পরে ক্ষেত্রে বা বারান্দায় কিম্বা ঘরের দালানে রাখিয়া দিতে হয়। যাবৎ বীজ অঙ্কুরিত না হয়, তাবৎ এইরূপ করিবে এবং অঙ্কুরিত হইলে ক্রমশঃ তাহাদিগকে আলোক ও রৌদ্র সহ্য করাইতে হইবে। সমভাবে আলোক না পাইলে চারাগুলি আলোকের দিকে স্বভাবতঃই হেলিতে চেষ্টা করে এবং বক্রভাব ধারণ করে। এজন্য বারান্দা বা ঘরের দালানে বীজের গাম্‌লা থাকিলে তাহাকে প্রতিদিন এরূপে ঘুরাইয়া দিতে হইবে যে, বহির্ভাগের চারাগুলি ভিতরের দিকে এবং ভিতর দিকের চারাগুলি বাহিরের দিকে আসে। এইরূপ প্রতিনিয়ত করিতে পারিলে, চারাগুলি আর বক্রভাব ধারণ করিতে পারে না।

চারা স্থানান্তর করণ।—চারাগুলির ৩।৪টী পত্র উদগত হইলে সাবধানে গাম্‌লা হইতে উৎপাটিত করিয়া ভাঁটিতে ৩।৪ অঙ্গুলি ব্যবধানে রোপণ করতঃ নবরোপিত চারাগুলিকে সাবধানে ও উত্তমরূপে জলসেচন

করিতে হইবে। সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত ঝাঁজরা (watering can) দ্বারা জলসেচনই প্রশস্ত। জলসেচনকালে জলের বেগে বা আঘাতে কোমল চারা ভাঙ্গিয়া না যায় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। সাবধানতা সত্বেও অনেক চারা ভূশায়ী হইয়া পড়ে। ঈদৃশ শায়িত চারাগুলিকে, জল সেচনের ক্ষণকাল পরে, একটি সরু কাষ্ঠশলাকা দ্বারা দাঁড় করাইয়া দিতে হইবে। ভূমি সংলগ্ন চারাদিগকে এইরূপে দাঁড় করাইয়া না দিলে ইহারা নিজ শক্তিবলে দণ্ডায়মান হইতে পারে না, ফলতঃ মরিয়া যায়। বৃষ্টির সম্ভাবনা না থাকিলে সমস্ত রাত্রি ভাঁটির আবরণ বা ঝাঁপ খুলিয়া রাখিতে হইবে এবং পরদিন প্রাতে ৭।৮ ঘটিকার সময় ঢাকিয়া দিতে হইবে। রোপণের পর ২।৩ দিন এইরূপে পালন করিলে চারাগুলির স্থানান্তরজনিত ক্লেশ দূর হইবে। অনন্তর ২।৩ দিন মধ্যে গাছগুলি সবল হইয়া উঠিলে দিবাভাগে ক্রমশঃ অধিকক্ষণ করিয়া অনাবৃতাবস্থায় রাখিতে হইবে। চারাগুলির ৫।৭টী পাতা জন্মিলে অন্য ভাঁটীতে দ্বিতীয়বার স্থানান্তরিত করিতে হইবে। এইবার স্থানান্তর করিবার সময় চারাদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্থান দিতে হইবে। প্রতিবার স্থানান্তর করিবার সময় চারগুলিকে পূর্ব্বাপেক্ষা ঈষৎ গভীররূপে রোপণ করিতে হইবে এবং দেখিবে—যেন শিকড় প্রসারিত থাকে এবং না ছিঁড়িয়া যায়। সাত-আটটী পাতা জন্মিলেই চারাগুলিকে ক্ষেত্রে স্থায়ীভাবে রোপণ করিতে হইবে। প্রতিবারই স্থানান্তরকালে উৎকৃষ্ট, অর্থাৎ পরিপুষ্ট ও তেজাল চারাগুলি বাছিয়া ভাঁটিতে রোপণ করা উচিত, তৎসঙ্গে শীর্ণ ও নিস্তেজ চারাগুলিকে স্বতন্ত্র স্থানে রোপণ করিয়া যথানিয়মে পালন করিতে হইবে এবং তাহাতে একবার তরল-সার দিলে ভাল হয়। উক্ত উপায় অবলম্বিত হইলে দুর্ব্বল চারাগুলি ক্রমশঃ পরিপুষ্ট ও তেজাল হয়।

আশু এবং ছোট জাতীয় কপির জন্য এক-হাত বা পাঁচ-পোয়া অন্তর ভাসা

বা অগভীর জুলি কাটিয়া সেই জুলির মধ্যে ঐ-মত-স্থান ব্যবধানে এক-একটী চারা যথানিয়মে রোপণ করিতে হয়। নাম্‌লা ও বৃহজ্জাতির চারাদিগকে পৌণে-দুই-হাত অন্তর জুলির মধ্যে দেড় হাত অন্তর বসাইতে হয়। চারা রোপণের পূর্ব্বে জুলির মধ্যে পরিমিত স্থান ব্যবধানে গর্ত্ত খোদিত করিয়া তন্মধ্যে ২।৩ মুষ্টি উত্তম বিগলিত গোবর বা ভেড়ী-সার, সর্ষপ, কার্পাস বা রেড়ীর খৈল গর্ত্তের মাটির সহিত উত্তমরূপে মিশাইয়া দিতে পারিলে ভাল হয়। চারা রোপিত হইলে তাহাতে জলসেচন করিবে। পরদিবস প্রাতে স্থানীয় সুবিধা মত কোনরূপে ঢাকিয়া দেওয়া উচিত। এতদর্থে কদলীপত্র, বাস্‌না অথবা পেটী—সাধারণতঃ সর্ব্বত্র সহজলভ্য বলিয়া ব্যবহৃত হয়। চারাগুলি ২।৩ দিন মধ্যে সহজ অবস্থা লাভ করিলে আবরণ খুলিয়া দিতে হইবে। চারাগুলি মাটিতে উত্তমরূপে সংলগ্ন হইলে ১০।১২ দিন পরে পার্শ্বস্থিত মাটি কাটিয়া গাছের গোড়ায় দিবে এবং ভেলি বা দাঁড়া তুলিয়া দিয়া, ১০।১২ হইতে ২০।২৫ দিন অন্তর একবার জল সেচন দ্বারা জমী ভিজাইয়া দিবে। কতদিন অন্তর ক্ষেত্রে জলসেচন করা উচিত মাটির অবস্থা বুঝিয়া ঠিক করিতে হইবে। বেলে বা কাঁকুরে মাটিতে কিম্বা পাহাড়ী জমিতে অধিক দিন রস থাকে না, সুতরাং জমিতে ঘন ঘন জলসেচন করা উচিত। রসা ও এঁটেল মাটিতে এবং নাবাল জমিতে ঘন ঘন সেচন না করিয়া মাটির অবস্থা বুঝিয়া জলসেচন করা উচিত। জলের বেগে গোড়া হইতেও মাটি সরিয়া যায়, কিন্তু তাহা নিবারণ করিতে হইবে এবং প্রয়োজন বুঝিলে গাছের গোড়ায় পুনরায় মাটি দিতে হইবে। গাছের কাণ্ড অনাবৃত থাকিলে সূর্য্যের সাক্ষাৎ উত্তাপে গাছ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং নিম্নদেশের পাতা সকল ঝরিয়া যায়।

এক্ষণে ক্ষেত্রে জলসেচন ও জমি কোপাইয়া পরিষ্কার করা ভিন্ন অন্য বিশেষ কাজ নাই। অধিক ভেজাল সার দিলে বাঁধাকপি ফাটিয়া যায়।

সময়ে সময়ে কপিক্ষেত্রে নানাবিধ কীট-পতঙ্গাদির উপদ্রব হয়। তাহাদিগকে হস্ত দ্বারা বাছিয়া ফেলিয়া দিতে হয়। বিগত ১৯০১ খৃষ্টাব্দে রাজনগরে কপিক্ষেত্রে বড়ই পোকার উপদ্রব হইয়াছিল। পোকাগুলি ৩।৪ অঙ্গুলি দীর্ঘ হইত। ইহাদিগের গাত্রে ১০।১২টী খাঁজ থাকে। ইহাদিগের ৮টী পা ও ও ৬-টী হুল বা অবলম্বনের জন্য অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পা আছে। গাত্রের স্থানে স্থানে কাল দাগ আছে। উক্ত পোকার নাম Large white cabbage butterfly—উহারা প্রজাপতি জাতীয় অর্থাৎ এই কীট ভবিষ্যতে বড় হইয়া প্রজাপতির রূপ ধারণ করে। ইণ্ডিয়া-গবর্ণমেণ্টের কীটতত্ত্ববিৎ বলেন যে, ক্ষেত্রে প্রজাপতি,—বিশেষতঃ স্ত্রীজাতীয় প্রজাপতি দেখিলেই ধৃত করিলে তাহারা আর ক্ষেত্রমধ্যে ডিম্ব প্রসব করিতে পারে না। কীট ধরিয়া বিনাশ করিতে তিনি পরামর্শ দেন। এই উপায়ই বিশেষ কার্য্যকরী, অধিকন্তু কীটদষ্ট গাছও তুলিয়া ফেলিয়া দিতে পারিলে ভাল হয়।

শীঘ্র ফসল উৎপন্ন করিবার জন্য অনেকে ভরা বর্ষাতেই সকল বীজ একবারে বপন করেন কিন্তু সে সময় বর্ষার আতিশয্যহেতু অনেক বীজ ও চারা নষ্ট হয় এবং ফসলও তাদৃশ আশাজনক হয় না। এজন্য সমুদায় বীজ ঋতুর প্রারম্ভেই না বুনিয়া ক্রমে ক্রমে বুনিলে লাভ আছে। এ সময়ের বারিপাতে ক্ষতি হয় সুতরাং যত বিলম্ব করিয়া বীজ ফেলিতে পারা যায় ততই কপি জাতির পক্ষে শুভকর। রৌদ্র ও শিশির কপির পক্ষে বিশেষ উপকারী। ভাদ্রমাসে যে সমুদয় বীজ বপন করা যায় তাহাদিগের ফসল সুন্দর হইয়া থাকে।

অনেকে মনে করেন যে বাঁধাকপির পাতা না বাঁধিয়া দিলে উহা 'বাঁধে' না অথবা উহা ঠাস্ বা দৃঢ় হয় না। প্রকৃতপক্ষে তাহা ভুল্। যতই গাছ বড় হইতে থাকে, ততই উহা স্বতঃই বাঁধিতে থাকে। উত্তমরূপে

আবাদ করিলে এক একটি কপি পনর সের হইতে আধ মণ পর্য্যন্ত ওজনে ভারী হইয়া থাকে। মোটামুটি ১॥০ হাত অন্তর জুলির মধ্যে ১॥০ হাত ব্যবধানে গাছ বসাইলে প্রতি বিঘা ভূমিতে ২৮০৪টী এবং ২ হাত জুলির মধ্যে ২ হাত ব্যবধানে গাছ বসাইলে ২৭০০ গাছ বসিতে পারে। দুই প্রকারের সমষ্টির মাঝামাঝি একটা ব্যবধান ধরিয়া লইলেও প্রতি বিঘা ভূমিতে ২০০০ হাজারের অধিক কপি উৎপন্ন হয় এবং প্রত্যেক কপি /০ হিসাবে বিক্রয় করিলে, বিঘা প্রতি ১২৫৲ টাকা মূল্যের কপি উৎপন্ন হইতে পারে। ইহা হইতে ২৫৲ খরচ হিসাবে বাদ দিলেও, বিঘা প্রতি ২০০৲ লাভ থাকিতে পারে। ফসলের আকার, দৃঢ়তা, কোমলতা ও আস্বাদ অনুসারে মূল্যের ইতর বিশেষ হইয়া থাকে।

ফুলকপি (Cauliflower)

ফুলকপি বিলাতী সব্‌জী কিন্তু তাহার কয়েকটী জাতি এদেশে স্বাভাবিকতা প্রাপ্ত হইয়া দেশী ফুলকপি নামে অভিহিত হইয়াছে। বেহার, উত্তর-পশ্চিম বা যুক্তপ্রদেশ, পঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশে যে ফুলকপির বীজ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তৎসমুদায় ‘দেশী’ নামে আখ্যাত।

দেশী ও বিলাতী—দুই জাতীয় ফুলকপিই আজকাল এদেশে বহুল পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু দেশী পাটনাই হইতে বিলাতী ফুলকপি যে সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ, সে বিষয়ে কোন দ্বিধা নাই। দেশী জাতি আকারে যে বিলাতী অপেক্ষা ছোট হইয়া থাকে তাহা নহে, কিন্তু শেষোক্ত প্রকারের ফুলের বর্ণ যেমন শুভ্র, আহারকালে তেমনি কোমল ও সুঘ্রাণবিশিষ্ট। দেশী জাতি ইহার বিপরীত, অর্থাৎ তাহার ফলের বর্ণ অল্পাধিক

মলিন হয়, ভোজনকালে তাদৃশ কোমলতা অনুভূত হয় না, অধিকন্তু গন্ধ অতি অপ্রিয় ও তীব্র। নানাবিধ মসলা দিয়া রন্ধন করিলে উহার আঘ্রাণ তত জানিতে পারা যায় না, কিন্তু ফুলকপি ভাতে কিম্বা সিদ্ধ ভোজন করিলে তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। চেষ্টা করিলে যে ইহার দোষ ক্ষালন করিতে পারা যায় না তাহা নহে। প্রকৃষ্ট প্রণালীতে আবাদ করিয়া যে ফসল উৎপন্ন হয়, তাহারই বীজ লইয়া পুনরায় আবাদ করিলে উহার জাতিগত উৎকর্ষতা রক্ষা হইতে পারে। দেশের বর্ত্তমান দ্রব্যের উন্নতি সাধনের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া বিলাতী সামগ্রী প্রবর্ত্তন করা আমাদের প্রকৃতিগত হইয়া পড়িয়াছে এবং সেই কারণেই আমাদের সকল শিল্প-পণ্যাদি অধঃপাতে গিয়াছে ও যাইতেছে।

শ্রাবণের প্রথম সপ্তাহ হইতে ভাদ্রমাসের শেষ সপ্তাহ পর্য্যন্ত ফুলকপির বীজ বপনের সময়। বেহার, যুক্তপ্রদেশে উড়িষ্যা অঞ্চলে বাঙ্গালা দেশ অপেক্ষা অগ্রে বীজ বপন করা যাইতে পারে। কিন্তু ভরা শীতের ফুলকপিই উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। আশু জাতীয় কপির বীজ সর্ব্বাগ্রে বপনীয়। তৎপরে মাধ্যমিক, এবং অবশেষে নাবী জাতীয় বীজ বপন করিতে হইবে। বর্ষা থাকিতে যে সকল বীজ বপনীয়, তাহা গামলা বা বাক্সে বপণ করিতে হইবে। নামলা বা নাবী (late) কপির বীজ বপণ করিবার সময় বর্ষা অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়া আসে, সুতরাং তখন ভাটীতে বীজ বপন করিলে ক্ষতি নাই। বীজ ও চারাপালন সম্বন্ধে বাঁধাকপির নিয়ম অবলম্বন করিলেই চলিবে।

আষাঢ় মাস হইতে জমিতে বারম্বার চাষ দিয়া বিঘা প্রতি ১০।১২ গাড়ী গোবর, এবং ক্ষেতে চারা পুতিবার সময়ে প্রতি চারার গর্ত্তে তিন-চারি মুষ্টি গোয়াল-ঘরের পুরাতন আবর্জ্জনা কিম্বা ঠাণ্ডা খৈলসার কিম্বা মিশ্র সার দিতে হয়। ছোট এবং আশু জাতীয় কপির জন্য ২॥০ ফুট

অন্তর জুলির মধ্যে ১।০-হাত ব্যবধানে চারা বসাইতে হয়। বৃহজ্জাতীয় কপির পক্ষে ২-হাত অন্তর জুলির মধ্যে ১॥০-হাত ব্যবধান রাখা উচিত।

চারাগুলি যেমন বড় হইতে থাকিবে, তেমনি তাহাদিগের গোড়ায় মাটি তুলিয়া সরাসরি ভেলি বা দাঁড়া করিয়া দেওয়া উচিত এবং ক্ষেত্রে নিয়মিতরূপে ১০।১২ দিন অন্তর একবার ছেঁচ, এবং মাটিতে যো হইলে, জমি কোপাইয়া দেওয়া আবশ্যক। জমি কোপাইবার সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যেন মাটি উল্টাইয়া পড়ে। পরে মাটি চূর্ণ করিয়া দিতে হইবে।

গাছে ফুল দেখা দিলে, সেই গাছ হইতেই নিম্নভাগের ২।১টি পাতা ভাঙ্গিয়া ফুল ঢাকিয়া দিলে ভাল হয়। এরূপ না করিলে রৌদ্রে ফুলের কোমলতা নষ্ট হয়, আস্বাদের বিপর্য্যয় ঘটে এবং বর্ণও হরিদ্রাভ হইবার সম্ভাবনা। ফুল প্রস্ফুটিত হইবার অগ্রেই অর্থাৎ ঘন ও দৃঢ় থাকিতেই, ব্যবহারোপযোগী হয়, কিন্তু ফুল খুলিয়া গেলে স্বাদ ও বাস কমিয়া যায়।

গাছে ফুল দেখা দিলে প্রত্যেক গাছের গোড়ায় খৈলের বা অস্থিচূর্ণের তরলসার দুই-একবার দিতে পারিলে ফুল বৃহদাকারের হইয়া থাকে।

অনেক রকম কীট চারা-গাছের অনিষ্ট করে, সুতরাং গাছে যখন পোকার আবির্ভাব হয়, তখন গাছের পাতায় ছাই ছড়াইয়া দিতে পারিলে ভাল হয় অথবা জলের সহিত ফিনাইল (Phenyle) মিশ্রিত করিয়া গাছের উপর ছড়াইয়া দিলেও বিশেষ উপকার দর্শে। সূক্ষ্ম কীটগ্রস্ত পত্র বা গাছ ক্ষেত্র হইতে দূর করিতে হয়।

হিমপ্রধান ও পার্ব্বত্য প্রদেশে ফাল্গুনের শেষভাগ হইতে বৈশাখের শেষ পর্য্যন্ত বীজ বপনের সময়। আবাদ ও পরিচর্য্যা সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত পদ্ধতি ভিন্ন অন্য কোন বিশেষ নিয়ম নাই, কেবল সময়ের অগ্রপশ্চাৎ মাত্র।

ওলকপি (khol khol or khol rabi)

ওলকপি গাছে যে স্থূল, শাঁসাল, স্ফীত কাণ্ড জন্মে তাহাই ভোজ্য। ইহার ভোজ্যাংশ মৃত্তিকার উপরিভাগে থাকে, সুতরাং অধিক দিন ক্ষেত্রে থাকিলে কঠিন ও ছিবড়া-বিশিষ্ট হইয়া যায় এবং তখন উহা মানুষের খাদ্যের অযোগ্য হইয়া পড়ে।

যে প্রণালীতে বাঁধাকপির আবাদ করিতে হয়, ইহার জন্যও সেই সকল নিয়মই প্রশস্ত। ভাদ্র-আশ্বিন মাসে বাঁধাকপির প্রণালীতে চারা উৎপন্ন ও পালন করিয়া কার্ত্তিক মাসে চৌকায় এক ফুট ব্যবধানে ওলকপির চারা রোপণ করিতে হইবে। শীঘ্র শীঘ্র বর্দ্ধিত করিবার জন্য গাছের গোঁড়ায় মধ্যে মধ্যে তরল-সার দিলে অল্পদিন মধ্যেই কপিগুলি বড় হয় এবং আহারোপযোগী হয়। ক্ষেত্রে অধিক দিন না রাখিয়া, বালকদিগের খেলিবার গোলা বা মাঝারি বেলের আকার প্রাপ্ত হইলেই আহারোপযোগী হইয়া থাকে, ক্ষেত্রে রোপণ করিবার দিন হইতে ছয় সপ্তাহ মধ্যেই-ওলকপি আহারোপযোগী হয়। ওলকপি পুষ্টিকর তরকারি। দীর্ঘকাল ক্ষেত্রে রাখিয়া বৃহদাকার করিবার চেষ্টা করিলে গাঁট কঠিন হইয়া যায় ফলতঃ তাহা অখাদ্য মধ্যে পরিগণিত হয়।

সচরাচর তিন বর্ণের ওলকপি দেখা যায়,—সবুজ, সাদা ও বেগুণী। কিছুদিন পূর্ব্বে হোয়াইট ভিয়েনা (White Vienna) পর্পল জায়াণ্ট (Purple Giant) হোয়াইট জায়াণ্ট লেট (White giant late) এবং গলিয়াথ (Goliath)—এই কয় জাতি আবাদযোগ্যরূপে পরিগণিত ছিল কিন্তু ইদানীং আরও কয়েকটী জাতির আবির্ভাব হইয়াছে, তৎসমুদায়ই আবাদযোগ্য।

শালজম (Turnip)

শালজম কন্দ-জাতীয় উপাদেয় তরকারী। হাল্‌কা-দোআঁশ মৃত্তিকায় উত্তম জন্মে। ভাদ্র মাসে যথানিয়মে জমি প্রস্তুত করিয়া সেই সঙ্গে কাঠা প্রতি ৭।৮ সের হিসাবে খৈল দিয়া মাটির সহিত উত্তমরূপে মিশাল করিতে হইবে। পরে যথানিয়মে পটি তৈয়ার করিয়া বীজ বপন করিবে।

ভাদ্র মাসের শেষভাগ হইতে কার্ত্তিক মাসের প্রথমার্দ্ধ কালের মধ্যে গামলা, বাক্স বা ভাঁটীতে ইহার বীজ বপন করিতে হয়। চারা কিছু বড় হইলে অপর ভাঁটীতে ৩।৪ অঙ্গুলি অন্তর রোপণ করিয়া যথানিয়মে পালন করিতে হইবে। অতঃপর এই সকল চারায় ৭।৮টী পাতা উদ্গত হইলে পটীতে ২২-অঙ্গুলি হইতে ১৫ অঙ্গুলি ব্যবধানে এক-একটী চারা রোপণ করিতে হইবে। চারা উৎপাটনকালে শিকড় যেন ছিঁড়িয়া না যায়, অধিক কি, কিঞ্চিন্মাত্রও আঘাত প্রাপ্ত না হয় তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। মাটির অবস্থা বুঝিয়া সপ্তাহে একবার উত্তমরূপে ছেঁচ দিয়া চৌকাগুলি ভিজাইয়া দিবে এবং সেই জল মাটিতে শোষিত হইলে এবং পরে মাটিতে যো হইলে নিড়ান দ্বারা মাটি খুঁড়িয়া চুর্ণ করিয়া দিবে। পটী সর্ব্বদা পরিষ্কার থাকা আবশ্যক।

কন্দের আকারের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কোমলত্বের প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত, কারণ অধিক দিবস রৌদ্রে থাকিলে কন্দের শস্যের স্বাদ ও কোমলতা নষ্ট হইয়া যায়। কন্দগুলি পার্শ্বস্থিত মাটির দ্বারা আবৃত থাকিলে তাদৃশ কঠিন হইতে পায় না। শ্রাবণ মাস হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত ১৫।২০ দিবস অন্তর বীজ বপন করিলে আশ্বিন মাস হইতে ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত শালজম পাওয়া যাইতে পারে। সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারিলে উহা মাসাধিক কাল গৃহ মধ্যে থাকিতে পারে। সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইলে

ক্ষেত্র হইতে কন্দগুলি উঠাইয়া জলে উত্তমরূপে ধৌত করতঃ কয়েক ঘণ্টা রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া সার্দ্দিহীন স্থানে বালুকা মধ্যে রাখিলে অনেক দিন থাকিতে পারে। প্রত্যেক কন্দকে ৪।৫ বা ৭।৮ খণ্ডে বিভক্ত করিয়া রৌদ্রে উত্তমরূপে শুকাইয়া রাখিয়া দিলেও ৪।৫ মাস বা ততোধিককাল সঞ্চিত থাকিতে পারে। আবশ্যকমত সেই শুষ্ক খণ্ডগুলিকে জলসিক্ত করণান্তর রন্ধন করিলে উত্তম ব্যঞ্জন প্রস্তুত হয়। নানাবিধ মসলা সংযোগে শালজমের উত্তম আচার প্রস্তুত হইতে পারে।

শালজমের অন্যতম জাতির নাম,—রটা-বেগা (Rata baga)। উহার স্বাদ সুমিষ্ট। ইয়ুরোপে গৃহপালিত পশুদিগের আহারের জন্য শালজম ও রটা-বেগার যথেষ্ট আবাদ হইয়া থাকে। পয়স্বিনী গাভীগণ শালজম বা রটা-বেগাসমন্বিত 'জাব' পাইলে অধিকতর দুধ প্রদান করে, এবং যে দুগ্ধ প্রদান করে তাহা গাঢ়, সুস্বাদু ও সুমিষ্ট হয়।

বাঙ্গালা দেশে শালজম্ শব্দ শালগামে পরিণত হইয়াছে কিন্তু এতদুভয় শব্দই প্রাচীন সাহিত্য মধ্যে পাওয়া যায় না কিন্তু বাঙ্গালায় উহা শালগম নামে অভিহিত হওয়ায় অনেক হিন্দু বিধবা রমণী ইহা ভক্ষণ করেন না। শালগ্রাম শিলার নামানুরূপ শব্দ—শালগম। এই জন্যই বোধ হয় তাঁহারা 'শালগম' ভক্ষণ করেন না কিন্তু ইহার প্রকৃত নাম যে শালজম্ তাহা তাঁহাদিগের অবগত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

গাজর (Carrot)

এদেশে শালজমের ন্যায় দেশী ও বিলাতী—এই দুই জাতীয় গাজরের আবাদ হইয়া থাকে। দেশীয় গাজরের আকার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এবং তাহার মূল কৃষ্ণাভ-লাল হয়। দেশী গাজর মনুষ্যের আহারোপযোগী

নহে। সাধারণতঃ তাহা গো, অশ্ব প্রভৃতি গৃহপালিত পশুদিগের আহারের জন্য ব্যবহৃত হয়। গাজরের জাব পাইলে পশুগণ বলিষ্ঠ হয়। গৃহপালিত গবাদি পশুদিগকে স্থূলকায় করিবার জন্য ইয়ুরোপ ও আমেরকায় উহাদিগকে গাজর খাওয়ান হইয়া থাকে। গাভীদিগকে গাজর খাওয়াইলে কেবল যে উহারা বলিষ্ঠ ও স্থূলকায় হয় তাহা নহে, উহারা যে দুগ্ধ প্রদান করে, সে দুগ্ধজাত মাখন অতি উপাদেয় হয়।

মনুষ্যের ব্যবহারের জন্য গাজর উৎপন্ন করিতে হইলে বিলাতী বীজ ব্যবহার করাই যুক্তিসঙ্গত। প্রথমোক্ত গাজর, সবজী-গাজর বা Garden carrot, এবং শেষোক্ত গাজর ক্ষেতী-গাজর বা Field carrot নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

সব্জী গাজর ;—গাজর কন্দজাতীয় সব্জী। ইহার জন্য সাধারণ দোআঁশ মাটি এবং গভীর চাষের আবশ্যক। দাঁড়া কোদাল দ্বারা জমি কোপাইয়া মাটি চূর্ণ করতঃ মাটির সঙ্গে সার মিশ্রিত করিলে মাটি ঝুরা ও সারাল হয়। পাতা-সার এবং নূতন ঝুরা গোবর সার দিলে মাটি লঘু ও ফাঁপা হইয়া থাকে। মাটি তৈয়ার হইলে পটী বাঁধিয়া তন্মধ্যে বীজ বপন করিবে। বপনীয় বীজের সহিত অল্পাধিক ঝুরা মাটি বা সার মিশ্রিত করিলে দানা সকল বিস্তৃত হইয়া পতিত হয় অন্যথা সর্ব্বত্র সমভাবে বিস্তৃত হইয়া পড়ে না, ফলতঃ চারা সকল ঘনভাবে জন্মে। গাজরের বীজ অঙ্কুরিত হইতে অনেক বিলম্ব হয় কিন্তু অনেকে এই কারণ অবগত না থাকায় বীজ বপনের পর কয়েক দিবস মধ্যে উহার অঙ্কুর দেখা না দিলে, তৎপ্রতি অবহেলা করিয়া থাকেন। বীজ বপনকাল হইতে অঙ্কুরিত হইবার জন্য ১০।১৫ দিন অপেক্ষা করা উচিত। শীঘ্র অঙ্কুরিত হইবার জন্য গাজর বীজ ১০।১২ ঘণ্টা কাল কাপড়ের পুঁটুলির মধ্যে বাঁধিয়া জলে ভিজাইয়া রাখিতে

হয়। প্রত্যুষে ভিজাইয়া রাখিলে সায়ংকালে বপন করিতে পারা যায়। উক্ত উপায় অবলম্বিত হইলে ৩।৪ দিবসের মধ্যে বীজ অঙ্কুরিত হয়। মাটি শুষ্ক হইয়া গেলে বীজ অঙ্কুরিত হইতে অধিকতর কালবিলম্ব হয়, কিম্বা মাটি কঠিন হইয়া যাওয়ায় আদৌ অঙ্কুরিত হইতে সমর্থ হয় না। পটিতে বীজ ছড়াইয়া দিয়া মাটি চাপা দিতে হয় এবং যাবৎ না অঙ্কুরিত হয় তাবৎকাল পর্য্যন্ত দিবাভাগে দরমা বা খড়ের ঝাঁপ দিয়া পটি ঢাকিয়া রাখা উচিত।

আশ্বিন মাসের শেষভাগ হইতে পূরা কার্ত্তিক মাস বীজ বপনের প্রশস্ত সময়। কাঠা পরিমিত পটিতে মাটি অনুসারে ১ গাড়ী বা ২ গাড়ী গোবর সার অথবা ৭।৮ সের খৈল চূর্ণ দিলেই চলিতে পারে। বীজ অঙ্কুরিত হইলে, যে সকল স্থানে ঘনরূপে চারা জন্মে সেখান হইতে অল্পাধিক চারা উৎপাটিত করিয়া ফেলিতে হইবে। গাজরের চারা স্থানান্তরিত করিবার প্রথা নাই। গাজরের পটীতে সমধিক পরিমাণে জলসেচন করিতে হইবে এবং পটীতে যো হইলে নীড়ান কিম্বা কাষ্ঠ শলাকা দ্বারা মাটী খুঁড়িয়া দিতে হইবে। বলা বাহুল্য,—মাটি সর্ব্বদা স্ফীত থাকা উচিত।

ক্ষেত্রী-গাজর।—ইহা কৃষির অন্তর্গত ফসল, সুতরাং কৃষিমতে ইহার আবাদ করিতে হয়। কার্ত্তিক মাসে গভীর কর্ষণ দ্বারা মাটি প্রস্তুত করিতে হইবে। গো-শালার আবর্জ্জনা ও ছাই সাররূপে ক্ষেত্রে প্রসারিত করিয়া দিলে ভাল হয়। জমি প্রস্তুত হইলে বীজ ছড়াইয়া হাল্‌কা বিদে সাহায্যে ক্ষেতের মাটি বিচলিত করণান্তর চৌকী বা মই দ্বারা মাটি চাপিয়া দিতে হইবে। ইহার আবাদের আর কিছু বিশেষ পাট নাই।

Aphis dauci নামক এক জাতীয় কীট আছে। তাহারা গাজরের

পরম শত্রু, কিন্তু ইহাদিগের আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য মাটির সহিত ঝুল মিশাইয়া দিলে উপকার হয়। ঝুলের তীব্রতায় কীটগণ মাটিতে থাকিতে পারে না, উপরন্তু ঝুলের সংশ্রবে মাটি সারবান হইয়া ফসলের বিশেষ উপকার করে।

আকার, বর্ণ, গুণ ও স্বাদ অনুসারে গাজরের অনেক প্রকারভেদ হইয়াছে। কোন জাতীয় গাজরের আকার প্রকার লম্বা জাতীয় মূলার ন্যায়, কোনটী লাল, কোনটী হরিদ্রাবর্ণের ইত্যাদি। সকল জাতিরই পরিপুষ্ট হইবার একটা নির্দ্দিষ্ট সময় আছে। যখন যে জাতি পরিপুষ্ট হইয়া উঠিবে, তখনই তাহারা সংগৃহীত হইবার উপযোগী হয়। ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করিতে হইলে অতি যত্ন-সহকারে গাজরগুলিকে ভূমি হইতে উঠাইয়া তাহাদিগের শিরোভাগের ১ বা ২ অঙ্গুলি পরিমাণ ছেদন পূর্ব্বক বাদ দিয়া ২।৩ দিন বায়ুসঞ্চালিত ছায়াবিশিষ্ট স্থানে রাখিয়া দিতে হয়। তদনন্তর শুষ্ক বালি বা ঝুরা মাটির মধ্যে রাখিয়া দিলে ভবিষ্যতে প্রয়োজনমত বাহির করিয়া ব্যবহার করিতে পারা যায়। শালজমের ন্যায় খণ্ড খণ্ড করতঃ শুকাইয়া, রাখিলে পরে ব্যবহার করা চলিতে পারে।

বীট (Beet)

বীটের হিন্দী নাম চকুন্দর। কলিকাতা অঞ্চলে অনেকে ইহাকে বীটপালঙ নামে অভিহিত করেন। ইহাদিগের কন্দ মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রোথিত থাকে এবং তাহাই তরকারিরূপে ব্যবহৃত হয়। বীটের বর্ণ ঘোর রক্তিম এবং স্বাদ অতিশয় মিষ্ট। জার্ম্মেণী ও অষ্ট্রীয়া দেশে বীট

হইতে চিনি প্রস্তুত হয় এবং সেই চিনি ইদানীং পৃথিবীর নানাদেশে বহুল পরিমাণে প্রচলিত হইয়াছে।

দো-আঁশ হাল্কা মাটিতে বীট উত্তম জন্মে। বীটের মূল একহাত পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয়। ইহার আবাদের জন্য গভীর কর্ষণ প্রয়োজন। অস্থি-চূর্ণ ও রেড়ীর খৈল ইহার পক্ষে উত্তম সার। বীট অল্প পরিসরব্যাপী সব্জী, সুতরাং তাহার জন্য চৌকা অপেক্ষা পটীই ব্যবস্থা। মাটিতে অস্থিসার সংযোজিত করিতে হইলে আষাঢ় মাসের মধ্যেই পটির মধ্যে তাহা প্রসারিত করিয়া যথানিয়মে মাটির সহিত মিশাইয়া রাখিতে হইবে, ফলতঃ ভাদ্র মাস মধ্যে অস্থি বিগলিত হইয়া ফসলের আহরণোপযোগী হইয়া উঠিবে। বীজ অথবা চারা রোপণের সময় মাটিতে অস্থিচূর্ণ দিলে ফসলের বিশেষ উপকার দর্শে না। ভূমিতে চারা রোপণের এক সপ্তাহ পূর্ব্বে চূর্ণ খৈল-সার দিলে ভাল হয়। এক কাঠা পরিমাণ পটীতে /৪ সের বিগলিত অস্থিচূর্ণ এবং দশসের রেড়ী বা সর্ষপ খৈল যথেষ্ট।

ভাদ্রমাসে বীজ বপন করিতে হয়। যদি সে সময়ে বর্ষাধিক্য দেখা যায়, অথবা যদি শ্রাবণ মাসে বীজ বপন করিবার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে ভাঁটীর পরিবর্ত্তে গাম্লাতেই বীজ বপন করা উচিত। গাম্লাতেই হউক বা ভাঁটীতেই হউক, মাটি হস্ত দ্বারা চাপিয়া লইয়া দুই অঙ্গুলি ব্যবধানে আধ ইঞ্চ মৃত্তিকার ভিতরে বীজ পুতিতে হইবে। চারাগুলি চারি অঙ্গুলি পরিমাণ বড় হইলে পটিতে যত্নসহকারে আধহাত ব্যবধানে বসাইতে হয়। চারা তুলিবার সময় এরূপ সতর্কতা আবশ্যক যে, উহার শিকড় কিছুতেই না আঘাত পায়। পটিতে চারাগুলির গলা পর্য্যন্ত ডুবাইয়া রোপণ করিতে হইবে। সপ্তাহে একবার করিয়া পটিতে জল দিবে, মধ্যে মধ্যে নীড়ান দ্বারা মাটি আল্‌গা করিয়া তৃণমুক্ত করিয়া দিবে। লবণ ইহার বিশেষ সার। মধ্যে মধ্যে লবণের জল দিলে

বীটের বিশেষ উপকার হয়। ফসলের মধ্যমাবস্থায় কন্দমূলে পনর ভাগ মাটির সহিত এক ভাগ লবণ মিশাইয়া দিলেও চলিতে পারে। কন্দ,—মাটির উপরে জাগিয়া উঠিলে অর্থাৎ উপরে দেখা গেলে মাটি দ্বারা ঢাকিয়া দিতে হয়, নতুবা কন্দ শক্ত, ছিব্‌ড়া বিশিষ্ট ও বিস্বাদ হয়।

ক্ষেত্র হইতে বীট উঠাইতে কন্দে যেন কোনরূপ আঘাত না লাগে এরূপ সাবধানে বীট উত্তোলন করিতে হয় নতুবা স্বাদের ব্যতিক্রম হয়।

শীতপ্রধান পার্ব্বত্য প্রদেশে চৈত্র হইতে জ্যৈষ্ঠমাস পর্য্যন্ত বীজ বপনের সময়।

ব্রকোলি (Broccoli)

ফুলকপির সহিত ইহার অনেক সাদৃশ থাকায় অনেকে ইহাকে ফুলকপির অন্যতম জাতি মধ্যে গণনা করেন। ফুলকপির ন্যায় ব্রকোলিও স্বভাবজাত বাঁধাকপি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ব্রকোলি পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইতে ফুলকপি অপেক্ষা অধিক সময় লইয়া থাকে। সমতল দেশে আবাদ হইতে প্রায় দেখা যায় না, কারণ ফুলকপিতেই যথেষ্ট হয়। ব্রকোলি শীত প্রধান দেশের উপযোগী ফসল।

ফুলকপির জন্য যেরূপ জমী ও সারের প্রয়োজন ব্রকোলির পক্ষেও অবিকল তাহাই। ভাদ্রমাসে গাম্‌লায় চারা উৎপন্ন করিয়া যথানিয়মে ভাঁটীতে স্থানান্তরিত করিবে। অনন্তর চারাগুলি ৮।১০টী পাতাবিশিষ্ট হইলে আশ্বিন মাসের শেষভাগ হইতে কার্ত্তিক মাসের মধ্যেই ক্ষেতে স্থায়ীরূপে বসাইয়া দিবে এবং ফুলকপির ন্যায় পরিচর্য্যা করিবে। গাছের মাথায় ফুল দেখা দিলে সেই গাছের দুই একটী পাতা ভাঙ্গিয়া তাহার

উপরে চাপা দিবে, নতুবা রৌদ্রে ফুল বিবর্ণ হইয়া যায়, ফলতঃ স্বাদ ও কোমলতার ব্যতিক্রম ঘটে।

ব্রসেল্স (Brussels Sprouts)

ব্রসেলের অন্যতম দেশী নাম,—গাছ-কপি। ব্রসেল্ বাঁধাকপির জাতি হইলেও, বাঁধাকপি হইতে ইহার প্রকৃতি স্বতন্ত্র। বাঁধাকপির একটী 'মাথা' হইয়া থাকে, কিন্তু ব্রসেলের গাছ দুই বা আড়াই হাত দীর্ঘ হয় এবং তাহার কাণ্ডের গাত্রের প্রায় প্রত্যেক গ্রন্থিতে বেলের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাঁধাকপি জন্মিয়া থাকে। উল্লিখিত কপিগুলি অবিকল ক্ষুদ্রক্ষুদ্র বাঁধাকপির ন্যায়। যত্নপূর্ব্বক আবাদ করিলে সমতল দেশে জন্মিতে পারে। শীতের শেষভাগে ইহা জন্মিয়া থাকে এবং সে সময়ে বাঁধাকপি বাজারে যথেষ্ট পাওয়া যায়। তৎপরে ইহাও দেখা যায় যে, শীতের শেষভাগের কপির মত সুস্বাদ হয় না। যদি ভরা শীতে ব্রজসেল্ উৎপন্ন করিতে পারা যায়, তাহা হইলে সুবিধা আছে। সাধারণতঃ, ইহা শীতপ্রধান দেশের আবহাওয়ার উপযোগী তরকারি। দারজিলিং, মশুরী, শিলং, ব্যাঙ্গালোর প্রভৃতি স্থানে সহজেই আবাদ করিতে পারা যায়।

ভাদ্রমাসের প্রারম্ভেই ভাঁটীতে বীজ বপন করিতে হইবে এবং যথানিয়মে লালনপালন করিয়া চারাগুলি ৭।৮ অঙ্গুলি বড় হইলে ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হইবে। তিন-পোয়া-হাত অন্তর শ্রেণীতে ১৮ ইঞ্চ অর্থাৎ একহাত ব্যবধানে এক একটী চারা বসাইতে হয়। ব্রসেলের ক্ষেতে প্রচুর পরিমাণে সার না দিলে উহা ভালরূপ জন্মে না সুতরাং অন্যান্য কপির জমি অপেক্ষা ইহার জমিতে কিঞ্চিৎ অধিক সার দেওয়া আবশ্যক। এ স্থলে বলা বাহুল্য যে, মধ্যে মধ্যে ক্ষেতে 'পাটান' বা ছেঁচ দিবে এবং

ভূমি কোপাইয়া ঘাস-মুথা বাছিয়া ফেলিতে হইবে। গাছের গোড়ায় আল বা দাঁড়া তুলিয়া দিতে হইবে। গাছের শুষ্ক পাতাগুলি মধ্যে মধ্যে কাটিয়া দেওয়া আবশ্যক।

শীত-প্রধান পার্ব্বত্যদেশে ফাল্গুন লইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত বীজবপনের সময়। দেশ, কাল ও পরিচর্য্যার তারতম্যানুসারে প্রতি গাছে ২০ হইতে শতাধিক কপি জন্মে।

লেটিউস্ (Lettuce)

হিন্দুস্থানী ভাষায় ইহা কাহু নামে পরিচিত। অনেকে ইহাকে সালাদ্ নামে অভিহিত করেন। সাহারাণপুর বোটানিকেল গার্ডেনের ভূতপূর্ব্ব সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ গোলান সাহেব অনুমান করেন যে, হিমালয়ের পশ্চিম প্রান্তে Lactuca seariola নামে যে উদ্ভিদ আছে, কাহু তাহারই জাতিবিশেষ।

লেটুসের আকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাঁধাকপির ন্যায়। ইহাতে উত্তম সালাদ নামক সাহেবী চাট্‌নী প্রস্তুত হয়। দেশীয় গৃহস্থালীতে উহা দ্বারা নানাবিধ ব্যঞ্জনাদি রন্ধন হইয়া থাকে এবং তাহা উপাদেয় হয়।

ক্যাবেজ (Cabbage) ও কস (Cos)—এই দুই জাতিতে লেটুস বিভক্ত। ক্যাবেজ জাতি চ্যাপ্টা হয়, আর কস্ জাতি নারিকেলী কপির ন্যায় উর্দ্ধদিকে লম্বা ও সরু হয়। এতদুভয় জাতির আবাদ সম্বন্ধে কোন বিভিন্ন নিয়ম নাই। একই প্রণালীতে দুই প্রকার লেটুসের আবাদ হয়।

শ্রাবণ মাসের শেষভাগ হইতে আশ্বিন মাসের প্রথম ৭।৮ দিবস অবধি বীজ বপনের উত্তম সময়। বীজ অঙ্কুরিত হইতে ৮।১০ দিন সময় লাগে,

কখন কখন ২০।২২ দিনও সময় লাগে। হাল্কা মাটিতে বীজ বপন করিয়া ঢাকিয়া রাখিবে। চারা অঙ্কুরিত হইয়া ৩।৪টী পাতাবিশিষ্ট হইলে পটিতে স্থানান্তরিত করিতে হইবে। পটির মাটি খুব সারবান হওয়া উচিত। পটির মধ্যে ৯-ইঞ্চ অাঁতরে সারি মধ্যে উক্ত পরিমিত স্থান ব্যবধানে এক-একটী চারা পুতিতে হইবে। পটিতে সপ্তাহে একবার উত্তমরূপে জলসেচন করিতে হইবে এবং মধ্যে মধ্যে মাটি খুসিয়া তৃণাদি মুক্ত করিয়া দিবে। গাছগুলিতে ১০।১২টী পাতা জন্মিলে কলা-গাছের পেটি বা ছোটা বা অন্য রকম গুচ্ছি দ্বারা পাতাগুলি একত্র করিয়া বাঁধিয়া দিবে, নতুবা পাতা সকল খুলিয়া যাইবার সম্ভাবনা। লেটুসের মধ্যাংশ খুলিয়া গেলে পাতা সবুজ বর্ণ ধারণ করে ও শক্ত হয়। পাতা যত শুভ্র রাখিতে পারা যায় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। লেটুসের গাত্রে পশ্চিমে রৌদ্র না লাগিতে পারে, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। স্বভাবতঃ ইহার পাতা অতিশয় কোমল, এজন্য সামান্য রৌদ্রোত্তাপেই ইহার অনিষ্ট হইয়া থাকে। অনেক স্থলে বিচালী দ্বারা গাছগুলিকে ঢাকিয়া রাখা হয়। ইহাতে গাছের মধ্যাংশের বর্ণ শুভ্র থাকে এবং কচি পাতাগুলিও শীঘ্র নষ্ট হইতে পারে না।

কাহুর বীজ এদেশে অতি সহজে জন্মিয়া থাকে এবং সেই বীজ হইতে চারাও সহজে উৎপন্ন হয়। গাছ রাখিয়া দিলে তাহাও ক্রমশঃ প্রায় দুই হাত উচ্চ হইয়া উঠে এবং সর্ষপের ন্যায় শীষ জন্মিয়া শীর্ষে ফুল ধারণ করে, অবশেষে বীজ ধারণ করে। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে বীজ জন্মে। সচরাচর বীজ বপনের দিন হইতে ৪০।৫০ দিন মধ্যে লেটুস ব্যবহারোপযোগী হইয়া থাকে।

দশম অধ্যায়

মূলজ উদ্ভিদের চারা উৎপাদন

মূল রোপণ করিয়া অনেক উদ্ভিদের চারা উৎপন্ন করিতে হয়, আবার অনেক উদ্ভিদের অন্তর্ভৌমিক কাণ্ড কিম্বা গেঁড় পুতিলে চারা জন্মে। এতদ্ব্যতীত অনেক উদ্ভিদের খণ্ড শাখা বা ফেঁকড়ি রোপণ দ্বারাও চারা জন্মাইতে পারা যায়।

গোল-আলু, রাঙ্গা-আলু, শকরকন্দ, কচু, মানকচু, ওল, আর্দ্রক, আমাদা প্রভৃতি সব্‌জীবাগে আবাদযোগ্য আনাজের মূল, গেঁড়, চোক ও মুখী বীজরূপে ব্যবহৃত হয় বলিয়া ইহারা বীজ-আলু, বীজ-কচু বা কচুর-মুখী ইত্যাদি নামে অভিহিত। ইহাদিগের অবাদের জন্য বীজ বপন করিয়া আবাদ করায় সুবিধা হয় না, কারণ ইহাদিগের মধ্যে অনেকের স্থান-বিশেষে, আদৌ বীজ জন্মে না। গোল-আলুর বীজ জন্মিতে দেখা গিয়াছে, কিন্তু সে বীজ বপনপূর্ব্বক আবাদ করিয়া সফলকাম হইতে হইলে ২।৩ বৎসরকাল অপেক্ষা করিতে হয়, কিন্তু বীজ-আলু রোপণ করিলে কয়েক মাস মধ্যেই ফসল পাওয়া যায়। মুখী, চোক গেঁড়, বা মূল,—এ সকলই উদ্ভিদের কাণ্ডাংশ মাত্র, উহারা ভূগর্ভস্থ কাণ্ড ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহারা শিকড়ের অংশও নহে। শিকড় বা শিকড়ের অংশ হইতে স্বতন্ত্র গাছ জন্মে না, কারণ শিকড়ে পত্রমুকুল বা চোক (leaf-bud) থাকে না। আলু, কচু প্রভৃতির গাত্রে একাধিক চোক থাকে, অবসর পাইলে সেই চোক মুখরিত হইয়া ক্রমে উদ্ভিদের আকার ধারণ করে। বটবৃক্ষের কাণ্ড ও শাখাপ্রশাখার গাত্র হইতে ঝুরি লম্বিত হইয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করে। উক্ত ঝুরিগুলি শিকড় ভিন্ন অন্য কিছু নহে। শিকড় বলিয়া

উহা হইতে চারা কিম্বা পত্র জন্মে না, কিন্তু বটবৃক্ষের শাখা কাটিয়া রোপণ করিলে স্বতন্ত্র চারা উৎপন্ন হয়। লাউ, কুমড়া, শসা প্রভৃতি অনেক উদ্ভিদের কাণ্ডস্থিত গ্রন্থি বা গাঁট হইতে ঝুরি উদ্গত হয় এবং সে ঝুরি ভূমি স্পর্শ করিতে পাইলে শিকড়ের ন্যায় ভূগর্ভ হইতে রস আহরণ করিয়া মূল-উদ্ভিদে প্রেরণ করে। সেই ঝুরিগুলিকে লতিকা হইতে স্বতন্ত্র করিয়া রোপণ করিলে কোন কাজই হয় না, কিন্তু ২।১টী গ্রন্থিসমেত খণ্ড-লতিকা রোপণ করিলে স্বতন্ত্র গাছ উৎপন্ন হয়। এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া গ্রন্থকার একবার একটী লাউগাছ হইতে (মূল গাছটী বজায় রাখিয়া) ৫।৬টী স্বতন্ত্র গাছ উৎপন্ন করিয়াছিলেন। প্রত্যেক গাছই যথেষ্ট ফল প্রদান করিয়াছিল। ইহাদিগকে লতা-কলম বলিলে ক্ষতি নাই।

আলু কিম্বা মানকচুর শিকড় রোপণ করিলে চারা জন্মে না, কিন্তু আলু বা মানকচুর চোক স্বতন্ত্রভাবে রোপণ করিলে তাহা মুকুলিত ও অঙ্কুরিত হয়। সুতরাং জানিয়া রাখিতে হইবে যে, আন্তর্ভৌমিক কাণ্ড উদ্ভিদের অংশ-মাত্র,—শিকড় বা শিকড়ের অংশ নহে।

অবাদের জন্য উল্লিখিত উদ্ভিদসমূহের যে সকল তথাকথিত মূল রক্ষিত হয় যথাসময়ে অথবা অনুকূল অবস্থা পাইলে রক্ষিত স্থলেই তাহারা অঙ্কুরিত হয়। এই জন্য তাহাদিগকে এরূপ সাবধানে রাখিতে হয় যে, অকারণে বা অকালে তাহারা অঙ্কুরিত হইতে না পারে।

উল্লিখিত উদ্ভিদ সমূহের কন্দ ভূমি হইতে সংগৃহীত হইবার পর অল্পদিন মধ্যেই মুখরিত হইবার বা মুখাইবার প্রয়াস পায় বলিয়া তাহাদিগকে অতি সাবধানে রক্ষা করিতে হয়। ইহারা চৈতন্যবিশিষ্ট বলিয়া মুকুলিত হইবার কাল সমাগত হইলেই স্বতঃই জাগরিত হয় কিন্তু যতদিন না সে ব সুযোগ অবসর আইসে, ততদিন তাহারা নিদ্রাভিভূতভাবে পড়িয়া

থাকে। কেবল যে ঋতু পরিবর্ত্তনের ফলে ইহারা জাগরিত হয় তাহা নহে, কৃত্রিম উপায়জনিত ঋতুসঙ্কেত পাইলেও তাহারা সংজ্ঞা লাভ করে, জাগিয়া উঠে, অবশেষে মুকুলিত ও অঙ্কুরিত হয়।

গৃহের গুদামে বা যে কোন স্থানে বীজসকল সংগৃহীতাবস্থায় থাকুক, সুযোগ পাইলেই, কিম্বা কাল সমাগত হইলেই, যখন তাহারা মুখরিত হইয়া থাকে, তখন আবাদের জন্য তাহাদিগকে নিরঙ্কুরাবস্থায় রোপণ না করিয়া পূর্ব্বাহ্নে মুকাইয়া লইয়া রোপণ করা সুবিধাজনক। এই কারণে রোপণের পূর্ব্বে ইহাদিগকে গৃহের মধ্যে কিম্বা রক্ষিত স্থানে অঙ্কুরিত করিয়া লওয়াই প্রশস্ত।

ইহাদিগের অবয়ব রসে পূর্ণ, সুতরাং ঈষৎ উত্তাপ পাইলেই মুখী সকল মুখরিত হয়। উত্তাপ অর্থে,—বায়ুমাণ্ডলিক উত্তাপ ও ভৌতিক উত্তাপ,—উভয়বিধ উত্তাপ বুঝিতে হইবে। বায়ুমণ্ডলের উত্তাপের হ্রাসবৃদ্ধির সহিত শরীরের আভ্যন্তরীণ উত্তাপের অতি নিকট সম্বন্ধ আছে। পৃথিবীতে এমন কোন পদার্থ দেখা যায় না যাহা বহির্দ্দেশের উত্তাপের অনুবর্ত্তী নহে। কঠিন ইস্পাত, কাচ, লৌহ ও প্রস্তর হইতে বীজ ও উদ্ভিদ মাত্রেই বায়ুমণ্ডলের উত্তাপের অধীন, ফলতঃ শীতকালে সঙ্কুচিত এবং গ্রীষ্মকালে স্ফীত হয়। যাহাদিগের অবয়ব স্থিতিস্থাপক তাহারা স্ফীতিসহ সুতরাং একদিকে গ্রীষ্মকালে যেরূপ তাহারা উত্তাপের ফলে স্ফীত হয়, অন্যদিকে শীতকালে উত্তাপের অল্পতানিবন্ধন সঙ্কুচিত হয়। উক্ত দুই অবস্থাতেই যাহারা বিদীর্ণ হয় না, তাহারা সজীব পদার্থ—জীব ও উদ্ভিদ। কিন্তু প্রস্তর, কাচ প্রভৃতি নিতান্ত কঠিন জড় সকল শীত বা গ্রীষ্মের প্রকোপে বিদীর্ণ হয়, ইহারা স্থিতিস্থাপক নহে। লৌহাদি ধাতু সকলেরও কথঞ্চিত কমনীয়তা আছে বলিয়া শীতোত্তাপ সহ্য করিতে সক্ষম কিন্তু আকুঞ্চনবিস্ফারণ গুণবিবর্জ্জিত নহে।

গৃহমধ্যে অনুষ্ণ স্থানে থাকিলে মূল সঙ্কুচিত বা নিদ্রিত থাকে। এজন্য ইহাদিগকে সর্দ্দিহীন অনুষ্ণ স্থানে রাখিতে হয়। শীতকাল নিকটবর্ত্তী হইলে ইহারা আরও নির্জ্জীব হইয়া পড়ে কিন্তু যে-ই বসন্তমলয়ের আবির্ভাব হয়, অমনি তাহাদিগের জড়তা ভাঙ্গিয়া যায়, তাহারা জাগিয়া উঠে, মুখরিত হইবার চেষ্টা পায় এবং মুকুলিত হয়। গৃহমধ্যে স্তুপাকারে কিম্বা ঘনীভূতাবস্থায় থাকিলেও ইহারা অসময়ে মুকুলিত হইয়া থাকে।

চাষ-আবাদে, বিশেষতঃ উদ্যানকার্য্যে, সকল সময় প্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলে না। রোপণের সময় সমাগতপ্রায় হইলে এবং রোপণের ২।৩ সপ্তাহ পূর্ব্বে মূল, গেঁড়, মুকী বা চোকগুলিকে কোনও স্থানে স্তুপাকারে রাখিয়া সেই স্তুপ খণ্ডবিচালিরাশি দ্বারা উত্তমরূপে আবরিত করিয়া রাখিতে হইবে। বাক্স বা চাঞারিতে ইহাদিগকে স্তরে স্তরে সজ্জিত করিয়া উপরে এবং থাক্ বা স্তবক পরস্পর মধ্যে খণ্ড বিচালী দিয়া রাখিতে পারিলে আরও ভাল হয়। বিচালীর অভাবে স্তরের উপরে চট বা থলে প্রসারিত করিয়া রাখিলেও চলিতে পারে। এইরূপে ৭।৮ দিন হইতে ১০।১২ দিন থাকিলেই তৎসমুদায় হইতে চোক ফুটিয়া উঠে। স্তুপের মূলগুলি উত্তমরূপে মুকুলিত বা মুখরিত হইয়া উঠিলে যথানিয়মে তাহাদিগকে ভূমিতে রোপণ করিতে হইবে। অমুকুলিত অবস্থায় ভূমিতে রোপণ করিলে ইহাদের অঙ্কুরণে কালবিলম্ব হয়, অনেক সময় পচিয়া যায়।

লীক (Leek)

পেঁয়াজ বা লশুণের সহিত লীকের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। ইহার যে স্থূল কাণ্ড তাহাই ব্যঞ্জনাদিতে মসলারূপে ব্যবহৃত হয়। লীকের পত্র ও কাণ্ডে পেঁয়াজের ন্যায় গন্ধ আছে।

ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে টবে বা আবৃত ভাঁটীতে বীজ বপন করিতে হয়। চারা উদ্গত হইয়া তিন-চারিটী পাতাবিশিষ্ট হইলে, ক্ষেত্রে চারা রোপণ করিবে। রোপণের নিয়ম এই যে, পটিতে ১৫ ইঞ্চ অন্তর ৫ ইঞ্চ চওড়া ও [illegible] ইঞ্চ গভীর এক একটী নালা রচনা করিতে হইবে। অনন্তর সেই নালা মধ্যে অল্প গোয়াল বাড়ীর পুরাতন সার দিয়া ৬ ইঞ্চ অন্তর এক একটী চারা রোপণের পর, একমাস বা দেড়মাস কাল কেবল মধ্যে মধ্যে জলসেচন ও নীড়ানি করিবে। অতঃপর যখন দেখা যাইবে যে, গাছের কাণ্ড ভূপৃষ্ঠ হইতে ৩।৫ অঙ্গুলি পরিমাণ উচ্চ হইয়াছে তখন সেই সারাল মাটি দ্বারা পূর্ণ করিয়া গাছের সমুদায় কাণ্ডটী ঢাকিয়া দেওয়া উচিত। গাছের গোড়ায় মাটি যত আল্‌গা থাকিবে, ততই সেই কাণ্ড স্ফীত ও স্থূল হইবে। এক্ষণে জল সেচন ও গোড়া পরিষ্কার রাখা ভিন্ন অন্য কোন পাট নাই। যত্ন করিয়া রাখিতে পারিলে যাবৎ না বর্ষা সমাগত হয় তাবৎকাল উহা ক্ষেত্রে নিরাপদে থাকিতে পারে এবং প্রয়োজনমত তুলিয়া আনিয়া তাহাদিগকে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

পলাণ্ডু বা পেঁয়াজ (Onion)

তরকারিরূপে পলাণ্ডুর নিজত্ব কিছু নাই, গন্ধের বিশেষত্বহেতু মসলারূপে ইহার যথেষ্ট ব্যবহার আছে। হিন্দুদিগের মধ্যে ইহার ব্যবহার অতি বিরল। অপরাপর প্রায় সকল জাতির মধ্যে পেঁয়াজ প্রায় সকল ব্যঞ্জনের উপাদান। আমিষ-নিরামিষ নির্ব্বিশেষে যে কোন ব্যঞ্জনে পেঁয়াজ নিয়ো-

জিত হয়, তাহা উপাদেয় হয়, সুতরি হয়—মুখরোচক হয়। ইউরোপীয়দিগের মধ্যে সালাদরূপেও ইহার যথেষ্ট ব্যবহার আছে। পলাণ্ডু উত্তেজক সব্জী উপরন্তু মসলা মধ্যে পরিগণিত।

আঁশবিশিষ্ট হাল্‌কা মাটিই পেঁয়াজের পক্ষে প্রশস্ত। পেঁয়াজ মূলজাতীয় উদ্ভিদ, সুতরাং ইহার আবাদের জন্য মাটি যত ঝুরা ও লঘু করিতে পারা যায় ততই মূল বৃদ্ধির পক্ষে সুবিধা হয়।

এ দেশে সাধারণতঃ দুই প্রকার পেঁয়াজ উৎপন্ন হইয়া থাকে, ছাঁচি ও পাটনাই। ছাঁচি পেঁয়াজের আকার স্বভাবতঃ ছোট, গন্ধ অল্পাধিক তীব্র, কিন্তু ইহার ফলন অধিক হয়। পাটনাই পেঁয়াজ, বেহার অঞ্চলে প্রচুর জন্মে। ইহার আকার বড়, গন্ধ অপেক্ষাকৃত মৃদু, স্বাদ মধুর এবং বর্ণ শ্বেতের সহিত লালের মিশ্রণ। এই দুই জাতি ব্যতীত আজকাল নানা জাতীয় বিলাতী পেঁয়াজও দেশে রোপিত হইয়া থাকে।

যে প্রকার পেঁয়াজেরই আবাদ হউক, মাটি বিশেষ লঘু, উর্ব্বরা ও সারবান্ হওয়া আবশ্যক। বিস্তৃত আবাদের জন্য ভূমি কোপাইয়া, পরে লাঙ্গল ও মই দ্বারা মাটি উত্তমরূপে চূর্ণ করিতে হইবে এবং মৃত্তিকাস্থিত ইষ্টকাদি পৃথক করিয়া সমধিক পরিমাণে গোয়াল বাড়ীর পুরাতন আবর্জ্জনা ও উদ্ভিজ্জ ক্ষার মাটির সহিত মিশাইতে হইবে। তৎপরে পটি মধ্যে যথানিয়মে চারা রোপণ করিতে হইবে। বিস্তৃত বা সঙ্কীর্ণ আবাদ হউক, পটি মধ্যে ইহার আবাদই সুবিধাজনক। এইজন্য জমীকে অল্পাধিক পটিতে বিভক্ত করিয়া লইতে হইবে।

বীজ হইতে যে সকল চারা উৎপন্ন করা যায় তাহার ফসল অপেক্ষাকৃত বিলম্বে হয় এবং তাহার ফলনও প্রথম বৎসর কম হয়। পূর্ব্ব বৎসরের পেঁয়াজ বীজরূপে ব্যবহৃত হইলে ফলন অধিক হয় এবং পেঁয়াজের আকার বড় হয় কিন্তু এতদুপায়ে আবাদ করিতে হইলে বীজ-পেঁয়াজের বাবতে ব্যয়

অধিক হয়। যাহা হউক, বীজের চারা অতিশয় ক্ষুদ্র হইয়া থাকে, সেই জন্য প্রথম বৎসরে যে পেঁয়াজ উৎপন্ন হয় তাহা তাদৃশ বড় হয় না। পুরাতন অর্থাৎ পূর্ব্ব বৎসরের পেঁয়াজ রোপণ করিলে মূল সকল বড় হয়, ফসল অধিক হয়।

সাধারণতঃ পেঁয়াজের চারা উৎপন্ন করিবার জন্য বীজ অথবা পেঁয়াজ নিয়োজিত হইয়া থাকে। কিন্তু বিগত ১৩০৭ সালে গ্রন্থকার দ্বারবঙ্গের অন্তর্গত রাজনগরে অবস্থানকালে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, পেঁয়াজের নিম্নাংশস্থিত চাকৃতি (disc) (যাহা কুট্টনকালে কাটিয়া ফেলিয়া দেওয়া যায়) আদত, অথবা ২।৩ খণ্ডে বিভক্ত করিয়া হাপোর দিলে যথারীতি চারা জন্মিয়া থাকে। উক্ত প্রণালী অবলম্বনের সুবিধা এই যে, বীজ বা চারার জন্য আদত পেঁয়াজ রোপণ করিতে হয় না। আরও সুবিধা এই যে, বীজ অঙ্কুরিত করিবার জন্য অনেক প্রয়াস পাইতে হয়, কিন্তু পেঁয়াজের চাকৃতি রোপণ করিলে অনেকটা ঝঞ্চট কমে। দ্বিতীয়তঃ চারা উৎপন্ন করিবার জন্য যে পেঁয়াজ খরিদ করিতে হয় সে খরচটাও বাঁচিয়া যায়। বাড়ীতে খরচের জন্য যে পেঁয়াজ ব্যবহৃত হয়, তাহাদিগের নিম্নাংশের চাকতি ফেলিয়া না দিয়া জমিতে হাপোর বা 'পাত' দিয়া রাখিলে যথাসময়ে যথানিয়মে ক্ষেতের পটী বা চৌকায় রোপণ করিলেই চলে। এতদুদ্দেশ্যে শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে পেঁয়াজের গোড়া সংগ্রহ করতঃ কাষ্ঠাগ্নিজাত ভস্মমধ্যে ক্ষণকাল অর্থাৎ ২।১ ঘণ্টাকাল রাখিবার পর কোন আবৃত স্থানে পাতলাভাবে ছড়াইয়া শুষ্ক লঘু মাটি বা বালি দ্বারা চাপা দিতে হইবে। অঙ্কুরোদ্গত হইলে মধ্যে মধ্যে জলসেচন করা কর্ত্তব্য। ৮।১০ দিন পরেই অঙ্কুরসকল নয়নগোচর হইতে থাকে। কয়েক মাস এইরূপে পালন করিয়া চারা সমূহকে ক্ষেত্রের যথাস্থানে রোপণ করিতে হইবে। উল্লিখিত প্রণালীতে চারা উৎপন্ন করিতে হইলে অধিক কালবিলম্ব করা উচিত

নহে ; কারণ বিলম্ব করিলে আবাদ করিতে অধিক দিন সময় পাওয়া যায় না, ফলতঃ পেঁয়াজ বড় হইতে পায় না, ফলনও অধিক হয় না।

যাহা হউক, আশ্বিন মাসে বীজ পাত দিতে হয়। বীজ অঙ্কুরিত হইয়া চারাগুলি ২।৩টী কলিযুক্ত বা পত্রবিশিষ্ট হইলে পটী মধ্যে তাহাদিগকে পেঁয়াজের জাতিগত আকারানুসারে ৪।৫ ইঞ্চ হইতে ৬।৭ ইঞ্চ ব্যবধানে রোপণ করিবে। মৃত্তিকায় রসের অবস্থা বুঝিয়া সপ্তাহে একবার বা দুইবার জলসেচন করিতে হইবে, মধ্যে মধ্যে খুরপি দ্বারা মাটি উস্কাইয়া দিবে এবং গাছের গোড়ায় মাটি উচ্চ করিয়া দিবে। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে গাছ শুষ্ক হইতে থাকিলে পেঁয়াজগুলিকে উঠাইয়া লইতে হয়। যেখানে কেবল গৃহস্থালী ব্যবহারের জন্য ইহার আবাদ হয়, সেস্থলে ইতঃপূর্ব্ব হইতেই গাছ উঠাইতে পারা যায়।

মুরসিদাবাদ ও দ্বারভাঙ্গায় থাকিতে বিলাতী বহু জাতীয় পেঁয়াজের আবাদ করা গিয়াছিল। বিলাতী পেঁয়াজের এক একটী গাছে এক একটী মাত্র মূল হয়, কিন্তু সে সকল মূলের আকার খুব বড় হয়। অন্যান্য বিলাতী জাতির মধ্যে Silver skin জাতির মূলের প্রত্যেকটী প্রায় আধসের ওজনের হইয়া থাকে। ইদানীং অনেক জাতীয় বিলাতী পেঁয়াজের বীজ এদেশে বীজব্যবসায়ীগণ আমদানী করেন।

গাছ সমেত মূলগুলি ভূমি হইতে উঠাইয়া রৌদ্রে একদিন উত্তমরূপে শুষ্ক করতঃ কোন শুষ্ক গৃহে বালির মধ্যে পুতিয়া রাখিলে পেঁয়াজ অনেক দিবস তাজা বা সজীব থাকে।

এক বিঘা জমিতে প্রায় ১০০ মণ পেঁয়াজ উৎপন্ন হইয়া থাকে, এব প্রতি মণের মূল্য পাঁচ সিকা হইলে উক্ত এক শত মণ ফসলের মূল্য ১২৫৲ টাকা হয়। ইহার চাষে যদি পঞ্চাশ টাকা ও খরচ হয়, তাহা হইলে ৭৫৲ টাকা লাভ থাকে।

গন্ধন বা গদিনা (Shallot)

মূল হইতে ইহার চারা জন্মে। মূলের ও পাতার গন্ধ পেঁয়াজের ন্যায় কিন্তু অপেক্ষাকৃত মৃদু। তরকারীতে ব্যবহৃত হয়। আশ্বিন মাসের শেষ ভাগে ভূমিতে বসাইতে হয় কিন্তু শৈত্য প্রদেশের ফাল্গুন হইতে বৈশাখ মাস অবধি মূল পুতিবার সময়। পেঁয়াজ বা লষুণের ন্যায় ইহার আবাদ প্রণালী। ছোট ছোট পটি বা চৌকায় ছয় ইঞ্চ ব্যবধানে মূল পুতিতে হয়। পৌষ মাস হইতে ইহা ব্যবহার করা যাইতে পারে। পাশ্চাত্য খাদ্যবিভাগে সালাদে ইহা নিয়োজিত হয়।

লষুণ (Garlic)

সচরাচর আমরা ইহাকে রষুণ নামে অভিহিত করিয়া থাকি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহার নাম,—লষুণ।

পলাণ্ডু ও লষুণের আবাদ-প্রণালী প্রায় এক প্রকার। ইহার জন্য মাটি উচ্চ ও হাল্‌কা হওয়া আবশ্যক। আশ্বিন মাসের শেষ ভাগে অর্থাৎ বর্ষাকাল একবার উত্তীর্ণ হইলে ভূমিতে লষুণ রোপণ করিতে হয়। পটির মধ্যে ৬-ইঞ্চ অন্তর শ্রেণী রচনা করিয়া তন্মধ্যে ৬-ইঞ্চ ব্যবধানে এক-একটী লষুণেব মূল পুতিয়া দিবে। পুতিবার সময় যেন মনে থাকে যে, উহার উপরিভাগ মৃত্তিকার উপরিভাগে কিঞ্চিন্মাত্র ভাসিয়া থাকে। যাবৎ অঙ্কুরিত না হয় তাবৎ উহাতে জলসেচন করিবার কোন আবশ্যক হয় না। পাতা বাহির হইলে, মাটিতে রসের অবস্থা বুঝিয়া সপ্তাহে একবার বা দুইবার জলসেচন করিতে হইবে। সর্ব্বদা গোড়ার মাটি নিড়ানী দ্বারা আল্‌গা রাখিবে। ফাল্গুন মাসে গাছ সকল বিবর্ণ হইতে থাকে, তখন উহাতে আর জলসেচন করা বিধি নহে। ক্রমে ক্রমে সমুদায় গাছ

শুকাইয়া আসিলে যত্নসহকারে উঠাইয়া রৌদ্রে দুই তিন দিন শুষ্ক করিবে। অনন্তর পেঁয়াজের ন্যায় গৃহে রাখিয়া দিবে কিম্বা বিক্রয় করিবে।

একাদশ অধ্যায়

মটর বা কড়াই-শুঁটী (Pea)

কৃষকগণের ক্ষেতে সাধারণতঃ যে মটরের আবাদ হইয়া থাকে, তাহাতে দ্বিদল প্রস্তুত হয় এবং প্রাকৃত ভাষায় সে সকল মটরের সাধারণ নাম,—কড়াই বা কলাই। ইহা সমতল দেশ সকলের শীতকালের তরকারি। মটর অতি পুষ্টিকর খাদ্য। সমতল দেশে ইহা কার্ত্তিক মাসে এবং হিমপ্রধান দেশে মাঘ-ফাল্গুনে বপনীয়। সব্‌জী-ক্ষেত্রে বা বাগানে যে সমুদয় উৎকৃষ্ট জাতীয় মটর জন্মে তাহাই তরকারীতে ব্যবহৃত হয়। পূর্ব্ব প্রকারের মটরের আবাদের কথা ‘কৃষিক্ষেত্রে বিবৃত হইয়াছে সুতরাং এস্থলে তৎসম্বন্ধে কোনরূপ আলোচনার প্রয়োজন নাই। বিলাতী যত প্রকার মটর এদেশে আমদানী হইয়া থাকে তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী আমাদিগের বিশেষ পরীক্ষিত এবং তাহাদিগের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। ইহাদিগের আকার যেমন বৃহৎ, স্বাদও তেমনই মধুর। নিম্নলিখিত মটরের শুঁটি মধ্যে ৮।৯টী হইতে ১০।১১টী দানা থাকে।

(১) ব্লু-ইম্পিরিয়াল, (২) চ্যাম্পিয়ন অব-ইংলণ্ড, (৩) আমেরিকান ওয়াণ্ডার, (৪) ইম্প্রুভড্-রিংলিডার, (৫) ডোয়ার্ফ-আলি (৬) গ্ল্যাডষ্টোন প্রভৃতি কয়েক জাতীয় মটর বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ইদানীং আরও অনেক প্রকার মটর উৎপন্ন হইয়াছে এবং বিদেশী বীজ উৎপাদক বা বীজ ব্যবসায়ীগণ কতকগুলি মটরকে নিজস্ব করিয়া লইয়া স্বতন্ত্র নামে অভিহিত করেন। বীজ ব্যবসায়ীদিগের তালিকায় তাহা দ্রষ্টব্য।

ভাদ্র মাসের শেষ ভাগে যথানিয়মে ভূমি করিয়া ও মাটির ঢেলা ভাঙ্গিয়া জমি তৈয়ার করিতে হইবে। পরে, বর্ষা উত্তীর্ণ হইলেই কার্ত্তিকের প্রথম হইতে অগ্রহায়ণ মাসের শেষ ভাগ মধ্যে বীজ বপন করিতে হইবে। বীজ বপনের পূর্ব্বে চৌকার উত্তর-দক্ষিণে দড়ি ধরিয়া দেড় বা দুই হাত অন্তর ৪.ইঞ্চ গভীর জুলি করিবে। অনন্তর, সেই জুলি মধ্যে ৫।৬-অঙ্গুলি ব্যবধানে এক-একটী বীজ ফেলিয়া অগ্রসর হইতে থাকিবে। পরে ঘুরিয়া আসিয়া দেখিবে,—যদি কোন স্থানে ঘনভাবে বীজ পতিত হইয়া থাকে তাহা হইলে আবশ্যকমত দানা উঠাইয়া—যেস্থানে পাত্‌লা ভাবে পড়িয়াছে—সেইখানে ফেলিয়া দিবে। বীজ পরস্পরের মধ্যে ৫।৬-অঙ্গুলির ব্যবধানই যথেষ্ট। অনন্তর জুলির পার্শ্বস্থিত মৃত্তিকা দ্বারা বীজ ঢাকিয়া ঈষৎ চাপিয়া দিবে। এক্ষণে যে স্থান কাটিয়া জুলি পূর্ণ করা গেল, তাহাকেই জুলি বলিয়া জানিতে হইবে। ভবিষ্যতে অর্থাৎ মটরের গাছ উদ্গত হইলে প্রত্যেক দুইটী জুলির উপরে কঞ্চি, পাট-কাটি কিম্বা ধঞ্চে-কাটি দ্বারা দো-চালাবৎ করিয়া দিতে হইবে। কাটিগুলি এমন-ভাবে রাখিতে হইবে যেন, জুলি লইতে হেলাভাবে উঠিয়া তাহাদিগের শেষাগ্রভাগ উপরে মিলিত হয়। লতিকা সকল যাহাতে অবলম্বন পায় তাহার সুব্যবস্থা করিতে হইবে। লতিকা সকল বিজড়িত হইয়া পড়িলে কিম্বা যথাযোগ্য অবলম্বন না পাইলে ফল ধারণে বিমুখ হয়।

বীজ বপন করিয়া উত্তমরূপে সার দিতে হয়। ইহার পক্ষে হংস, কুক্কুট ও পারাবতের বিষ্ঠা বিশেষ উপকারী। যেখানে উল্লিখিত সারের

অভাব, তথায় গোয়ালঘরের আবর্জ্জনা ও ছাই প্রশস্ত। চারা জন্মিলে আবশ্যকমত জলসেচন করিবে এবং সময়ে সময়ে মাটি খুঁড়িয়া দিবে। গাছ অতিশয় ঘন হইয়া জন্মিয়া থাকিলে, ঘনতা ভাঙ্গিয়া গাছ মধ্যাংশের আবশ্যক মততুলিয়া ফেলিয়া পাত্‌লা করিয়া দিবে। চারা উদ্গত হইবার পর যাবৎ গাছে পুষ্প সমাগম না হয় তাবৎ কাল মধ্যে চারা সকলের পাঁতিতে একবার বা দুইবার অস্থিচূর্ণ বা মাছের কাঁটা-ভিজান জল সেচন করিতে পারিল গাছগুলি বলিষ্ঠ ও তেজাল হয়, ফল বড় হয় এবং মিষ্ট হয়।

বীজ বপন করিবার পর যাবৎ অঙ্কুরিত না হয়, তাবৎকাল উহাদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করা আবশ্যক নতুবা পক্ষী বা মুষিকগণ মাটির ভিতর হইতে বীজ তুলিয়া খাইয়া যায়। বীজগুলিতে মেটে-সিন্দুর মাখাইয়া বপন করিলে কোন পোকা-মাকড় বা পক্ষীতে খাইয়া ফেলিতে পারে না। বীজে মেটে সিন্দুর মাখাইতে হইলে, মেটে সিন্দুরকে সুইট-অয়েলের সহিত গুলিতে হইবে। তদনন্তর উহাতে বীজগুলি একবার উলট-পালট করিয়া লইলেই চলিবে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, কার্ত্তিক মাসেই বীজ বপন করিতে হইবে। সকল বীজ কিন্তু একেবারে বপন না করিয়া পৌষ মাস পর্য্যন্ত ১৫।২০ দিবস অন্তর পর্য্যায়ক্রমে বপন করিলে ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত ফসল পাওয়া যায়।

জাতিবিশেষের রোপণের কাল নির্দ্দেশ অনুসারে মটর তিন ভাগে বা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত যথা,—আশু (যাহারা অগ্রে ফল দান করে), অর্দ্ধাশু (যাহারা আশুর পরেই ফল প্রদান করে) এবং নামূলা বা নাবী (যাহারা সর্ব্বশেষে ফল প্রদান করে)। ঋতুর অবস্থানুসারে ইহারা পালিত হইয়া স্বাতন্ত্র্য প্রাপ্ত হইয়াছে, এই জন্য জাতিগত বিশেষত্ব অনুসারে ঋতুর অগ্রপশ্চাৎভেদে ইহাদিগকে রোপণ করিতে হইবে।

ওলণ্ডা-কড়াই নামে এক প্রকার কোঁকড়ান (Wrinkled) মটর আছে। তাহার দানা ও খোসা—উভয়ই মিষ্ট। ওলণ্ডা শুঁটী খোসা সমেতই ব্যঞ্জনাদিতে ব্যবহৃত হয়। ইহার আবাদে কোন জাফরি বা অবলম্বনের প্রয়োজন হয় না, কারণ ওলণ্ডা লতিকাগুলি অধিক দীর্ঘ হয় না।

মটরগাছ, লতিকা-জাতীয় উদ্ভিদ। কোন কোন জাতির লতিকা ৩।৪ হাত, কোন কোন জাতির ২।৩ হাত, আবার কোন কোন জাতির লতিকা আধ হাত হইতে এক বা দেড় হাত দীর্ঘ হয়। জাতিগত বৃদ্ধির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, অবলম্বনের জন্য বড় বা ছোট কাটির দ্বারা জাফরি করিয়া দিতে হয়। ছোট জাতির গাছ সম্মুখে, মধ্যমাকার জাতির গাছ মধ্য ভাগে এবং দীর্ঘ জাতির গাছ পশ্চাতে রাখিতে হয়। এই প্রণালীতে বীজ বুনিলে এক জাতির গাছ অপর জাতিকে ঢাকিয়া ফেলিতে পারে না।

টমেটো বা বিলাতী বেগুণ (Tomato)

চাষীগণ ইহাকে 'তেমতি' বা গোট-বেগুণ কহে। ইয়ুরোপীয়গণের নিকট টমেটো অতি উপাদেয় তরকারী। বাঙ্গালীর ঘরে ইহার এখনও বিশেষ প্রতিপত্তি হয় নাই, তবে অনেকে ইহার সুন্দর ফল দেখিবার জন্যও স্ব স্ব বাগানে উৎপন্ন করিয়া থাকেন ইহা সুপক্ক হইলে অম্লাস্বাদ হইয়া থাকে। ইহার পাকা ফলে উত্তম চাটনি প্রস্তুত হয়। টমেটোর ফল গোলাকার এবং পরিপক্ক হইলে জাতি অনুসারে মনোহর সুবর্ণ বা হরিদ্রা বা লালবর্ণের হয়। অপরিপক্ক ফল বার্ত্তাকুর ন্যায় ভাজিলে আহারে অম্লযুক্ত বেগুন ভাজা মন্দ লাগে না।

ভাদ্র মাসে ইহার বীজ বপন করিবার সময়। যথানিয়মে বীজ বপন করিয়া চারা উৎপন্ন করিবে এবং সেই চারাগুলি তিন চারি অঙ্গুলি উচ্চ হইলে সারবান্ জমিতে রোপণ করিতে হইবে। টমেটো ক্ষেত্রে ভেড়ীসার প্রশস্ত, তদভাবে গোয়ালবাড়ীর আবর্জ্জনা। টমেটো গাছ অতিশয় বুভুক্ষু, অল্পদিনের মধ্যে অতিশয় শিকড়বিশিষ্ট হইয়া পড়ে, সুতরাং অল্প দিন মধ্যে ভূগর্ভ হইতে বহু সার আহরণ করিয়া লয়, এজন্য ইহার জমিতে যথেষ্ট পরিমাণে সার দেওয়া উচিত।

টমেটো এতই বহুল পরিমাণে ফলিয়া থাকে যে, একটা দীর্ঘ পটি থাকিলে একটী গৃহস্থের বিলক্ষণ চলিতে পারে কিন্তু যাঁহার খরচ অধিক তাঁহার পক্ষে চৌকায় টমেটো রোপণ করা উচিত। চৌকায় দুই হাত অন্তর গাছ বসাইতে হইবে। চারাগুলি মাটিতে সংলগ্ন হইলে এবং সমুচ্চ হইয়া উঠিলে গাছের ডগা কাটিয়া দিতে হয়। ডগা কাটিয়া দিলে মূল কাণ্ড হইতে শাখা-প্রশাখা উদ্গত হইয়া গাছ বিস্তৃত ও ঝাড়ান্ হইয়া পড়ে। দাঁড়া-গাছ অপেক্ষা ঝাড়ান্ বা প্রসারিত গাছে অধিক ফল ধারণ করে। এই জন্য গাছের শিরাভাগ কাটিয়া দিতে হয় এবং তাহা হইলে উহা অচিরে শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট হইয়া পড়ে। টমেটো গাছ লতানিয়া নহে। ইহার শাখাপ্রশাখা নিতান্ত কোমল সুতরাং অধিক শাখা প্রশাখা নির্গত হইলে আর দণ্ডায়মান অবস্থায় থাকিতে না পারিয়া মৃত্তিকাভিমুখী বা ভূমি সংলগ্ন হইয়া পড়ে। প্রত্যেক শাখা-প্রশাখা যত দীর্ঘ হইতে থাকে তত তাহাদিগকে দণ্ড বা যষ্টি দ্বারা বাঁধিয়া দিলে এক-একটী গাছ সুপ্রশস্ত হয় এবং ফলও প্রচুর জন্মে।

টমেটো গাছ টবে পালন করিলে যখন উহা ফল ধারণ করে তখন দেখিতে অতি সুন্দর হয়। টব অন্ততঃ ১২-ইঞ্চ হওয়া আবশ্যক। এতদুদ্দেশ্যে হাপোর হইতে চারা তুলিয়া যথানিয়মে টবে বসাইয়া পালন

করিতে হইবে এবং টবের উপরে বিস্তৃত জাফরি করিয়া দিতে হইবে। গাছ জাফরি হইতে উচ্চ হইয়া উঠিলে তাহার ডগা কাটিয়া দেওয়া উচিত, কারণ তাহা হইলে মূলকাণ্ড হইতে শাখা-প্রশাখা উদ্গত হইয়া উপরিভাগ হইতে প্রসারিত হইয়া পড়িবে। প্রাচীর বা বেড়ার গাত্রে টমেটো গাছ নিয়ন্ত্রিত করিলে পার্শ্বদেশে অধিক স্থানের প্রয়োজন হয় না, তাহা ব্যতীত সেই সকল গাছ বেড়া বা প্রাচীর আবৃত করিয়া ফল ধারণ করিলে শোভার সামগ্রী হয়, ফল পাকিলে আরও মনোহর হয়। ইচ্ছা করিলে টমেটো গাছকে নানাপ্রকারে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারা যায়। এতদুদ্দেশ্যে যে চারা গ্রহণ করিতে হইবে তাহা পরিপুষ্ট ও তেজাল হওয়া উচিত। চারাগুলি ৬অঙ্গুলি পরিমিত দীর্ঘ হইয়া উঠিলে নির্ব্বাচিত গাছগুলিকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে ভূমিতে বা গামলায় সারাল মাটিতে রোপণ করিয়া পালন করিতে হইবে এবং গাছের মূলদেশে একটী, দুইটী বা তিনটী ৩।৪ হাত দীর্ঘ অনতিস্থূল সরল খুঁটি পুতিয়া সেই সকল খুঁটীতে এক-একটী কাণ্ডজাত শাখা বাঁধিয়া দিয়া সেই শাখাগুলিকে খুঁটিতে নিয়ন্ত্রিত করিলে মনোহর দেখায়। মূল কাণ্ডে অধিক শাখা-প্রশাখা জন্মিতে দেওয়া উচিত নহে।

যাহা হউক, মধ্যে মধ্যে জলসেচন করা এবং জমি কোপাইয়া দেওয়া ভিন্ন ইহার অন্য বিশেষ পাট নাই। গাছগুলি অতিরিক্ত তেজাল হইলে ফল বিদীর্ণ হইয়া যায়। তখন ক্ষেত্রে জল সেচনের পরিমাণ হ্রাস করিতে হইবে কিম্বা গাছের কোন কোন স্থান ঈষৎ শারিত করিয়া দিলে চলিতে পারে।

টমেটো গাছের এক প্রকার রোগ আছে তাহাকে ওয়েদিমা Edema রোগ কহে। রোগের লক্ষণ,—গাছের পাতা কুড়িয়া অর্থাৎ কোঁকড়াইয়া যায়। চারা গাছে উক্ত রোগের আবির্ভাব হইলে তাহাকে মাটি হইতে

উঠাইয়া পরিষ্কারজলে গোড়ার সমুদায় মাটি উত্তমরূপে ধৌত করিয়া, সাবানের জলে বা ঈষদুষ্ণ জলে ধৌতকরতঃ শিকড়গুলি অল্প ছাঁটিয়া দিতে হইবে। অতঃপর গাছের শাখাপ্রশাখাদিগকেও উত্তমরূপে উল্লিখিত প্রণালীতে ধৌত করিয়া এবং ডালপালা ছাঁটিয়া নূতন স্থানে রোপণ করা উচিত। ক্ষেত্রের মধ্যে বড় গাছে রোগ দেখা দিলে, তাহাকে একেবারে তুলিয়া ফেলিয়া দেওয়া ভাল।

মাছ মাংসের সহিত টমেটো সংযোজিত হইলে ব্যঞ্জনের স্বাদ অতি উপাদেয় হইয়া থাকে। টমেটো অতি সুপাচক এবং মুখরোচক।

গোল-আলু (potato.)

শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে ক্ষেত হইতে ভাদুই ফসল উঠিয়া গেলে জমিতে উত্তমরূপে লাঙ্গল ও মই দিয়া খৈল সার, গোবর সার, ছাই প্রভৃতি দ্রব্য মিশাইয়া বারম্বার চাষ দিতে হয়। আলুর জমিতে যতই চাষ দিতে পারা যায়, ততই আবাদ লাভজনক হয়। হালকা বা বেলে মাটিতে ছাই সংযোজিত করিবার কোন প্রয়োজন নাই। ঈদৃশ মাটির সহিত ছাই মিশ্রিত হইলে মাটির ঘনতা বা আঁট আরও শিথিল হইয়া যায়, মাটির জলধারণের শক্তি আরও হ্রাস পায়। এঁটেল বা কাঁচাল-ধরা মাটিতে ছাই সংযোজিত হইলে মাটি আল্‌গা ও ফাঁপা হইয়া থাকে ফলতঃ তাহার শো [illegible] ও ধারকতা বৃদ্ধি পায়, তন্নিবন্ধন উদ্ভিদেরও বিশেষ উপকার হয়।

অস্থিচুর্ণ আলুর পক্ষে বিশেষ উপকারী। এজন্য বিঘা প্রতি ২।৩ মণ

অস্থিচূর্ণ সংযোজিত করিতে পারিলে ভাল হয়। বীজ বপনের অন্ততঃ ২।৩ মাস পূর্ব্বে অস্থি চূর্ণ মাটির সহিত মিশাইয়া রাখিতে পারিলে ভাল হয় কারণ উহা বিগলিত হইয়া মাটির সহিত মিশিতে না পারিলে গাছের কোন উপকারে আইসে না। বীজ বপনের সঙ্গে সঙ্গে অথবা বীজ বপনের ১০।১৫ দিন বা এক মাস পূর্ব্বেও মাটিতে অস্থিচূর্ণ প্রদান করিলে, উহা বিগলিত হইয়া উদ্ভিদের আহরণোপযোগী হইবার পূর্ব্বেই আলুর বৃদ্ধিকাল প্রায় শেষ হইয়া যায়, সুতরাং এরূপ অবস্থায় সার প্রদানের কোন ফল হয় না। হাড়ের সূক্ষ্ম চূর্ণ ব্যবহার করিলে অপেক্ষাকৃত অল্পদিন মধ্যে উপকার পাওয়া যায়। খৈল বা গোবর-সার দিতে হইলেও বীজ বপনের সময়ে দেওয়া কোন মতে উচিত নহে, তাহা হইলে সার বিগলিত হইবার সঙ্গে বীজ আলুও উত্তপ্ত হইয়া উঠে এবং পচিয়া যায়। অধিকন্তু, বীজে অনেক পোকা আসিয়া সমুদায় বীজ ফলটী নষ্ট করিয়া ফেলে। এই জন্য অস্থিচুর্ণ দিতে হইলে আষাঢ়-শ্রাবণ মাসের মধ্যেই দিতে হইবে। ভাদ্র মাসের মধ্যে উক্ত সার ক্ষেত্রে প্রসারিত করতঃ জমি চষিয়া দিতে হইবে। মোট কথা,—মা [illegible] উত্তমরূপে চূর্ণ হইয়া মিশিয়া যাওয়া চাই।

কার্ত্তিক মাসের প্রথম ভাগে জমিতে আর একবার লাঙ্গল ও মই দিয়া মাটি সমতল করিতে হইবে। অতঃপর চৌকার প্রস্থ ভাগে, ছয় হাত অন্তর, ছয় অঙ্গুলি গভীর, জুলি রচনা করিতে হইবে এবং প্রতি দুই জুলির মধ্যবর্ত্তী জমিতে প্রস্থভাগে ৪ হইতে ৬ অঙ্গুল গভীর জুলি খনন করিয়া উভয় পার্শ্বস্থ জুলির মধ্যে আদহাত হইতে পৌণে এক হাত অন্তর বীজ-আলু বসাইবে। খামার বা গৃহমধ্যে বীজ মুখরিত করিয়া জমিতে রোপণ করিলে অতি শীঘ্র ‘কল’ উদ্গত হয়। আলুক্ষেত্রে ১৫।২০ দিন অন্তর ছেঁচ দিবে এবং ক্ষেতে যো পাইলে নীড়ান দ্বারা মাটি আলুগা করিয়া

দিবে, এবং কুত্রাপি জঙ্গল বা তৃণাদি জন্মিতে দিবে না। গাছের গোড়ায় মধ্যে মধ্যে মাটি তুলিয়া দিবে। ইহাকে ইংরাজিতে Earthing কহে।

পুরাতন অর্থাৎ পূর্ব্ব বৎসরের আলু বীজের জন্য ব্যবহৃত হয়। উক্তবীজ ক্ষেত্র হইতে সংগৃহীত হইবার পর কয়েক মাস বিশ্রাম পাইয়া পরিপুষ্ট হইয়া উঠে এবং শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে গৃহেই আলুর চোকগুলি মুখরিত হয়। কার্ত্তিক মাসে বীজ-আলু পুতিবার উত্তম সময়। রোপণ করিবার পর এক সপ্তাহ হইতে দুই সপ্তাহ মধ্যে তাহা হইতে অঙ্কুর উদ্গত হয়। নূতন আলু রোপণ করিলে তাহা হইতে অঙ্কুর বাহির হইতে মাসাধিক কাল সময় লাগে, অনেক আলু তাৎকালিক মাটির রসালতা হেতু পচিয়া যাইবারও সম্ভাবনা। ঘরে বা খামারে বীজ-আলু 'মুকাইয়া' উঠিলে ক্ষেতে রোপণ করিলে ভাল হয়। মুখাইবার জন্য নীরোগ, সুঠাম আলু বাছিয়া বিচালি-প্রসারিত স্থানে স্তূপাকারে রাখিয়া স্তূপের সর্ব্বাঙ্গ পুনরায় বিচালি দ্বারা ঢাকিয়া রাখিতে হইবে। ধামা, চাঙ্গারি কিম্বা কেরোসিনের বাক্স মধ্যে স্তরে স্তরে আলু ও খড় সজ্জিত করিয়া রাখিলেও ৮।১০ দিন মধ্যে বীজ আলু সকল 'মুকাইয়া' উঠে। বলা বাহুল্য যে, বীজ-আলুর রাশি মধ্যে দাগী বা পচা আলু একটীও না থাকে। এইরূপে ৮।১০ দিন থাকিলে বীজ-আলু মুখাইয়া উঠিবে। তখন ক্ষেত্রে রোপণীয়।

খণ্ড খণ্ড আকারে বিভক্ত করিয়া বীজ-আলু রোপণের রীতি ও চলিত আছে। মধ্যমাকারের আলুকে খণ্ডিত না করিয়া পুরা-আলু রোপণ করা উচিত। এতদর্থে বৃহদাকার বীজকে আকারানুসারে প্রত্যেককে ২।৩ খণ্ডে বিভক্ত করিতে হয়। প্রত্যেক খণ্ডে অন্ততঃ ২টী উত্তম চোক থাকা উচিত। অতঃপর, সেই সকল খণ্ডাংশকে উদ্ভিজ্জ-ভস্মরক্ষিত করিয়া ক্ষণকাল রাখিবার পর পূর্ব্ববৎ স্তূপাকারে ১০।১২ দিন ঢাকিয়া রাখিলে সমুদায় খণ্ড মুখরিত হইয়া উঠে, তখন যথানিয়মে রোপণ করিতে হয়।

সাধারণতঃ চাষীগণ আবাদের জন্ম অতিশয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ-আলু রোপণ করে। ঈদৃশ বীজ হইতে যে সকল গাছ উৎপন্ন হয়, তৎসমুদায় তাদৃশ তেজাল হয় না, তজ্জাত আলুও বড় হয় না, ফলতঃ তাদৃশ লাভজনক হয় না, কিন্তু কৃষকের পক্ষে তাহা ক্ষতি- জনক না হইতে পারে, কারণ তাহাদিগের আবাদ-খরচাও অকিঞ্চিৎকর।

বর্ষা অতীত হইলেও মাটি ভিজা থাকিতে বীজ রোপণের জন্য তাড়াতাড়ি না করিয়া, বর্ষা উত্তীর্ণ হইবার পর ২।৩ সপ্তাহকাল অপেক্ষা করিয়া বীজ বপন করা শ্রেয়ঃ। ইতিমধ্যে আবাদের পূর্ব্ববর্ত্তী কাজ সকল শেষ করিয়া রাখা ভাল। কার্ত্তিক মাসের প্রথম ভাগেই বর্ষা প্রায় শেষ হইয়া যায় এবং তখনই বাঙ্গলা দেশের রসা মাটিতে আলুরোপণের প্রশস্ত কাল। মাটি অতিশয় রসা থাকিলে কিম্বা বারিপাতের সম্ভাবনা বুঝিলে ২।৩ সপ্তাহকাল বিলম্ব করিলে ক্ষতি নাই। উচ্চতর প্রদেশে অর্থাৎ বেহার বা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কার্ত্তিক মাস মধ্যে বীজ-আলু অবশ্য রোপণীয়। পৌষ মাস হইতে গাছের গোড়া হইতে ২।৪টী আলু সংগ্রহ করিতে পারা যায় কিন্তু প্রয়োজন না থাকিলে তাহা না করাই ভাল। পৌষ মাসে বাজারে নূতন আলুর আবির্ভাব হয়, কিন্তু সে আলুর আকার তখন নিতান্ত ক্ষুদ্র থাকে, স্বাদও তাদৃশ সুতার হয় না। সৌখীনের নূতনত্বের অনুরোধ সেই ক্ষুদ্র স্বাদবিহীন আলুর আদর হইতে পারে কিন্তু সাধারণের নিকট তাহা আদরণীয় নহে। যাবৎ গুল্ম সকল শুকাইয়া না যায় তাবৎকাল ফসল ক্ষেত্রে থাকিতে পাইলে আলু পরিপুষ্ট ও সুতার হয় এবং জলীয় অংশ পরিপাক হইয়া সারবান্ হয়। পশ্চিমে বাতাস বহিতে থাকিলে আলুর গুল্ম সকল বিবর্ণ হইতে থাকে। ক্ষেত্রের সমুদায় গাছ একেবারে শুষ্ক হইয়া গেলে যত্নসহকারে আলু উঠাইতে হইবে এবং সংগৃহীত হইলে সমুদায় পচা বা দাগী আলু বাছিয়া ফেলিতে হইবে।

BOUILLE BORDELAISE*

Sulphate of Copper	1 lb	(তুঁতে)	/॥০
Fresh slaked Lime	1 „	(টাট্‌কা)	/॥০
Syrup	1 „	(চিনির রস)	/॥০
Water	5 Gallons.	(জল)	৩০ বোতল

উল্লিখিত মিশ্রণ দ্বারা ক্ষেত্রে পিচকারী করিলে কেবল যে পোকা নিবারিত হয় তাহা নহে, সূক্ষ্ম পিচকারী বা ঝাঁঝরা দ্বারা পনর দিবস অন্তর গাছে উহা সেচন করিলে আলুর আকার এবং ফসলের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। গাছের বৃদ্ধি সমাপ্ত হইলে পাতার উপরিভাগ ও নিম্ন ভাগ উক্ত মিশ্রণ দ্বারা উত্তমরূপে সিক্ত করিয়া দিতে হয়। প্রতি বিঘায় কিঞ্চিদধিক ২-গ্যালন মিশ্রণের আবশ্যক। আলু-ক্ষেত্রে উক্ত মিশ্রণ ব্যবহার করিলে আর একটী মহদুপকার লাভ হয়, গাছগুলি অধিক দিবস জীবিত থাকে, তন্নিবন্ধন আলুর আকার পূর্ণ ও পরিপুষ্ট হয়। এস্থলে বিশেষ বক্তব্য এই যে, যে মিশ্রণের উল্লেখ করা গেল তাহার মধ্যে তুতে ও চুণের মাত্রা সামান্য অধিক হইলে বিশেষ অনিষ্ট হয়, অতএব অতি সাবধানে উক্ত মিশ্রণ প্রস্তুত করিতে হইবে।

অতি প্রাচীনকালে আলু, Battata নামে অভিহিত হইত এবং উক্ত শব্দ হইতেই আধুনিক Potato শব্দের উৎপত্তি। পেরু ও ভার্জিনিয়া দেশ—ইহার স্বাভাবিক উৎপত্তি স্থান।

ন্যূনকল্পে বিঘা প্রতি ৮০/০ মণ আলু উৎপন্ন হওয়া উচিত। সেই সময়ে আলুর মূল্য কম থাকে।

---

* Journal of the Royal Horticultural Society, Vol. xv. Page li

বীন (Bean)

বীন,—সিম্বীক বর্গীয় অল্পাধিক লতানে উদ্ভিদ। ইহার ফল সীমের ন্যায়, কিন্তু প্রকৃতিগত পার্থক্যবিশিষ্ট। সীম ও বরবটীর ন্যায় ইহার সুঁটী জন্মে এবং সেই সুঁটীর মধ্যে দানা থাকে। কচি অবস্থায় সমগ্র সুঁটী ব্যঞ্জনাদিতে নিয়োজিত হয়, কিন্তু পাকিয়া গেলে সুঁটী হইতে দানা পৃথক করিয়া ব্যবহার করিতে হয়।

সিম্বীক বর্গীয় তাবৎ ফসলের ন্যায় বীন অতি পুষ্টিকর তরকারি এবং তাহার স্বাদও উপাদেয়। গ্রীষ্মাধিক সমতল দেশে শীতকালেই বীন উৎপন্ন হয় কিন্তু হিমপ্রধান দেশে বসন্তকালে ইহার আবাদ হয়।

বীন লতিকাস্বভাব হইলেও ইহা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—চওড়া সীম (Broad bean), লতা-বীন (Runner or Pole bean) এবং গুল্ম বা ঝোপ-বীন (Bush or dwarf bean)।

গুল্ম-বীন।—এই জাতীয় বীন-গাছ গুল্মসদৃশ, আধ-হাত হইতে পৌনে-এক হাত উচ্চ হয় এবং ঝাড়াল হয়। ফলনে বেশী বিলম্ব হয় না। জাতি অনুসারে বীজ বপনের পর ৩০ দিন হইতে ৪০।৫০ দিন মধ্যে ব্যবহারোপযোগী সুঁটী প্রদান করে। পটী বা চৌকায় দেড় হাত অন্তর ভাসা জুলির মধ্যে আধ হাত ব্যবধানে দুই অঙ্গুলি মাটির মধ্যে এক-একটী বীজ পুতিয়া দিতে হয়। ইহাপেক্ষা ঘন করিয়া বীজ পুতিলে ঘনতাবশতঃ গুল্ম সকল চারি দিকে প্রসারিত হইতে পারে না, সুতরাং আশানুরূপ ফলন্ত হয় না। বীজ অঙ্কুরিত হইয়া চারা ৫।৬ অঙ্গুলি উচ্চ হইয়া উঠিলে উভয় শ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী স্থানের মাটি দ্বারা জুলি পূর্ণ করিয়া দিলে ভাল হয়।

পূর্ব্বাহ্নে ৬ ইঞ্চ গভীর এবং ৪।৫ ইঞ্চ চওড়া জুলি খনন করিয়া সেই জুলি মধ্যে পুরাতন ঝুরা আবর্জ্জনা প্রদান পূর্ব্বক তন্মধ্যে বীজবপন করিতে

হইবে। এতদুপায় অবলম্বিত হইলে গাছ সকল তেজাল, ঝাড়াল ও ফলন্ত হয়।

রনার বা পোল্‌ বীন।—পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহারা লতানিয়া কিন্তু ফেঁকড়ি সকল ৪।৫ হাতের অধিক দীর্ঘ হয় না। ইহাদিগের জন্য ৩ ফুট অন্তর থালায়, ৫।৬ হাত দীর্ঘ খুঁটি—দৃঢ়রূপে পুতিয়া দিবে এবং প্রত্যেক থালায় ২টি বীজ পুতিয়া দিতে হইবে। চারা গাছে ৬।৭টী পত্র উদ্গত হইলে উৎকৃষ্ট চারাটী রাখিয়া অন্য চারা উৎপাটিত করিয়া ফেলিবে। চারাগুলির ডগা ১ হাত দীর্ঘ হইলে খুঁটিতে সংলগ্ন করিয়া দিতে হয়। প্রবল বাতাসে গাছ ভূশায়ী হইয়া পড়িবার আশঙ্কা থাকিলে দীর্ঘ বেড়া কিংবা জাফরি নির্ম্মাণ করিয়া দিলে ভাল হয়। সমগ্র মহীশূর রাজ্যে, বিশেষতঃ মহীশূর ও বাঙ্গালোর সহরের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে প্রচুর পরিমাণে গুল্ম-বীনের আবাদ হয়। বর্ষাকালেও তথায় যথেষ্ট বীন পাওয়া যায়। ব্যাঙ্গালোর সহরে প্রচুর বীন জন্মে,—এই জন্য উক্ত সহরের নাম ব্যাঙ্গালোর হইয়াছে।

আর্টিচোক (Artichoke.)

চাষীগণ ইহাকে হাতিচোক কহিয়া থাকে। হাতিচোক দুই প্রকার,—এক জাতীয় গাছের মাথায় যে ফল হয় তাহাই খাদ্য; অপর জাতির ভূগর্ভে গাছের গোড়ায় আদ্রক বা হরিদ্রার ন্যায় মূল জন্মে। উক্ত মূল সকলই খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। প্রথমোক্ত জাতিকে গ্লোব (Globe) আর্টিচোক, এবং শেষোক্ত প্রকারকে জেরুজিলাম (Jeruselam) আর্টিচোক কহে। প্রথমে গ্লোব আর্টিচোকের কথা বলা যাউক।

গ্লোব।—শ্রাবণ মাসের ১৫ই তারিখ হইতে আশ্বিন মাসের ১৫ই পর্য্যন্ত বীজ বপন করিবার সময়। গামলায় বা বাক্সে বীজ বপন করিয়া

চারাগুলি ৫।৬ অঙ্গুলি বড় হইলে জমিতে পুতিয়া দিতে হয়। ক্ষেত্র মধ্যে দুই হাত অন্তর এক একটী বড় বড় গর্ত্ত খনন করিয়া তাহাতে উত্তমরূপে গোয়ালের বা আস্তাবলের আবর্জ্জনা দিয়া মাটির সহিত সেই সার মিশাইয়া চারা রোপণ করিতে হয়। চারাগুলি যাবৎ না সবল হইয়া উঠে তাবৎকাল তাহাদিগকে প্রখর রৌদ্রের উত্তাপের সময় ঢাকিয়া রাখিতে হইবে। সপ্তাহে একবার করিয়া উত্তমরূপে জলসেচন করা আবশ্যক এবং তৎসঙ্গে গাছের গোড়া কোপাইয়া মাটি আলগা করিয়া দেওয়া উচিত। অতিরিক্ত গরম পড়িলে সপ্তাহে দুই তিন বার জল দিতে পারিলে ভাল হয়। যে স্থানে বর্ষার জল দাঁড়ায় অথবা যে স্থান নিতান্ত ঠাণ্ডা, এরূপ স্থানে ইহা রোপণ করা বিধি নহে। হাল্‌কা, দোয়াঁশ ও গভীর মৃত্তিকাযুক্ত স্থানই ইহার পক্ষে প্রশস্ত। গাছে ফুল আসিবার উপক্রম দেখা গেলে, মধ্যে মধ্যে গোড়ায় তরল-সার দিলে ফল বড় হয় ও সুপুষ্ট হয়। উক্ত ফল দুগ্ধে সুসিদ্ধ করিয়া তাহার ভিতরের শস্য ভক্ষণ করিতে হয়।

জেরুজিলাম।—আমেরিকার উত্তর প্রদেশে ইহার স্বাভাবিক জন্মভূমি। তথায় অতি প্রাচীন কাল হইতেই জেরুজিলাম আর্টিচোকের ব্যবহার করিত। Battatas-de-Cannada নামে ইংলণ্ডে উহা ১৬১৭ খৃষ্টাব্দে আনীত হয়। জেরুজিলাম নাম দেখিয়া অনেকে স্বভাবতঃ ইহাকে জেরুজিলামের সামগ্রী মনে করিতে পারেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। ইটালি ভাষায় Girasola শব্দের অপভ্রংশ Jeruselam শব্দের উৎপত্তি। ‘জিরাশোলা’ শব্দের অর্থ সূর্য্যামুখী হওয়া।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইহার মূলে আর্দ্রক বা হরিদ্রার ন্যায় গেঁড় জন্মে এবং তাহারই আহার্য্য। যাহাতে মূল বর্দ্ধিত হইতে পারে, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এজন্য জমির গভীর চাষ এবং মাটি হাল্‌কা হওয়া প্রয়োজন।

জমিতে মাঘ মাসে উত্তমরূপে সার দিয়া ও মাটি চূর্ণ করিয়া ফাল্গুন মাস মধ্যে ক্ষেত্রে মূল রোপণ করিতে হয়। ক্ষেত্রে ২॥০ ফুট অন্তর শ্রেণী করিয়া তন্মধ্যে ১-ফুট ব্যবধানে, তিন ইঞ্চ মাটির মধ্যে বীজ-গেঁড় পুতিতে হয়। ১০।১২ দিনের মধ্যেই মূল ভেদ করিয়া আঁকোড় উদ্গত হইয়া থাকে। কিন্তু, উক্ত সময়ের মধ্যে আঁকোড় নয়নগোচর না হইলে উহাতে একবার জলসেচন করিতে হইবে। কল উদ্গত হইবার পর হইতে যাবৎ বর্ষা সমাগত না হয় তাবৎকাল মধ্যে মধ্যে প্রচুর পরিমাণে জলসেচন করিতে হইবে। গাছগুলি এক ফুট উচ্চ হইলে (আলুগাছের ন্যায়) ইহার গড়ায় মাটি তুলিয়া দিতে হইবে। সর্ব্বদা গাছের গোড়া যাহাতে আল্‌গা ও পরিষ্কার থাকে, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হয়। ভাদ্র ও আশ্বিন মাসের মধ্যে মূল ব্যবহারোপযোগী হইয়া থাকে, কিন্তু পৌষ মাস শেষ হইবার পূর্ব্বে মূল পরিপুষ্ট হয় না। সুপুষ্ট হইয়া উঠিলে ভূমি হইতে মূলগুলিকে উৎপাটিত করিয়া শুষ্ক বালি মধ্যে রাখিয়া দিলে উহার সুগন্ধ অনেক দিন পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। যদি উক্ত জমি অবিলম্বেই অন্য কোন ফসলের জন্য প্রয়োজন না হয় অথবা এই ফসলের সমুদায় ফলই একেবারে উঠাইবার প্রয়োজন না থাকে, তাহা হইলে মূলগুলিকে ভূগর্ভ মধ্যে থাকিতে দেওয়া উচিত, আবশ্যক মত উঠাইয়া লইলেই চলিবে।

জেরুজিলাম আর্টিচোকের মূল অতি পুষ্টিকর খাদ্য এবং ইহার সৌরভ অতীব মনোহর। যে স্থানে আলু উৎপন্ন হয় না কিম্বা হইতে পারে না, তথায় ইহার প্রচলন করার লাভ আছে। অনেকের মনে,—ইহার প্রচুর আবাদ থাকিলে দুর্ভিক্ষকালে উক্ত মূল দ্বারা বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা। ইহার আবাদ উত্তরোত্তর যাহাতে দেশমধ্যে বিস্তৃত হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত।

বার্ত্তাকু (Brinjal or Egg-plant,)

বার্ত্তাকুর আবাদ সমধিক লাভজনক। ইহা এতই অধিক পরিমাণে ফলিয়া থাকে যে, নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক গাছ থাকলেই একটী গৃহস্থের আর সম্বৎসর বেগুণ ক্রয় করিতে হয় না। যে গৃহস্থের কিছুও জমি আছে, তিনি নিজ পরিবারের ব্যবহারের জন্য একখণ্ড এক-কাঠা জমির চৌকা রাখিলে বার মাস বেগুণ পাইতে পারেন।

জাতি-বিশেষ বেগুণের বীজ ভিন্ন ভিন্ন মাসে বপন করিতে হয়। সুতরাং সম্বৎসরে ৩।৪ বার বীজ বুনিতে পারা যায়। ভাঁটাতে বীজ 'পাত' দেওয়া হইয়া থাকে।

বীজ শীঘ্র শীঘ্র অঙ্কুরিত করিতে হইলে বপন করিবার পূর্ব্বে রাত্রিতে উহাকে জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। সমস্ত রাত্রি ভিজিয়া বীজগুলি ফুলিয়া উঠিবে। পরে উহাকে জল হইতে উঠাইয়া ক্ষণকালের জন্য ছায়াতে প্রসারিত করিয়া দিলে উহার গাত্রস্থিত সমুদয় জল পরিশোষিত বা পরিশুষ্ক হইয়া যাইবে।

শীতকালের বেগুণ স্বভাবতঃই কোমল সুমিষ্ট ও বৃহদাকারের হইয়া থাকে। দেশী বেগুণের মধ্যে 'মুক্তকেশী সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং প্রকৃষ্ট প্রণালীতে আবাদ করিতে পারিলে প্রতি বিঘা ভূমি হইতে ন্যূন কল্পে ১০০৲ হইতে ৪০০৲ টাকার ফসল পাওয়া যায়।

ছয় সেরা বেগুণ লইয়া যে আজ কাল হৈ-চৈ পড়িয়া গিয়াছে তাহা মুক্তকেশীর প্রকারান্তর ভিন্ন আর কিছু নহে। আমি পুনঃ পুনঃ আবাদ করিয়া মুক্তকেশী হইতে ইহার কোন প্রভেদ দেখিতে পাই নাই। তবে মুক্তকেশী মার্কিন দেশে গিয়া উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে। মুক্তকেশী বেগুণ আমার ক্ষেত্রে তিন সেরের উপর বড় হইয়াছিল।

বৃহদাকার বেগুণ শ্রুতিমধুর, কিন্তু বেশী বড় হইতে দিলে ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া পড়ে, কারণ শস্ত ও বীজ পাকিয়া যায়, কোমলতা নষ্ট হয়, উপরন্তু গাছের ফল হ্রাস পায়। যাঁহারা বৃহদাকার ফলের প্রতি লক্ষ্য রাখেন তাঁহাদের পক্ষে তাহা শোভনীয় কিন্তু ব্যবহারোপযোগী বার্ত্তাকু উৎপন্ন করিতে হইলে মধ্যমাকারের হইলেই সংগ্রহ করা উচিত।

বেগুণ বারোমাসই উৎপন্ন হইয়া থাকে কিন্তু একই গাছ বার মাস ফল দান করে না। ভিন্ন জাতির বেগুণ ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে উৎপন্ন হয়। ঋতুভেদ উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহারা সাধারণত জাতিতে বিভক্ত।

শীতের বেগুণ বীজ জৈষ্ঠ্য মাসে, গ্রীষ্মের বেগুণ অর্থাৎ কুলি বেগুণের বীজ অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে এবং আউসে বীজ ফাল্গুন-চৈত্র বা বৈশাখে বপন করিতে হয়।

বেগুণ চারার গোড়ায় অনেক সময় লোণা লাগিয়া থাকে। ফলতঃ সেই সকল গাছ গোড়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যায়। লোনার লক্ষণ দেখা গেলে ভাঁটির চারিদিকে দুই অঙ্গুলি উচ্চ মাটির আল্ বাঁধিয়া উত্তম ও প্রচুর-রূপে জলসেচন করিতে হইবে এবং মাটি একেবারে শুষ্ক হইলেই ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগে লবণ ফুটিয়া থাকে কিন্তু জল থাকিলে তাহার ভারে লবণ আর মৃত্তিকার উপরিভাগে উঠিতে পারে না। তেঁতুলের বা খইলের জল দিলেও লবণ নষ্ট হইয়া থাকে। চুণের জলে লবণ কাটিয়া যায় সত্য, কিন্তু চুণের সংস্পর্শে চারাগাছ মরিয়া যাইতেও পারে, সুতরাং তাহা ব্যবহার করা নিরাপদ নহে। ইহাও লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, অতিরিক্ত জলসেচনের ফলে সর্দ্দি সংক্রামিত না হয়।

চারাগুলি ২।৩ অঙ্গুলি বড় হইলে, 'পাত' বা বীজতলা হইতে চারাকে স্থানান্তর করিবার জন্য হাপোরে ৩।৪ অঙ্গুলি ব্যবধানে চারাগুলিকে রোপণ করিতে হইবে। যতদিন চারাগুলি ৮।১০ অঙ্গুলি বড় না হয়, ততদিন

মধ্যে মধ্যে তাহাদিগকে এক-একবার স্থানান্তর করা উচিত। এইরূপে ২।৩ বার স্থানান্তর করিতে পারিলে গাছগুলি তেজাল ও সুশ্রী হয়। চারাগুলি ৫।৬টী পাতাবিশিষ্ট হইলে ক্ষেত্রে স্থায়ীভাবে বসাইতে হইবে। নিতান্ত শৈশবাবস্থায় একবারে ক্ষেত্রে পুতিয়া দিলে প্রত্যেকের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখা অসম্ভব। এতদ্ব্যতীত সে অবস্থায় ইহারা নিজের অভাব নিজে মোচন করিতে সক্ষম হয় না।

ক্ষেতে চারা বসাইবার পক্ষে সায়ংকালই উত্তম সময়। অপরাহ্নে ক্ষেত্রে চারা বসাইলে ভাঁটী বা হাপোর হইতে উৎপাটিত হওয়ায় উহাদিগের যে কষ্ট অনুভূত হয় সমস্ত রাত্রির শীতল বাতাসে তাহার অনেক লাঘব হয় কিন্তু দিবাভাগে উৎপাটিত ও রোপিত হইলে কষ্টের লাঘব না হইয়া বরং আলোক ও রৌদ্রের উত্তাপে গাছগুলি অধিক ঝিমাইয়া পড়ে। সুতরাং অপরাহ্নে চারা স্থানান্তর করাই সুবিধাজনক। ভাঁটী হইতে গাছগুলি অতি যত্নসহকারে উঠাইতে হয়।

যে জমিতে গাছ বসাইতে হইবে, তাহা অন্ততঃ ১০।১৫ দিবস পূর্ব্বে প্রস্তুত করিয়া রাখা উচিত। জমি অল্প হইলে বারম্বার কোদাল দ্বারা কোপাইয়া মাটি ঠিক করিতে হইবে। ক্ষেত্র বিস্তীর্ণ হইলে লাঙ্গলাদি দ্বারা তৈয়ার করিয়া রাখিতে হয়। তদনন্তর ক্ষেত্রের উত্তর-দক্ষিণে দুই হাত ব্যবধানে সরল রেখা টানিয়া তাহার পার্শ্বদেশ হইতে মাটি তুলিয়া দাঁড়া তৈয়ার করা আবশ্যক। আপাততঃ ছয় অঙ্গুলি উচ্চ দাঁড়া হইলেই চলিবে। উক্ত দাঁড়ার উপর প্রতি দুই হাত হইতে আড়াই হাত ব্যবধানে এক একটী চারা যত্ন সহকারে পুতিবে, পুতিবার নিয়ম এই যে, উহার গোড়া হইতে ২।৩ অঙ্গুলি কাণ্ডের উপর পর্য্যন্ত মাটীর ভিতর ডুবাইয়া দেওয়া অর্থাৎ কাণ্ডের নিম্নভাগ ভূপৃষ্ঠের উপরে না জাগিয়া থাকে, কারণ তাহা হইলে নবরোপিত চারাগুলি ভূশায়ী হইয়া পড়ে। গাছগুলি পুতিয়া

দিবার পর তাহাতে অল্প অল্প জলসেচন করা উচিত এবং যে পর্য্যন্ত না চারাগুলি সতেজ হয়। প্রতিদিন অপরাহ্নে সূর্য্যোত্তাপে প্রশমিত হইলে গাছের উপরিভাগে অর্থাৎ শিরোদেশে জল দিতে হইবে। এইরূপ জলসেচন গাছের গোড়ায় না হইলেও চলে, কিন্তু গাছের কাণ্ড ও পাতাগুলিতে সেই জল পতিত হওয়া চাই। ইহাকে গাছের স্নান কহে। এইরূপে স্নান করাইলে গাছগুলি স্নিগ্ধ হয় এবং অল্পদিন মধ্যে সবল হইয়া উঠে। জমিতে রোপণ করিবার পূর্ব্বে বা পরে চারাগুলির ডগা ভাঙ্গিয়া দিবে।

ক্ষেতে চারা পুতিবার দেড় মাস বা দুই মাস পরে অর্থাৎ গাছগুলি এক হাত পরিমাণ উচ্চ হইলে ক্ষেতে অতিশয় সাবধানে একবার লাঙ্গল দিলে ভাল হয়। এই সময়ে হলচালনা করিতে বিশেষ সতর্কতা আবশ্যক নতুবা হলচালনাকালে লাঙ্গলের ইষ্ কিম্বা ফালের অথবা বলদের আঘাতে অনেক গাছের গোড়া অবধি উৎপাটিত হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা এবং অনেক সময় ডালপালা ভাঙ্গিয়া যায়। তবুও ইহাতে বিশেষ উপকার হয়, গাছগুলি পরে ঝাড়বিশিষ্ট হয়। ক্ষেত্রে গাছ পুতিবার পরে যাঁহারা তথায় আর লাঙ্গল চালাইতে ভরসা না করেন, তাঁহাদের পক্ষে কোদাল দ্বারা জমি কোপাইয়া মাটি চূর্ণ করিয়া দিবার ব্যবস্থা করা উচিত। জমিতে কোপান দিবার সময় গাছের গোড়ায় মাটি দিতে হইবে। অতঃপর আবশ্যক বোধ হইলে মধ্যে মধ্যে জমি কোপাইয়া দিলেই যথেষ্ট হইবে।

বেগুণের ক্ষেতে জল ছেঁচে দিবার প্রথা প্রায় দেখা যায় না, কিন্তু বালুকাগর্ভ, নীরস ও টান মাটিতে প্রয়োজন বুঝিয়া নির্দ্দিষ্ট কাল ব্যবধানে ছেঁচে দিতে পারিলে ভাল হয়। ঈদৃশ মাটির রস ভূগর্ভের অনেক নিম্নে অবস্থান করে তন্নিবন্ধন অল্পকালজীবী উদ্ভিদগণ সে রসের দ্বারা উপকার

লাভ করিতে পারে না। নিম্ন বাঙ্গলায় এবং নাবাল জমিতে প্রায় জলসেচনের প্রয়োজন হয় না। শীত বা গ্রীষ্মের ফসলে ২০।২৫ দিন অন্তর সেঁচ দিলে ভাল হয়। ইহাতে যে কেবল গাছের শ্রীবৃদ্ধি হয় তাহা নহে, ফলের আকারও অপেক্ষাকৃত বড় হয় এবং শাঁস মধুর ও কোমল হয়।

মৃত্তিকার ইতরবিশেষানুসারে বেগুণের স্বাদেরও তারতম্য হইয়া থাকে সতেজ ও সারবান জমির ফলে যেরূপ সুমিষ্ট আস্বাদ হয়, নিস্তেজ জমির ফলে সেরূপ হয় না। নিঃস্ব ভূমির গাছ তাদৃশ ঝাড়াল হয় না তাহার ফলন অধিক হয় না, ফলের আকার বড় হয় না, উপরন্তু ফলের ছাল স্থূল হয় ফলতঃ বীজ অধিক হয়।

আচট্ জমি যেমন বেগুণের পক্ষে উপযোগী, পুরাতন ভিটামাটিও তদনুরূপ। আবার যে জমিতে মাটির সহিত পুরাতন রাবিস বা চুণ-সুরকী মিশ্রিত থাকে তাহাও বড় উর্ব্বরা এবং সে জমিতে যে বেগুণ জন্মে, তাহাও বৃহৎ এবং সুমিষ্ট হয়। সকল ক্ষেতেই ভিটা মাটি বা রাবিস পাওয়া যায় না, তবে যদি সন্নিকটে কোন পতিত স্থানে ঐরূপ মাটি বা গুঁড়া রাবিস পাওয়া যায়, তাহা হইলে উহা আনিয়া প্রত্যেক গাছের গোড়ায় ২।১ মুষ্টি দিলে উপকার হইতে পারে।

বেগুণ গাছে সময়ে সময়ে পোকার আবির্ভাব হয়। পোকা নিবারণের জন্য প্রাচীন নিয়মানুসারে হুকার জল বা ছাই ব্যবহৃত হইয়া থাকে কিন্তু এতদুভয়ের দ্বারা যদি কোন উপকার না পাওয়া যায় তাহা হইলে 'লণ্ডন-পর্পল' (London purple) নামক এক প্রকার যে বিলাতী ঔষধ আছে, তাহা দ্বারা উপকার হইতে পারে। ২।৫টী গাছে যদি পোকা লাগে তাহা হইলে তাহাদিগের রোগ নিরাকরণ করিবার চেষ্টা করা অপেক্ষা সেগুলিকে উৎপাটিত করিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করা

উচিত নতুবা সেই সকল কীট ও তৎপ্রসূত ডিম্বরাশি ফুটিয়া অন্যান্য গাছকে আক্রমণ করিতে পারে।

বেগুণ সাধারণতঃ শ্বেত ও লালাভ কৃষ্ণবর্ণের দেখা যায়। শ্বেত অপেক্ষা শেষোক্ত প্রকারের বেগুণ অধিক আদরণীয়। মসিবর্ণের ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বেগুণের মধ্যে মুক্তকেশী বেগুণই উৎকৃষ্ট। মুক্তকেশী বেগুণ এক একটী /২॥০ বা /২ সের হইয়া থাকে। ফলেব আকার বৃহৎ করিতে হইলে ফলের সংখ্যা হ্রাসের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয় এবং সেজন্য প্রত্যেক গাছে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ফল রাখিয়া অপরগুলিকে কচি অবস্থায় ভাঙ্গিয়া দিতে হয়।

বহু জাতীয় সুমিষ্ট ও সুপষ্ট বেগুণ শীতকালেই জন্মে। ইহাদিগের বীজ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে 'পাত' দিতে হয়। চারাগুলি কিছু বড় হইলে অর্থাৎ ৪।৫টী পাতাবিশিষ্ট হইলে স্থানান্তর করিয়া দ্বিতীয় হাপোরে কিছুদিন্ লালনপালন করা আবশ্যক। পরে ৬।৭টি পাতা জন্মিলে ভাদ্রমাসে ক্ষেতে বসাইবে। অন্যান্য পাটের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ইহাতে আশ্বিন মাসেই ফল ধরিবার সূত্রপাত হয়।

লম্বা ও সরু জাতীয় এক প্রকার বেগুণ হয়, তাহাকে কুলি-বেগুণ কহে। কুলি-বেগুণ ৬-ইঞ্চ হইতে প্রায় ১॥ ফুট বা এক হাত দীর্ঘ পর্য্যন্ত হয়। ইহার বিস্তর ফল হয়।

ফলের বর্ণ, আকার ও কোন্ মাসে কোন জাতীয় বেগুণ ভালরূপ জন্মে এবং প্রত্যেক জাতির আস্বাদের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া স্বতন্ত্রভাবে যদি বীজ সঞ্চয় করিতে পারা যায়, এবং প্রয়ত্যক বিভিন্ন জাতির যদি নামকরণ করা যায়, তাহা হইলে অতি অল্পদিন—৩।৪ বৎসর মধ্যেই আমরা নানাজাতির বেগুণ উৎপন্ন করিতে পারি। সৌখিনগণ ও বীজ ব্যবসায়ীগণ এ বিষয়ে মনোযোগী হইলে এ কার্য্য অতি সহজে সুসিদ্ধ হইতে পারে।

কালীগঙ্গা, কিরীটেশ্বরী, মুক্তকেশী, রাম-বেগুণ, রাঙ্গা-বৌ প্রভৃতি কয়েক জাতীয় বার্ত্তাকুর প্রচলন আছে। মুক্তকেশী ২৪-পরগণার সামগ্রী। মুরসিদাবাদের কালীগঙ্গা ও কিরীটেশ্বরীর ফল ঈষৎ লম্বা এবং ঘোর বেগুণী, রঙ্গের প্রায় মসিবর্ণের ন্যায় এবং তাহাতে বীজের পরিমাণ অতি কম থাকে। রাঙ্গা-বৌ গ্রন্থকার দ্বারা দ্বারভাঙ্গায় উৎপন্ন হইয়াছিল। শুনিতে পাই এক্ষণে তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে।

বেগুণগাছে এক প্রকার পতঙ্গ জাতীয় কীট জন্মে। ডিম্বাবস্থায় বর্ণ সবুজ থাকে এবং পতঙ্গাবস্থা প্রাপ্ত হইলে সেই সকল কীটের বর্ণ ফিকে হইয়া যায়। ক্রমে সেই পতঙ্গ পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইলে তাহার মস্তক মসিবর্ণ প্রাপ্ত হয়। উহার ৫টি পা ও ২টি শুঁড় আছে। উক্ত কীট অতি সাংক্রামিক। একবার একটী গাছে জন্মিলে নিকটস্থ অপর সকল গাছেই বিস্তৃত হইয়া সমূহ ক্ষতি করে। উক্ত কীট সকল গাছের পাতার নিম্নভাগে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রাশি রাশি ডিম্ব প্রসব করে। গাছের পাতার নিম্নভাগ কুঞ্চিত হইলেই বুঝিতে পারা যায় যে, তাহা কীটাক্রান্ত হইয়াছে। উক্ত কীটাণু এতই ক্ষুদ্র এবং উহাদিগের গতি এতই মন্থর যে, উহাদিগকে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় না এবং ইহারা যে জীবিত প্রাণী তাহাও সহজে উপলব্ধি হয় না। ১৩০৩ সালে গ্রন্থকারের অঙ্গিনায় কয়েকটী গাছে কীটের আবির্ভাব হইয়াছিল। অনুতবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে তাহাদিগের গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখা হইয়াছিল। উক্ত কীটের কয়েকটী যাদুঘরে (ইণ্ডিয়ান-মিউসিয়মে) পরীক্ষার্থ পাঠান হইলে তথাকার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডাক্তার এণ্ডারসন সাহেব পরীক্ষা করিয়া বলেন যে, ইহা এফিস (Aphis) জাতীয় এফিডিডে (Aphididad) নামক পতঙ্গ। ইতিপূর্ব্বে ইহাকে কৃষির শত্রুরূপে কখনও জানা ছিল না। ইহার আক্রমণ হইতে আক্রান্ত গাছদিগকে রক্ষা করিবার জন্য গাছে

ক্ষীণতেজ বা ফিকে 'কেরোসিন ইমলসন' ছড়াইয়া দেওয়া আবশ্যক।"*

গাছে উক্ত পোকা দেখা যাইলে, অবিলম্বে সেই অংশটী গাছ হইতে ভাঙ্গিয়া একবারে নষ্ট করিয়া ফেলা আবশ্যক নতুবা দুই এক দিবস মধ্যে উহারা স্থানীয় সমুদায় গাছকে আক্রমণ করিবে, তখন গাছ কাটিয়া ফেলা ভিন্ন কার্য্যতঃ কোন উপায় থাকে না। বিলম্ব করিলে পোকা সকল গাছের ফুল আক্রমণ করিয়া গাছে ফলজেন্মিতে দেয় না। তীব্র হুকার জল দিয়া দেখা গিয়াছে যে, তাহাতে পোকা বিনষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত আরও কয়েক প্রকার পোকার দ্বারা বেগুণ গাছ সময়ে সময়ে আক্রান্ত হয়। শিবপুর আদর্শ-কৃষিক্ষেত্রের তত্ত্বাবধায়ক স্বর্গীয় নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় বলেন যে 'এচিয়া মেলিসার্টি' (Achoea Melicerti) নামক পোকা দিবাভাগে মাটির মধ্যে লুকায়িত থাকিয়া রাত্রিকালে গাছের কচি-কচি পাতা খায় কিন্তু ভাল করিয়া চাষ করিলে তাহা জন্মিতে পারে না। তামাক ও লবণের জলে এই পোকার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে। দ্বিতীয় জাতীয় এফিলেচিয়া ভিনিনসিওক্টো পঙ্কেটেটা (Aphillachia Vigintiocto punctata) কীটাবস্থায় বেগুণের পাতা খায় এবং পতঙ্গাবস্থায় বেগুণ গাছের পোকা খায়। ইহার দ্বারা উপকার ও অপকার দুইই হয়। প্রথম জাতীয় পোকা Achoea Melicerti কীটাবস্থায় দেখিতে প্রায় রেশম কীটের ন্যায়। দ্বিতীয় জাতীয় Aphilachia Vigintiocto punctata পোকাবস্থায় সবুজ

---

* "The insects.... .are plant lice (Aphididæ) belonging to the genus Aphis."

"This insect has not hitherto been reported as pest to agriculture. I would recommend that spraying the plant with a weak solution of Kerosine Emulsion would be the best plan to get rid of the pest."

রঙ্গের চাকা-চাকা; অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকায়। পতঙ্গাবস্থায় প্রথম জাতীয় পোকা প্রজাপতিরূপ ধারণ করে, কিন্তু যে পোকা দ্বারা গাছের অধিক ক্ষতি হয়, তাহা ডালের মধ্যে থাকিয়া গাছের শাঁস খায়। কীটদষ্ট শাখা বা ডগাগুলি ভাঙ্গিয়া পোড়ান ভিন্ন উপায় দেখি না। ডালে ও পাতায় বিষ ছিটাইয়াও দেখিয়াছি উক্ত পোকার উপদ্রব কমে নাই। উহা (Diatrooe saccharalis) পতঙ্গাবস্থায় ক্ষুদ্রকায় প্রজাপতির ন্যায় থাকে। উক্ত প্রজাপতি গাছের ডালে ডিম দিয়া যায় এবং সেই ডিম প্রস্ফুটিত হইলে যে কীট উৎপন্ন হয় তাহারা ডালের মধ্যে ছিদ্র করিয়া ভিতরে প্রবেশ করে।

মধ্যে মধ্যে ক্ষেত্রের স্থানে স্থানে সন্ধ্যার পর জঞ্জাল পোড়াইয়া ধোঁয়া দিতে পারিলে পোকা মাকড়ের উপদ্রব কমিয়া যায়। আলোক দেখিয়া অনেক পতঙ্গ উড়িয়া আসিয়া অগ্নিতে ঝাঁপ দেয় ফলতঃ তাহাদিগের দৌরাত্ম হ্রাস হয়।

বাক্‌লা (Field Bean)*

বাক্‌লার শুষ্ক দানা বজ্রবৎ কঠিন সুতরাং বপন করিবার পূর্ব্বে দানাগুলিকে ঈষদুষ্ণ জলে ফেলিয়া দিবে এবং তদবস্থায় ২৪ ঘণ্টা রাখিয়া দিবার পর বপন করিতে হইবে।

বাক্‌লা গাছ দেড় হইতে দুই হাত উচ্চ হইয়া থাকে। ইহার ফল ছোট ছোট মটর শুঁটীর ন্যায়। ফল অতি পুষ্টিকর এবং অর্দ্ধপুষ্টাবস্থায় ব্যঞ্জনাদিতে ব্যবহৃত হইবার উপযোগী। পাকিয়া গেলে দানা কঠিন হইয়া যায়, তখন মানুষের ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া পড়ে। আশ্বিন-কার্ত্তিক মাস বীজ বপন করিবার সময়।

---

* গ্রন্থকার লিখিত "Field Beans as Fodder" নামক প্রবন্ধ। Indian Agriculturist, May 5, 1894.

অগ্রহায়ণ মাসের শেষভাগ হইতে গাছে ফুল ধরে এবং চৈত্র মাসের শেষ অবধি ফল হইয়া থাকে। গরম বাতাস পড়িলেই গাছ মরিয়া যায়। কচি অবস্থাতেই উহার শুঁটী তরকারীতে ব্যবহার করিতে হয়,ফল পাকিলে দানাসমুহ কঠিন হইয়া যায়, তখন আর তরকারীতে ব্যবহার চলে না। বীজ চূর্ণ করিয়া গাভীদিগকে খাইতে দিলে উহারা দুগ্ধবতী হয়। বাকলার গাছও গাভীগণ আগ্রহ সহকারে খাইয়া থাকে। ফল সকল অর্দ্ধ পরিপক্ক হইলে ফলসমেত গাছ কাটিয়া খাওয়াইলে গাভীগণ অধিক পরিমাণে এবং ঘন দুগ্ধ প্রদান করে।

বিলাতী বাকলা (Broad Bean

বিলাতী-বাকলার গাছ দেখিতে প্রায় দেশী-বাকলার ন্যায় কিন্তু বিলাতী বাকলার পাতা অপেক্ষাকৃত বড় ও চওড়া হয়। ইহার ফল ও বীজ বড় ও চেপ্টা হয়।

শালগম, গাজর প্রভৃতির ন্যায় চৌকায়, এক বা দেড় হাত অন্তর এক-একটী বীজ বপন করিতে হয়। বীজ অঙ্কুরিত হইতে ১০।১২ দিন সময় লাগে কিন্তু ১০।১২ ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া রোপণ করিলে অপেক্ষাকৃত শীঘ্র অঙ্কুরিত হয়। মাটিতে রসের অবস্থা বুঝিয়া সপ্তাহে একদিন, কি দুই দিন জলসেচন করা আবশ্যক। কার্ত্তিক মাস বীজ বপনের সময়। পৌষ মাস হইতে গাছে ফল ধরিতে থাকে। কচি অবস্থায় ব্যবহার করিতে আরম্ভ করা উচিত।

মূলা (Radish)

মূলার জাতি, স্থানীয় জলবায়ুর অগ্রপশ্চাৎ অনুসারে এবং ফসলবিশেষের ঋতু বুঝিয়া প্রায় বারোমাস বীজ বপন করা যাইতে পারে। বারোমাস ফসলের সরবরাহ রাখিতে হইলে জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাস হইতে প্রতি মাসে

দুইবার বীজ বপন করা উচিত। কার্ত্তিক মাসের পূর্ব্বে বিলাতী বীজ বপন করা উচিত নহে।

মূলা,—কন্দ জাতীয় উদ্ভিদ সুতরাং তাহার জন্য হাল্‌কা দোয়াঁশ মাটি প্রশস্ত। মাটি কঠিন হইলে কোমল মূল মাটি ভেদ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না এবং পার্শ্বস্থিত মাটির কঠিনতাবশতঃ মূলা সকল বিকৃতাকার ও কঠিন হয়।

বিলাতী-মূলা।—সাধারণতঃ ইহার দুইটী জাতি দেখা যায়। এক জাতীয়—লম্বা, এবং অন্য জাতীয়—গোল। প্রথম জাতীয় মূলার জন্য মৃত্তিকা ঈষৎ গভীর করিয়া কোপাইয়া চূর্ণ করিতে হয়। মূলা-ক্ষেতের মাটি যতই হাল্‌কা ও চূর্ণ হইবে, মূলা তত কোমল ও বড় হয়। গোল জাতীয় মূলার জন্য ছয় ইঞ্চ গভীর মাটি হইলেই চলিতে পারে। গোল জাতীয় মূলাকে এণ্ডা-মূলা কহে। যে জাতীয় মূলারই আবাদ করা যাউক, জমির উত্তম পাট হওয়া উচিত। ক্ষেতে যেন কোন মতে ইষ্টক, খোলা, ঢেলা কিম্বা তৃণাদি জঙ্গলের শিকড় না থাকে। এই সকল জঞ্জাল সাধ্যমত বাছিয়া ফেলিতে হইবে।

গোয়াল-ঘরের গোবর ও চোনাবিশিষ্ট জঞ্জাল দ্বারা মূলার বিশেষ উপকার হয়। প্রতি চৌকায় বিশেষ পরিমাণে গো-শালার জঞ্জাল বিস্তৃত করিয়া মাটির সহিত বারম্বার উলট-পালট করতঃ কর্ষিত মাটি সমতল করণান্তর এক টুকরা কাষ্ঠ দ্বারা মাটি ঈরৎ চাপিয়া দেওয়া উচিত।

মূলা বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়। বীজ বুনিবার পূর্ব্বে চৌকার মাটি নিম্নদেশের এক ইঞ্চ পরিমাণ উস্কাইয়া বা খুঁড়িয়া দিবার পর বীজ বপন করিতে হইবে। মূলার ন্যায় ক্ষুদ্র বীজ বুনিতে গেলে সকল স্থানে সমভাবে পতিত না হইয়া কোথাও ঘনভাবে, কোথাও পাতলা ভাবে পতিত হয়, কিন্তু বীজের সহিত ৪।৫ গুণ মাটি মিশাইয়া লইলে অনেকটা সমভাবে

ছড়াইয়া পড়ে। দীর্ঘকাল ক্ষেতে থাকিলে মূলার আকার বড় হয় কিন্তু স্বাদ তাদৃশ মিষ্ট থাকে না, উপরন্তু কঠিন ও ছিবড়া হইয়া যায়। এইজন্য আকার অপেক্ষা কোমলতার প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। বিলাতী মূলা দীর্ঘকাল জমিতে থাকে না। বীজ বপনের দিন হইতে ২০ দিন হইতে ৩০।৩৫ দিন মধ্যে খাদ্যোপযোগী হইয়া থাকে। বিলাতী মূলা,—তরকারী অপেক্ষা কাঁচা অবস্থায় স্বাদ মধুর।

দেশী-মূলা।—দেশী মূলারও কয়েকটী জাতি আছে, যথা শিকৃড়ে, বর্ষাতি, আউসে ও পৌষে। প্রথমোক্ত জাতি বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে, বর্ষাতি-মূলা আষাঢ় হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত, আউসে মূলা কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণে, এবং পৌষে মূলা পৌষ-মাঘ মাসে উৎপন্ন হয়, কিন্তু শীতের অর্থাৎ আউসে এবং পৌষে মূলা সর্ব্বাপেক্ষা বড় হয়। এসময়ের আবাদযোগ্য মূলা, মেদিনীপুর, কাঁথি ও পাটনা জাতীয়। মেদিনীপুর ও কাঁথির মূলার আকার বড় হয়, সুস্বাদও বটে, কিন্তু পাটনাই মূলার আকার তাদৃশ বৃহৎ না হইলেও স্বাদ অপেক্ষাকৃত উপাদেয়।

গ্রীষ্মের মূলার বীজ,—চৈত্র মাসে, বর্ষাতি মূলার বীজ,—জ্যৈষ্ঠ হইতে আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত; আউসে মূলার বীজ,—আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে, এবং পৌষে মূলার বীজ,—কার্ত্তিক মাসে বপন করিতে হয়। শিকৃড়ে মূলার ক্ষেতে যথেষ্ট পরিমাণে জলসেচন করিতে হয়। এসময়ে রৌদ্র প্রখর ও মাটি নীরস বলিয়া গাছ বাড়ীতে পারে না। এইজন্য পটির উপর এক হাত উচ্চে অনতিঘন মাচান কিম্বা খড়ের আচ্ছাদন করিয়া দিলে ভাল হয়। এতদর্থে নারিকেল পাতা, খেজুর পাতা, দরমা, হোগলা, কিম্বা উলু প্রভৃতি ব্যবহার করা চলিতে পারে। এসময়ে মূলার আকার বড় হয় না কিন্তু যে তরকারিতে উহা ব্যবহৃত হয়, তাহার স্বাদ অতি উপাদেয় হয়, এইজন্য ইহার আবাদ স্পৃহনীয়।

যে পটিতে বা যে স্থানে বর্ষাতি-মূলার আবাদ করিতে হইবে, সে স্থান সাধারণ জমি হইতে ঈষৎ উচ্চ হওয়া উচিত কারণ তাহা হইলে বর্ষাকালে তথায় আদৌ জল সঞ্চিত হইতে পারে না। জমিতে জল সঞ্চিত হইলে মাটি দৃঢ় হইয়া যায় ফলতঃ মূলা বাড়িতে পারে না।

আউসে ও পৌষে মূলার আবাদকালে অতিরৌদ্র বা অতিবৃষ্টির সম্ভবনা নাই, তাহা ব্যতীত এ সময় যথেষ্ট শিশিরপাত হয়। এই সকল কারণে জলসেচনের তত প্রয়োজন হয় না।

মূলার জমি প্রচুর সার প্রত্যাশা করে। মাটি যত সারবান হইবে, তত শীঘ্র মূলা বৃদ্ধি পাইবে। শীঘ্র-বৃদ্ধিই ইহার কোমলতা, সুস্বাদ, সুঘ্রাণের কারণ। সকল প্রকার মূলার জন্য মাটি সারাল ও ঝুরা হওয়া চাই।

ইহার ন্যায় যে সকল তরকারী অল্পদিনের মধ্যেই আহারোপযোগী হয়, তাহাতে সদ্য বা টাট্‌কা ও দুর্গন্ধযুক্ত সার দিলে ফসলের স্বাদ নষ্ট হয়। অতএব পুরাতন সার প্রদান করাই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ।

স্যালসিফি (Salsify)

গাজর, বীট প্রভৃতির ন্যায় ইহা এক প্রকার কন্দ জাতীয় আনাজ। এদেশে এখনও ইহার বিশেষ আদর হয় নাই, সুতরাং সমধিক পরিমাণে আবাদ হয় না। শীতের ব্যবহারোপযোগী কপি প্রভৃতির ন্যায় ইহারও বীজ শ্রাবণ হইতে আশ্বিন মাস মধ্যে ভাঁটিতে বপন করিতে হয়। পরে চারাগুলি প্রায় তিন অঙ্গুলি পরিমাণ বড় হইলে চৌকায় ৯-ইঞ্চ অর্থাৎ প্রায় আধ হাত অন্তর, দুই তিন অঙ্গুলি গভীর মাটির মধ্যে পুতিয়া দিতে হয়। মাটি খুব ঝুরা ও সারবান হওয়া আবশ্যক। ইহার কন্দ পার্শ্বদেশে

যেমন বর্দ্ধিত হয়, ভূগর্ভ মধ্যেও প্রায় ১২।১৪ ইঞ্চ প্রবেশ করে, সুতরাং ইহার জন্ত মাটি সমধিক গভীর, সারাল ও আলগা হওয়া উচিত। সময়ে সময়ে নিড়ানী ও জলসেচন করা ভিন্ন ইহার অপর কিছু পাট নাই।

কন্দ আহারের উপযোগী হইলে ভূমি হইতে তুলিয়া পাতা ছাঁটিয়া কোন আবৃত স্থানে বালির মধ্যে রাখিয়া দিলে অনেক দিন থাকিতে পারে এবং প্রয়োজনমত বাহির করিয়া লইতে হয়।

পার্স্নিপ (Parsnip)

গাজরের ন্তায় ইহা এক প্রকার কন্দ-জাতীয় তরকারী। ইহার আবাদ অতি অল্পই দেখা যায়। পারস্নিপ দুই প্রকারের দেখা যায়। এক প্রকারের মূল কন্দ লম্বা দেশী মূলা বা গাজরের ন্তায়। অন্ত প্রকারের মূল,—গোল শালগমের ন্তায়।

সারবান, গভীর ও সুকর্ষিত জমিতে ইহা ভাল জন্মে। মাটির সহিত উত্তম গোবর-সার বা গোয়াল বাড়ীর আবর্জ্জনা মিশ্রিত করিলে ভাল হয়। মাটিতে ঢিল বা কাঁকর থাকিলে বাছিয়া ফেলিতে হইবে। আশ্বিন মাসে বীজ বপন করিবার সময়।

উল্লিখিত প্রণালীতে পটির জমি প্রস্তুত হইলে তন্মধ্যে পৌনে এক হাত ব্যবধানে শ্রেণী নির্দ্দেশ করতঃ মাটির ভিতরে এক ইঞ্চি নিম্নে পাতলা করিয়া বীজ বপন করিয়া মাটি ঢাকা দিতে হইবে। সময়ে সময়ে জলসেচন করিতে হয়। বীজ অঙ্কুরিত হইয়া চারা জন্মিলে অতি সাবধানে নিড়ুণ করিয়া দিতে হইবে। চারাগুলি দুই-তিন অঙ্গুলি উচ্চ হইলে, যদি ঘন-ভাবে জন্মিয়া থাকে বোধ হয়, তাহা হইলে পটি পাতলা করিয়া দেওয়া উচিত। চারা পরস্পরের মধ্যে ৯-ইঞ্চি অর্থাৎ আধহাত স্থান রাখিলেই

চলিবে। সপ্তাহে একবার জলসেচন এবং আবশ্যকমত নিড়ান করাভিন্ন বিশেষ কোন পরিচর্য্যা নাই।

মৌরী (Anise)

হিন্দী ভাষায় মৌরী—সৌঁফ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহা তরিতরকারি মধ্যে পরিগণিত না হইলেও আমাদিগের গৃহস্থালীতে মৌরীর যথেষ্ট ব্যবহার আছে, সুতরাং আদর আছে। ব্যঞ্জন রন্ধনে, তাম্বুল ব্যবহারে মৌরী যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। মৌরীর গন্ধ ও স্বাদ অতি মৃদু ও মধুর। মৌরী হইতে এক প্রকার সুরা প্রস্তুত হয়।

প্রয়োজনানুরূপ আবাদের জন্য বড় বা ছোট হাপোরে কিম্বা চৌকায় বীজ ছড়াইয়া চারা উৎপন্ন করিতে হয়। কার্ত্তিক মাসই বীজ বপনের সময়। বীজ বপনের চৌকা বা হাপোরের মাটি উত্তমরূপে তৈয়ার করিয়া বীজ বুনিতে হইবে। ৫।৬ দিনের মধ্যে চারা উদ্গত হয়। এক্ষণে জল সেচন করা উচিত। চারাগুলি স্থানান্তরিত হইবার যোগ্য হইলে অর্থাৎ ৪।৫ অঙ্গুলি দীর্ঘ হইয়া উঠিলে চৌকা মধ্যে এক হাত ব্যবধানে শ্রেণীর মধ্যে এক হাত অন্তর চারা নাড়িয়া পুতিতে হইবে। রোপণকার্য্য অপরাহ্নে করা উচিত। রোপণের পর প্রথমাবস্থায় প্রাতঃকালে ঈষৎ জল সেচন করিতে হইবে। অতঃপর মধ্যে মধ্যে জমি নিস্তৃণ করা ভিন্ন অপর কোন পরিচর্য্যা নাই; কিন্তু মাটিতে রস না থাকিলে মধ্যে মধ্যে জল সেচন করিতে হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য। পৌষ-মাঘ মাসে গাছে শীষ উদ্গত হয় এবং তাহাতে ফুল, ক্রমে ফলের সমাগম হয়। এই সকল ফলই—মৌরী। চৈত্র-বৈশাখ মাসে মৌরী সকল পাকিয়া উঠে। তখন ডগা কাটিয়া আনিয়া ঝাড়িয়া-ঝাড়িয়া তুলিতে হইবে।

শুল্‌ফা শাক (Dill)

শুল্‌ফা-শাকের হিন্দী নাম,—সোয়া। নানাবিধ তরকারী সুবাসিত করিবার জন্য ইহার শাক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অনভ্যস্ত ব্যক্তিদিগের নিকট ইহার গন্ধ প্রথম-প্রথম তীব্র বোধ হয়।

যথানিয়মে জমি তৈয়ার করিয়া কার্ত্তিক মাসে হাপোরে বীজ ছড়াইয়া চারা উৎপন্ন করিতে হয়। চারাগুলি ৩।৪ অঙ্গুলি পরিমাণ বড় হইলে পটি বা চৌকা মধ্যে এক হাত অন্তর শ্রেণী মধ্যে তিন পোয়া হইতে এক হাত অন্তর একটী একটী চারা রোপণ করিতে হয়। সময়ে সময়ে জল সেচন ও পটি নিড়্‌ণ করা ভিন্ন বিশেষ কোন পাট নাই। ইহার বীজও মসলারূপে ব্যবহৃত হয়। বীজ পাকিলে ডগা কাটিয়া আনিয়া মৌরির মত ঝাড়িয়া-ঝাড়িয়া তুলিতে হয়।

পার্ব্বত্য শীতপ্রধান দেশে ফাল্গুন হইতে বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত বীজ বপনের সময়।

কালজীরা (Nigila Small Fennel)

ভারতবর্ষে কালজীরা বহুকালাবধি জন্মিতেছে কিন্তু কোন কোন সাহেবদিগের মতে ইহা মিশর ও ইউরোপের দক্ষিণাংশের গাছ।

ইহা শুলফা শাকের ন্যায়, সুতরাং এ সম্বন্ধে আর কিছু বক্তব্য নাই। কালজীরে এদেশী সাধারণ তরকারীতে অতি অল্প ব্যবহৃত হয়।

বেতুয়া বা বেতো শাক (Chenopod um)

বেতুয়া শীতকালে জন্মিয়া থাকে। ছোট ছোট কেয়ারি বা চৌকায় কার্ত্তিক মাসে পাতলাভাবে বীজ ছিটাইয়া দিবে। মধ্যে মধ্যে জলসেচন

আবশুক। গাছ বাড়িলেই কাটিয়া ব্যবহার করা উচিত। বেতুয়া শাক বড় কোমল ও সুস্বাদু। কবিরাজী শাস্ত্রমতে উহা নানাবিধ ঔষধের কার্য্য করে। ইহা দেশী শাক,—সুতরাং ইহার বীজ অতি সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

বর্ণভেদে ইহার দুইটী জাতি আছে। এক জাতির গাছ সম্পূর্ণ সবুজ বর্ণের; অপর জাতির পাতার বোঁটা ও শিরা বেগুণী রঙ্গের। উভয় প্রকারই ব্যবহার্য্য।

পালঙ (Beta Bengaliensis)

নানাবিধ শাকের মধ্যে পালঙ অন্যতম। পালঙের পাতা স্থূল, কোমল ও রসাল। ভাতে, সিদ্ধ, ঘণ্ট, ভাজা ও চচ্চড়ীরূপে ভক্ষণীয়। ইহা অতি মিষ্ট ও উপাদেয় তরকারী।

পালঙ শাক শীতকালের তরকারী হইলেও বারোমাসই উৎপন্ন করিতে পারা যায়; কিন্তু শীতের পালঙ বড় এবং ঝাড়াল হয়। এ সময়ের আবাদে তত অধিক জলসেচনের প্রয়োজন হয় না; কিন্তু গ্রীষ্মকালের ফসলে প্রচুর পরিমাণে জলসেচন করা প্রয়োজন।

পালঙের বর্ণভেদে দুইটী জাতি আছে,—লাল ও সাদা বা সবুজ। শেষোক্ত পালঙের গাছ বৃদ্ধিশীল। পত্রসমূহ অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার ও স্থূল।

বারোমাস যোগান রাখিতে হইলে কয়েকটী স্বতন্ত্র পটি রাখিতে হয় এবং প্রতি মাসে এক-এক পটিতে বীজ বুনিতে হয়।

চারা উৎপাদনের দুইটী নিয়ম আছে, ১ম,—পটি মধ্যে স্থায়ীরূপে বীজ বপন; ২য়,—হাপোরে বীজ বপনপূর্ব্বক চারা উৎপন্ন করিয়া স্থানান্তরে নী [illegible] আঁতর ব্যবধানে চারা-রোপন।

হাপোরের এবং পটির মাটি সারাল ও শিরাদার বা দানাদার (fibrous) এবং ৮।১০ ইঞ্চ গভীর ও ফাঁপা বা আল্‌গা হওয়া উচিত। পটি উত্তমরূপে কুদ্দালিত করণান্তর মাটির সহিত গোয়ালের আবর্জ্জনা সংযোজিত করিয়া মাটি চূর্ণ করিতে হইবে এবং সার ও মাটি উত্তমরূপে মিশাল করিয়া ঈষৎ চাপিয়া দিতে হইবে।

শীতের ফসলের জন্য আশ্বিনের শেষভাগ হইতে কার্ত্তিকের শেষ ভাগ পর্য্যন্ত বীজ বপন করিতে পারা যায়। বারমাস যোগানের জন্য প্রতি মাসে বা এক মাস অন্তর বীজ বপন করা উচিত।

পটিতে বীজ ছড়াইয়া না দিয়া আধ হাত অন্তর শ্রেণীতে ৭।৮ অঙ্গুলি ব্যবধানে ২-যব গভীর মাটির মধ্যে এক একটী বীজ পুতিয়া মাটি চাপা দিবে, অবশেষে মাটি ঈষৎ চাপিয়া দিবে। মাটি নীরস হইলে বীজ বপনের পূর্ব্বদিন পটিতে উত্তমরূপে জলসেচন করিয়া রাখা উচিত, কারণ মাটিতে রস থাকিলে বীজসকল শীঘ্র অঙ্কুরিত হয়। বপনের পর ৬।৭ দিবসের মধ্যে বীজ মুখরিত ও অঙ্কুরিত হয়।

হাপোরে চারা উৎপন্ন করিতে হইলে হাপোরের মধ্যে বীজ ছড়াইয়া যথানিয়ম বীজ-বপনকার্য্য সমাধা করিতে হইবে। ৪।৫টী পত্র উদ্গত হইলে পটি মধ্যে পূর্ব্বকথিত নিয়মানুসারে চারাগুলি রোপণ করিতে হইবে।

অতঃপর প্রয়োজনমত মধ্যে মধ্যে জলসেচন করা এবং মাটি উস্কাইয়া চূর্ণ করিয়া দেওয়া ভিন্ন অন্য কোন পরিচর্য্যা নাই।

পালঙ্গের পাতা, কোমল ডাঁটা ও শীষ, অবশেষে গোড়া, ভক্ষণীয়। গাছের পাতাগুলি বড় হইয়া উঠিলে গোড়ার এক অঙ্গুলি উপর হইতে কাটিয়া লইতে হয়। মাটি সারবান্ এবং রসাল হইলে ২০।২৫ দিন অন্তর পাতা ও ডগা সংগ্রহ করিতে পারা যায়।

চুকা-পালঙ্ (Sorrel)

ইহার স্বাদ অম্লাক্ত। শীতকালেই ইহা জন্মিয়া থাকে এবং পালঙ শাকের ন্যায় আবাদের নিয়ম। আশ্বিন মাসের শেষভাগে হাপোরে বীজ পাত দিয়া চারা উৎপন্ন করিতে হয়। বীজগুলিকে ২-অঙ্গুলি অন্তর অর্দ্ধাঙ্গুলি গভীর মাটির মধ্যে পুঁতিয়া দিয়া মাটি চাপা দিতে হইবে এবং মাটি সমতল করিয়া দিয়া হস্ত দ্বারা সমগ্র স্থানটী ঈষৎ চাপিয়া দিতে হইবে। বপনের পর ৫।৬ দিন মধ্যে চারা উদ্গত হয়। অতঃপর মধ্যে মধ্যে জলসেচন করিলে ১৫।২০ দিনের মধ্যে চারাগুলি স্থানান্তর-করণের উপযোগী হইয়া উঠে। চারাগাছ ৩-অঙ্গুলি পরিমাণ বড় হইয়া উঠিলে চৌকা বা পটীতে দীর্ঘে ও প্রস্থে এক হাত অন্তর স্থায়ীভাবে রোপণ করিয়া অল্লাধিক জল সেচন করিতে হইবে। চুকাপালং অম্লাস্বাদযুক্ত, ইহার পত্র ও কচি ডগা মধ্যে মধ্যে সংগ্রহ করিয়া রন্ধন করিতে হয়।

বরবটী (Lobeya)

বরবটী,—সুঁটিজাতীয় অতি সুখাদ্য ও পুষ্টিকর তরকারী। কার্ত্তিক াস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। কচি রবটী তরকারীতে ব্যবহার করিতে হয়। সুপক্ক দানায় দ্বিদল বা ডাল স্তুত হইয়া থাকে।

বাগানের সাধারণ মাটিতে ইহা জন্মিয়া থাকে। আষাঢ় মাসে ক্ষেত স্তুত করিয়া শ্রাবণ মাসে চৌকামধ্যে বীজ ছিটাইয়া ফেলিতে হয়। হার গাছ লতানিয়া হইয়া থাকে। ঘনভাবে জন্মিলে ফলন বেশী হয়), এজন্য চারা জন্মিলে ঘন স্থান হইতে চারা তুলিয়া পাতলা করিয়া ওয়া উচিত। কার্ত্তিক মাস হইতে গাছে ফল জন্মিতে থাকে তখন

প্রতিদিন ফল তুলিতে হয়। অনাবশ্যক স্থলে গাছেই ফল থাকিতে দেওয়া উচিত। গাছ যখন মরিতে আরম্ভ করিবে, তখন সমুদায় ফল সংগ্রহ করতঃ রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া গৃহমধ্যে রাখিয়া প্রয়োজনমত ব্যবহার করিতে হয়! বরবটীর দাল কিয়ৎকাল জলে ভিজিলেই নরম হইয়া থাকে। তখন উহা কাঁচা খাইতে অথবা তরকারীতে ব্যবহার করিতে পারা যায়।

সীম (Lab-lab or Sheem)

দেশী সীমের মধ্যে আলতাপাতি, সাদা, বাঘনখা, ঘৃত-কাঞ্চন, গুড়দল প্রভৃতি কয়টী প্রধান। সীম শীতকালে জন্মিয়া থাকে।

জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে ক্ষেত্রমধ্যে স্থানে স্থানে মাদা তৈয়ার করিয়া বীজ বপন করিতে হয়। বপন করিবার পূর্ব্বে চব্বিশ ঘণ্টাকাল বীজগুলিকে জলে ভিজাইয়া রাখা কর্ত্তব্য। অনন্তর প্রত্যেক মাদায় ২।৩টী সুপুষ্ট বীজ পুতিয়া দিতে হয়। চারাগুলি বড় হইয়া উঠিলে উপরে মাচা তৈয়ার করিয়া দেওয়া আবশ্যক। মাচার উপরে গাছ উঠিলে বিস্তর ফল হয় এইজন্য পল্লীগ্রামে গৃহস্থগণ ছাদের উপরে বা ঘরের চালে উঠাইয়া দিয়া থাকেন। কার্ত্তিক মাস হইতে ইহা প্রচুর পরিমাণে ফল প্রদান করে। শীতাবসানে যদিও গাছ মরে না তথাপি উহা কাটিয়া ফেলা উচিত, কারণ দ্বিতীয় বৎসর উহাতে তাদৃশ অধিক বা ভাল ফল হয় না।

মাখন-সীম (Butter-bean or Jack-bean)

মাখন-সীমের দুইটী জাতি আছে। সীমের দানার বর্ণভেদে জাতিভেদ হইয়াছে। উভয় জাতির মধ্যে এক জাতির দানা শুভ্র বর্ণের, এবং

অপর জাতির দানা গোলাপী বা লালবর্ণের। প্রথমোক্ত সীমের নাম—শ্বেত বা সাদা মাখন-সীম এবং লাল বা গোলাপী দানাদার সীমের নাম—লাল মাখন-সীম। ইহাদিগের আবাদ প্রণালী মধ্যে কোন প্রভেদ নাই।

মাখন-সীম অতি সুমিষ্ট সীম, কিন্তু অধিক দিন গাছে থাকিলে এতই কঠিন হইয়া যায় যে, অব্যবহার্য্য হইয়া পড়ে, সুতরাং কচি থাকিতে ব্যবহার করা উচিত।

মাখন-সীম অতি বৃহৎ লতা। ইহার ফল অল্পাধিক একহাত দীর্ঘ হয়, কিন্তু অত দীর্ঘ হইতে দিলে ফলন বেশী হয় না, উপরন্তু যাহা জন্মে তাহাও কোমল ও খাদ্যোপযোগী থাকে না। গাছের গোড়ায় তরল সার দিলে পর্য্যাপ্ত ফলন হয় এবং ফলও কোমল হয়। চৈত্র-বৈশাখ মাস বীজ বপনের সময়। মাখন-সীমের লতা সুদীর্ঘ, বিস্তৃত, গুরুভার। ইহার জন্য দৃঢ় ও উচ্চ মাচান করিয়া দিতে হয় কিম্বা প্রাচীর বা বেড়ায় নিয়ন্ত্রিত করিয়া দিলে চলে।

চারকোণা-সীম (Goa Bean)

কামরাঙ্গা সদৃশ পলবিশিষ্ট চারকোণা ফল বলিয়া ইহাকে চারকোণা সীম কহে। ফল প্রায় ৩।৪ অঙ্গুলী দীর্ঘ হয় এবং আস্বাদ প্রায় ফরাস-বীনের (french bean) ন্যায়। আষাঢ়-শ্রাবণে বীজ বুনিতে হয়। সীমের ন্যায় ইহার পাট করিলেই চলিবে।

স্কোয়াস্ (Squash)

স্কোয়াস বিলাতী কুমড়ারই জাতিবশেষ মাত্র, কিন্তু ইহার গোড়ার অংশ অপেক্ষাকৃত সরু বা সূচাল হয়। কুমড়া ও স্কোয়াস মধ্যে প্রভেদ এই মাত্র। স্কোয়াসের হিন্দী নাম,—বিলাতী কদু। ইহা এক প্রকার ছোট জাতীয় বিলাতী কুমড়া এবং সুখাদ্য তরকারী। সমতল দেশে আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে, উত্তর পশ্চিমে ফাল্গুনের শেষভাগে, বীজ বপন করিতে হয়। ক্ষেত্রমধ্যে ৫।৬ হাত অন্তর ১-হাত ব্যাসের মাদা প্রস্তুত করিতে হয়। মাদাগুলি এক হাত গভীর খনন করতঃ তন্মধ্যস্থিত মাটির সহিত উত্তমরূপে সার মিশাইয়া বীজ বপন করা উচিত। সাররূপে গবাদি পশুশালার আবর্জ্জনা প্রশস্ত। বীজ অঙ্কুরিত হইলে যথারীতি জলসেচন করিবে। ছয়-সাত দিনের মধ্যে বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। চারাগুলিতে পাঁচ-ছয়টি পাতা উদ্গত হইলে প্রত্যেক মাদার উপরে কঞ্চি বা অন্য কোন পালা দিতে হয়। ইহার গাছ লতিকা, অধিক বড় হয় না,—ছয়-সাত হাত হইলেই যথেষ্ট হইল।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এবং শৈত্য-প্রদেশে শীতের প্রকোপ বেশী বলিয়া তথায় শীতকালে না করিয়া গ্রীষ্মকালে আবাদ করিতে হয়। সে সকল দেশে মাঘ মাসের শেষ হইতে ফাল্গুন মাসের শেষ পর্য্যন্ত বীজ বপন করা উচিত।

গাছের প্রকৃতি অনুসারে স্কোয়াস দুই ভাগে বিভক্ত যথা,—'বুস্' (bush) বা ঝোপ এবং লতানিয়া। 'বুস' জাতির গাছ ছোট ছোট ঝোপের ন্যায় হয়, আর অন্য জাতি লতাইয়া যায়। প্রথমোক্ত জাতির জন্য দীর্ঘ ও প্রস্থে তিন ফুট স্থান দিলেই চলে। শেষোক্ত প্রকারের জন্য দীর্ঘে ও প্রস্থে ছয় হাত স্থান দিতে হইবে। স্থান বিশেষের গুণে এই জাতীয়

স্কোয়াসের লতিকা সুদীর্ঘ ও প্রসারিণী হয়। সেরূপ স্থলে অবলম্বনের জন্য মাচা বা জাফরি কিম্বা বেড়া নির্ম্মাণ করা আবশ্যক।

মহীশূর রাজ্যে স্কোয়াসের প্রভূত আবাদ হইয়া থাকে এবং বাজারে বারোমাসই স্কোয়াস আমদানী হয়। জলবায়ুর বিশেষত্বহেতু সেখানে বারোমাস স্কোয়াস জন্মে। আমি বর্ষাকালে তথায় চারি মাসকাল ছিলাম—এবং প্রতিদিন ব্যঞ্জনাদিতে স্কোয়াস ব্যবহার করিতাম। সেখানে স্কয়াস গাছের বিশেষ যত্ন করিতে হয় না অথচ গাছগুলি লাউ, কুমড়া বা ঝিঙ্গে গাছের ন্যায় সুদীর্ঘ লতা হইয়া প্রচুর ফল প্রদান করে।

ইহার ফল দেখিতে অতি সুন্দর। 'ক্রুক-নেক' গুলির আকৃতি কল্কার ন্যায় এবং তাহার গাত্র দাগ্ড়া-দাগ্ড়া ও বন্ধুর। আবার বুস্ জাতীয়গুলির ফল ঈষৎ পল-কাটা। কয়েক জাতির বিবরণ নিম্নে লিখিত হইল:—

একষ্ট্রা-আর্লি-বুস (Extra Early Bush) অঙ্কুরিত হইবার ৪১ দিনের মধ্যে ইহার ফল ব্যবহারোপযোগী হয় এবং কচি অবস্থায় শুভ্র ও কোমল থাকে, কিন্তু পাকিলে হরিদ্রাভ ও শক্ত হয়। মাটি ও সারের তারতম্যানুসারে প্রত্যেক গাছ ২।৩ হাত স্থান অধিকার করে।

গোল্ডেন-সমার-ক্রুকনেক (Golden Summer Crookneck) ইহার বর্ণ সোনালী।

বারবেডোজ-ক্লষ্টার (Barbadose Cluster)। আট ইঞ্চ লম্বা এবং ডিম্বাকৃতি। ইহার প্রচুর ফল জন্মে।

হোয়াইট-টরব্যানা (Landreth's White Turban) ইহার আকার টুপির ন্যায় অর্থাৎ একদিক সরু ও অন্য দিক চওড়া। সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারিলে গৃহে এক বৎসর কাল থাকিতে পারে।

ম্যামথ-চিলি (Mammoth Chilli) ইহা এক একটা বড় গামলার

র হয় এবং ওজনে ২॥০ মণ পর্য্যন্ত হইতে শুনা যায়। কিন্তু এদেশে হাকেও অত বড় ফল উৎপন্ন করিতে দেখি নাই বা শুনি নাই। তবে া বিলাতী কুমড়ার (Pumpkin) নামান্তর বলিয়া বোধ হয়।

আরও কয়েকটী উৎকৃষ্ট জাতি আছে, এ স্থলে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রোজন। বীজ-বিক্রোতাদিগের ক্যাটলগে তাহা দ্রষ্টব্য।

ইয়োকোহাম (Yokohama) জাতীয় যে সকল স্কোয়াস, তাহাদের গাছ ১২ ফুট অর্থাৎ প্রায় ৮ হাত পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয়। ফল গোলা- র কিন্তু শেষাংশদ্বয় চ্যাপ্টা। ফলের গাত্র খাঁজবিশিষ্ট এবং ব্যাস ৮।১০ পর্য্যন্ত হয়।

স্কোয়াস জলে সুসিদ্ধ করিয়া কুমড়া-ভাতের ন্যায় মাখিয়া তাহার সহিত ত দুগ্ধ, মরিচের গুঁড়া ও ঈষৎ লবণ দিয়া গরম করিলে উত্তম পায়স ড়িং (Pudding) প্রস্তুত হয় এবং খাইতে বড় ভাল লাগে। এত- ত নানাবিধ দেশী তরকারীতে স্কোয়াস ব্যবহৃত হইতে পারে।

শৈলাচল প্রদেশে চৈত্র মাস হইতে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ পর্য্যন্ত বীজ বার সময়।

সা-জীরা (Caraway)

আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে ইহার বীজ বপন করিতে হয়। কোন স্থানে উৎপন্ন করিয়া গাছগুলিতে ৪ ৫টী পাতা জন্মিলে, এক ফুট ব্যবধানে মধ্যে রোপণ করিতে হয়। মাটি হাল্‌কা ও সাধারণ হওয়া উচিত। া সকল নয়-ইঞ্চ বা আধ হাত ব্যবধান করিলেই চলিবে। শৈত্য শে ফাল্গুন-চৈত্র মাসে উল্লিখিত প্রণালীতে আবাদ করিতে হয়।

ইহার আবাদে বিশেষ কোনরূপ পাট নাই, মধ্যে মধ্যে জল সেচন নিড়ানী ভিন্ন অপর কোন তদ্বির আবশ্যক করে না।

শসা (Cucumber)

শসা প্রায় বারমাসই জন্মে। এক হিসাবে ইহা ফল, অন্য হিসাবে তরকারী, সুতরাং দুই রকমে ইহা ব্যবহৃত হয়।

ঋতুবিশেষের আবাদফলে শসা দুইটী প্রধান জাতিতে বিভক্ত ১ম, —ভুঁয়ে-শসা; ২য়,—পালা-শসা। ভুঁয়ে-শসা গ্রীষ্মকালে এবং পালা-শসা বর্ষাকালে জন্মে। ভুঁয়ে-শসা ভূপৃষ্ঠোপরি লতাইয়া যায় এবং অধিক বাড়ে না। ইহাদিগের ফল তাদৃশ বড় হয় না কিন্তু পালা-শসা বর্ষাকালের গাছ, অতিশয় দীর্ঘ ও স্থূল হয় এবং প্রচুর ও বড় বড় ফল প্রদান করে।

পালা-শসা।—জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে বীজ বপনের সময়। ক্ষেত্র মধ্যে ৬।৭ হাত ব্যবধানে এক-একটী মাদা করিয়া তন্মধ্যে পুষ্করিণীর মাটি, পোড়া মাটি, গোয়ালের আবর্জ্জনাদি উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া বীজ বপন করিতে হয়। এক-একটি মাদায় তিনটী সুপুষ্ট বীজ পুঁতিবে। বীজ পুঁতিয়া মাদার উপর দুই অঙ্গুলি স্থূল করিয়া সার দিয়া রাখিবে। ইহাকে 'আবরণ' কহে। বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠিলে জলসেচন করিতে হয়।

চারাগুলি ৫।৬টী পাতাবিশিষ্ট হইলে গোড়ায় মাটি উচ্চ করিয়া দিতে হইবে। মেটে-ঘরের পুরাতন দেওয়াল ভাঙ্গা মাটি কিম্বা পোড়া-মাটি ইহার পক্ষে বিশেষ উপকারী, সুতরাং যদি সুবিধামত পাওয়া যায় তাহা হইলে কিয়ৎ পরিমাণে গাছের গোড়ায় দিতে হইবে। ইহাতে গাছের তেজ বৃদ্ধি করে। পালা-শসার জন্য মাচানের প্রয়োজন। পাঁচ ছয়টী গাছের উপরে একটী করিয়া বড় মাচা করিয়া দিলেই চলিবে। গাছের

---

* 'আবরণ' কাহাকে বলে এবং তাহার উদ্দেশ্য ও উপকারিতা কি? এ সকল বিষয় গ্রন্থকার কৃত 'ভূমিকর্ষণ' নামক পুস্তকে সবিশেষ বর্ণিত হইয়াছে।

গোড়া সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিবে এবং তথাকার মাটি যাহাতে আল্‌গা থাকে তদ্বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে।

পালা-শসা-শ্রাবণ মাস হইতে আশ্বিন-কার্ত্তিক পর্য্যন্ত ফল প্রদান করে কিন্তু শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে যে ফল জন্মে তাহাই উৎকৃষ্ট হয়, ফল বড় হয় এবং ফলের স্বাদ মুখরোচক হয়।

ভুঁয়ে-শসা।—স্থানবিশেষে ইহা চৈতে শসা নামে অভিহিত। ইহার বীজ ৪।৫ হাত অন্তর মাদায় বপন করিবে। ভুঁয়ে-শসার গাছ ছোট হয় সুতরাং তাহার জন্য মাচার আবশ্যক হয় না, উহা জমিতেই লতাইয়া থাকে। প্রচুর জলসেচন করা এবং মাটি খুসিয়া দেওয়া ভিন্ন অন্য কোন পাট নাই। উক্ত শসার বীজ মাঘ-ফাল্গুন মাসে বপন করিতে হইবে। মধ্যে মধ্যে গোবরের জল দিলে ফল অধিক ও বড় হয়।

নেপালে এক প্রকার শসা জন্মে, দারজিলিং অঞ্চলেও তাহার আবাদ হইয়া থাকে। ইহা প্রায় ১৮ হইতে ২০ ইঞ্চ দীর্ঘ এবং ৫।৬ ইঞ্চ পরিধি-বিশিষ্ট হইয়া থাকে। হুগলী জেলায় তারকেশ্বর অঞ্চলেও বড় বড় শসা জন্মে।

ইংলণ্ড বা আমেরিকা হইতে যে সমুদায় শসার বীজ এ দেশে আনীত হয়, এদেশের সাধারণ সমতল প্রদেশে তাদৃশ আশানুরূপ ফল প্রদান করে না কারণ তাহাদিগের মধ্যে এমন অনেক জাতি আছে, যাহা তথায় গৃহ মধ্যে বা কাচের ঘরে জন্মে। সুতরাং সেই সকল কোমল স্বভাবাপন্ন গাছের বীজ-জাত গাছ এ দেশের রৌদ্র-বৃষ্টি সহ্য করিতে সক্ষম না হইয়া অঙ্কুরিত হইবার পর মরিয়া যায়, কোনটা বাঁচিয়া থাকিলেও সেরূপ সুপুষ্ট বা ফলপ্রসূ হয় না। এই জন্য দেশী-শসার বীজ সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করা ভাল।

শসার পক্ষে পুরাতন রাবিশের গুঁড়া বিশেষ সার। গাছের গোড়ায়

ইহা প্রদান করিলে গাছের খুব তেজ হয় এবং ফলও প্রচুর জন্মে। সারবান ক্ষেত্রের গাছ ষাঁড়াইয়া যায় ফলতঃ গাছের বৃদ্ধি এত অধিক হয় যে, সময়ে সময়ে গাছে ফল ধরে না। গাছ অত্যন্ত তেজাল হইলে কতকগুলি পাতা ও নগণ্য ফেকৃড়ি ভাঙ্গিয়া দেওয়া উচিত।

এক প্রকার লাল বর্ণের পতঙ্গ শসা-গাছের পরম শত্রু। ইহাদিগকে বিনাশ করিবার কোন উপায় নাই। তবে গাছের গোড়ায় ও পাতায় কাঠের ছাই দিলে তথায় পোকা-মাকড় আর যায় না। গাছের গোড়ায় বা তলায় ধোঁয়া দিলেও দুই চারি দিনের জন্য তাহারা পলায়ন করে। সপ্তাহে দুই দিন সন্ধ্যাকালে গাছের গোড়ায় এবং মাচার তলায় ঘুঁটে কিম্বা দোক্তা পাতার ধোঁয়া দিলে পাতায় ধোঁয়া গন্ধ হয়, এজন্য তাহারা সে দিকে ধাবিত হয় না। কচি ডগা ও কচি পাতাই ইহাদিগের আক্রমণের বিষয় কিন্তু সেগুলি ৫।৭ দিনের পুরাতন হইলে আর ভয়ের কারণ নাই, পাকা বা শক্ত পাতা তাহারা স্পর্শ করে না। নূতন ডগা উদ্গত হইলেই তাহাতে কাঠের ছাই ছড়াইয়া দেওয়া কীট-পতঙ্গ নিবারণের অতি উত্তম উপায়।

শসা,—ফলরূপে ব্যবহার করিতে হইলে ফল অধিকদিন গাছে রাখা উচিত নহে, ঈষৎ পরিপুষ্ট হইলেই গাছ হইতে পাড়িয়া খাওয়া উচিত, কিন্তু রন্ধন করিয়া ভক্ষণ করিবার জন্য আরও কিছুদিন অপেক্ষা করিলে সমগ্র ফলটী পরিপুষ্ট হয়, ফলতঃ ব্যঞ্জনাদিতে ব্যহবারেরর উপযোগী হয়।

শসার চাটনী হইয়া থাকে, দেশীমতে চাটনী করিতে হইলে শসা খোসা ছাড়াইয়া খুব ছোট-ছোট পাতলা-পাতলা করিয়া কাটিতে হয়। অতঃপর তাহার সহিত আদার রস, বা লেবুর রস ও লবন মিশ্রিত করিলে অতি মুখরোচক চাটনী হয়। এইরূপ চাটনী প্রায় তন্তুবায় ও সুবর্ণবণিকদিগের বাড়ীতে ক্রিয়াকর্ম্মে প্রস্তুত হয়।

উৎকৃষ্ট ফল বীজের জন্য রাখিতে হয়। বীজ-শসাকে পাঁড়শসা কহে। বীজ-ফল সুপক্ক হইয়া উঠিলে, তবে তাহা আহরণ করিবে এবং চিরিয়া বীজগুলি ধৌত করতঃ উত্তমরূপে শুষ্ক করিয়া রাখিয়া দিলে ভবিষ্যতে কাজে লাগিবে।

লাউ (Bottle-gourd.)

লাউ,—বাঙ্গালীর শীতকালের একটী প্রধান তরকারী। ইহা দুই জাতীয়—এক আউশে বা চৈতী, অপর আমুনে বা শীতের। চৈত্র-বৈশাখ মাসে যে লাউ জন্মে, তাহা আউসে এবং শীতকালে যাহা জন্মে, তাহা আমুনে। আমুনে-লাউ সুমিষ্ট ও উপাদেয়, সুতরাং সমধিক আদরের। আউসে-লাউয়ের স্বাদ তত সুস্বাদু নহে, এইজন্য বাঙ্গলা দেশে ইহার তাদৃশ আদর নাই। কিন্তু, বেহার ও পশ্চিমোত্তর-প্রদেশ অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে লাউ একটী প্রধান তরকারী মধ্যে পরিগণিত, এজন্য গ্রীষ্মকালেও তথায় ইহার প্রভূত আবাদ হয়।

আকৃতি অনুসারে লাউয়ের কয়েকটী জাতি আছে। ইহার কোন জাতি সুগোল কোন জাতি ঈষৎ লম্বা, আবার কোন জাতি দুই তিন হাত দীর্ঘ চোঙ্গ সদৃশ ফলও প্রদান করে। আউসের বীজ পৌষ মাসে এবং আমুনের বীজ জ্যৈষ্ঠ মাসে বপন করিতে হয়।

লাউ-বীজ মাদায় বপন করিতে হয়। মাদাটী গভীররূপে খনন করিয়া মাটি উলট-পালট ও চূর্ণ করিয়া, তাহার সহিত গোয়ালঘরের আবর্জ্জনা মিশাল করিতে হইবে। মাদা প্রস্তুত হইবার তিন চারি দিবস পরে তাহাতে বীজ পুতিতে হয়। বীজগুলিকে, পুতিবার অগ্রে, একদিন ভিজাইয়া রাখা বিধি, নতুবা অঙ্কুরিত হইতে অনেক বিলম্ব হয়। বীজ

অঙ্কুরিত করিবার আর একটী সহজ উপায়,—একখণ্ড কাপড়ে বীজগুলি আল্‌গা ভাবে বাঁধিয়া কিয়ৎক্ষণ ভিজাইয়া রাখিতে হয়। অতঃপর কতক-গুলি খড় উত্তমরূপে ভিজাইয়া বীজের পুঁটুলি উঠাইয়া সিক্ত খড়ের দ্বারা উত্তমরূপে জড়াইয়া বাঁধিয়া আধ হাত মাটির নিম্নে পুতিয়া রাখিতে হয়।

দুইদিন পরে মাটি হইতে উক্ত পুঁটুলি উঠাইয়া লইলে যদি দেখা যায় যে, বীজগুলির অঙ্কুরোদ্গম হইয়াছে তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ অঙ্কুরিত বীজগুলি প্রত্যেক মাদায় দুইটী করিয়া বপন করিতে হইবে। যদি উক্ত সময়ের মধ্যে অঙ্কুরিত না হইয়া থাকে তাহা হইলে বীজের অবস্থা বুঝিয়া পুনরায় ২।১ দিনের জন্য পুতিয়া রাখা উচিত। এই উপায়টী আমার পূর্ব্বে জানা ছিল না। মুরসিদাবাদস্থ রৈইসবাগের প্রাচীন সর্দ্দার মালী দুঃখু শেখের নিকট আমি ইহা দেখি ও শিখি। কয়েক বৎসর হইল বেচারী ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছে। যাহা হউক; মাটি হইতে বীজ উঠাইয়া যদি দেখা যায় যে, উহাদিগের অঙ্কুরোদ্গম হইয়াছে, তাহা হইলে আর কাল বিলম্ব না করিয়া অবিলম্বেই প্রতি মাদায় ২-টী করিয়া বীজ পুতিয়া দিবে। বিলম্ব করিলে অঙ্কুর শুকাইয়া যাইতে পারে।

আমুনের বীজ হইতে যথাসময়ে চারা উৎপন্ন করিয়া জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ ভাগে বা আষাঢ় মাসের প্রথমভাগে বৃষ্টি হইলেই চারাগুলি যথাযোগ্য স্থানে পতিয়া দিবে এবং উপরে মাচা বাঁধিয়া দিবে। বর্ষাকালে গাছের গোড়ার মাদা মাটি দিয়া পূর্ণ করিয়া দেওয়া উচিত,—অধিক মাটি দিয়া উচ্চ করিয়া দিতে পারিলে ভাল হয়। এরূপ না করিলে গাছের গোড়ায় জল সঞ্চিত হয় ফলতঃ গাছ রুগ্ন হইয়া যায়। গাছের গোড়ায় পোড়ামাটি দিতে পারিলে ভাল হয়। লাউ গাছের পক্ষে পুষ্করিণীর মাটি ও খুব ভাল সার।

পুষ্করিণীর সন্নিকটে লাউ গাছ জন্মিয়া থাকিলে কিম্বা রোপিত হইয়া থাকিলে পুষ্করিণীর উপর মাচান করিয়া দিবে। জলের বাতাসে গাছ ভাল থাকে এবং জলেব উপরে যে ফল হয়, তাহা অপেক্ষাকৃত বড ও দীর্ঘ হইয়া থাকে। মুরসিদাবাদে মদীয় বন্ধু শ্রীযুক্ত মহেশনারায়ণ রায়ের বাগানে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাহা দেখিয়াছি। পুষ্করিণীর উপর মাচানে যে গাছ প্রসারিত হয়, তাহাতে দেড় হাত লম্বা ও তদপযুক্ত পবিধি-বিশিষ্ট ফল হইত অথচ সেই বীজজাত ফল অপর স্থানে তত বড় হইত না।

শীতের লাউ গাছে কার্ত্তিক মাস হইতে ফল ধরিতে আরম্ভ হয় এবং মাঘ মাস পর্য্যন্ত ফলিতে থাকে। তৎপরে যে ফল হয় তাহা গবাদি পশুতে খাইয়া থাকে। লাউ ও কলাই একত্রে সিদ্ধ করিয়া জাব্ দিলে গাভী খুব দুগ্ধবতী হইয়া থাকে।

আউসে লাউয়ের বীজ পৌষ-মাঘ মাসে ক্ষেত্রে মাদা করিয়া যথা-নিয়মে বপন করিবে এবং মাচা করিয়া তাহাতে গাছ উঠাইয়া দিবে কিম্বা ভূমিতে প্রসারিত হইতে দিবে।

প্রায় ১৫।১৬ বৎসর গত হইল আমার কলিকাতাস্থ ভবনে একটী লাউ গাছ জন্মে। উক্ত গাছটীকে আমি বড় যত্ন করিতাম এবং কয়েকটী বিষয় পরীক্ষা করিবার জন্য তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছিলাম। গাছটীকে বিচালী নির্ম্মিত রজ্জু দ্বারা দ্বিতলের ছাদে উঠাইয়া দিয়াছিলাম। ভূমি হইতে ছাদ পর্য্যন্ত মূল কাণ্ডে যত ফেঁকড়ি উদ্গত হইত, তাহাদিগকে কাটিয়া লইতাম। এইপ্রকারে অল্পদিন মধ্যে সমগ্র ছাদ গাছে ভরিয়া গেল এবং কার্ত্তিক মাস হইতে ফল দেখা দিল। বলিয়া রাখি, ছাদে গাছটী পৌঁছিলে মধ্যে মধ্যে ১৫।২০ দিন ব্যবধানে গাছের গোড়ায় সর্ষপ খৈল ও রক্ত বিগলিত তরল সার একত্রে মিশাইয়া দেওয়া হইত। উক্ত উপায়

অবলম্বন করায় গাছটী এত ফল প্রদান করিয়াছিল যে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তন্নিবন্ধন নূতন ফেঁকড়িও যথেষ্ট বাহির হইত কিন্তু সেগুলি ভাঙ্গিয়া লওয়া হইত নতুবা ফলনের পক্ষে ব্যাঘাত ঘটিত। উক্ত উপায় দ্বারা অপরাপর গাছও ফলন্ত করিতে পারা যায়। ফল বেশী বড় হইতে দিলে ফলের সংখ্যা তত অধিক হয় না, সুতরাং কচি থাকিতে ফল সংগ্রহ করিলে ভাল হয়। কচি লাউ অতি উপাদেয় তরকারী।

সুপক্ক লাউয়ের খোলে কমণ্ডলু ও তম্বুরার খোল প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। তাহা ব্যতীত অন্য অনেক কাজে আসিতে পারে। সুতরাং নষ্ট না করিয়া যত্নসহকারে বীজ বাহির করিয়া লইয়া শুষ্ক করতঃ রাখিয়া দেওয়া উচিত।

লাউ আহারকালে মুখপ্রিয় ও শীতল, কিন্তু গুরুপাক, এজন্য অধিক খাওয়া ভাল নহে।

ভুট্টা (Indian Corn or Maize)

খাস বাঙ্গালাদেশে সমধিক পরিমাণে ভুট্টার চাষ হইতে দেখা যায় না কিন্তু সাঁওতাল পরগণা হইতে আরম্ভ করিয়া যতই উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে যাওয়া যায় ততই ভুট্টার আবাদ বেশী দেখা যায়। তথায় ইহা একটী কৃষির ফসল মধ্যে পরিগণিত। নিম্নবঙ্গ লোকে সখ করিয়া বাগানে কয়েকটী গাছ রোপণ করেন মাত্র। সুতরাং বাঙ্গালীর ইহা সখের ফসল। হিন্দুস্থানী কৃষকগণ বাঙ্গালাতে অল্পাধিক ভুট্টার আবাদ করিয়া থাকে।

ভুট্টা বারমাসই জন্মাইতে পারা যায় কিন্তু ইহার প্রকৃত আবাদের সময়,—বর্ষাকাল। বীজ বপনের দিন হইতে দুই মাস মধ্যেই ভুট্টা ব্যবহারোপযোগী হইয়া থাকে। ইহার জন্য বারমেসে জমি হওয়া আবশ্যক।

বর্ষাকালে যে ভূমিতে জল দাঁড়ায়, সেখানে বর্ষাকালে ভুট্টা হইতে পারে না। অপর সময়ে নাবাল জমিতে আবাদ করিতে পারা যায়।

ভুট্টার বীজ বপন করিতে হয়,—জ্যৈষ্ঠমাসে। বৈশাখ মাসের শেষভাগে জমি উত্তমরূপে লাঙ্গল ও মই দ্বারা তৈয়ার করিতে হয়। কিন্তু এ সময় মাটি এত কঠিন হইয়া থাকে যে, তাহাতে লাঙ্গলের ফাল প্রবিষ্ট হয় না এবং বলদেও হাল টানিতে পারে না। মাটি কঠিন থাকিলে তাহাতে একবার ছেঁচ দিয়া মাটি ভিজাইয়া, 'যো' হইলে তবে লাঙ্গল দেওয়া উচিত। জমি চষিবার পরে তাহাতে এক হাত অন্তর বীজ দিয়া পার্শ্বস্থিত মাটী চাপা দিবে। ৬।৭ দিন মধ্যে বীজ অঙ্কুরিত হয়। এক্ষণ হইতে ১০।১২ দিন অন্তর একবার ছেঁচ দিতে হইবে এবং নিড়ান দ্বারা তৃণাদি পরিষ্কার করিয়া দিবে। ছিটান বুনানীতে জলসেচন করা চলে না। মধ্যে মধ্যে বারিপাত হইলে জলসেচনের প্রয়োজন নাই।

ভুট্টা গাছের প্রত্যেক পত্রগ্রন্থিতে মোচা ধরিয়া থাকে এবং সেই মোচায় যে দানা থাকে তাহাই ভুট্টার শস্য। দেশী ভুট্টা এত নিকৃষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, গাছে প্রায় একটির অধিক মোচা জন্মে না। তাহা ব্যতীত মামুলী রীতিতে আবাদিত হয় বলিয়া গাছ শীর্ণ হয়। একেই ভুট্টা অতি বুভুক্ষু ফসল, যেমন অধিক রস আহরণ করে, তেম্নি সার রাশি রাশি পরিশোষণ করিয়া জমিকে নিস্তেজ করিয়া দেয়, তবে বর্ষায় আবাদ হয় বলিয়া তাহার রসাভাব হয় না কিন্তু মাটি খুব সারাল হওয়া প্রয়োজন। কৃষকেরা সার দিতে পারে না কাজেই তাহারা অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে বাধ্য হয়। সব্জীবাগের মধ্যে ইহার আবাদ করিতে হইলে, কৃষকের পথ অবলম্বন না করিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আবাদ করিতে হইবে। তদর্থে ক্ষেত্র উত্তমরূপে কর্ষণ এবং মাটি চূর্ণ করিয়া যথাসাধ্য সার,—গোবর-সার ও উদ্ভিজ্জ ভস্ম দিয়া জমি তৈয়ার,

শ্রেণীবদ্ধভাবে বীজ বপন, প্রয়োজন মত জলসেচন ইত্যাদি নিয়মিতরূপে করিতে হইবে—তবেই আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়।

শৃগাল ইহার পরম শত্রু। রাত্রিকালে ইহারা দলে দলে আসিয়া ভুট্টার গাছ ভাঙ্গিয়া ফল খাইয়া পলায়ন করে। এ জন্য ভুট্টা-ক্ষেত্র সর্ব্বদা—বিশেষতঃ রাত্রিকালে—রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

ভুট্টার বীজ প্রতিমাসে বা মাসে দুইবার বপন করা যাইতে পারে। আষাঢ় মাস হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত বীজ বপন করিতে হইলে ক্ষেত্রে জলসেচন করিতে হয় না। দেশী অপেক্ষা হিন্দুস্থানী বীজ অনেক কারণে শ্রেষ্ঠ। আমাদের মতে শেষোক্ত বীজই বপনযোগ্য। তবে কথা এই যে বিলাতী আনীত-বীজ (Imported Seed) অপেক্ষা এদেশে উক্ত বীজজাত গাছে যে বীজ জন্মে তাহা বিশেষ ফলন্ত হয়। সুতরাং প্রতিষ্ঠিত-বীজ (accelimatised seed) বপন করা উচিত। সদ্য আনীত-বীজ জাত গাছ খুব তেজাল হয় এবং প্রত্যেক গাছে ৩।৪টী মোচা ও জন্মে, কিন্তু মোচার অধিকাংশ কোষ ফোক্‌লা বা নির্ব্বীজ হয়। এই কারণে অল্প বিলাতী অপেক্ষা প্রতিষ্ঠিত বিলাতী বীজ বিশেষ স্পৃহনীয়।

কেবলই বিলাতী বীজের উপর নির্ভর না করিয়া কিছু দেশী ভুট্টার বীজ লইয়া আবাদ করিলে ভাল হয়। প্রকৃষ্ট প্রণালীতে দেশী বীজের আবাদ হইলে ফলনে ও ফসলে ৩।৪ বংশ পরে উৎকৃষ্ট ভুট্টা উৎপন্ন হয়।

মার্কিনের যে কয়েকপ্রকার বীজ আমাদের ভাল বোধ হইয়াছে, নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া গেল। পাঠক ইচ্ছা করিলে পরীক্ষা করিতে পারেন।

আর্লি ম্যামথ, এভারগ্রিন, সুগার-কর্ন, ক্রসবি, মিনসোটা, একষ্ট্রা-

আর্লী-এডামস, কেম্বিন-হোম, কাণ্টি জেণ্টল্ম্যান, ইয়োলোপেন্‌সিল্‌ভেনিয়া ইত্যাদি ।

উপরোক্ত কয়েকটীর মধ্যে সুগার-কর্ণ ও কণ্টাজেণ্টেল্ম্যান্ এই দুই প্রকার গাছের প্রত্যেক গ্রন্থিতে ২।৩টী, সময়ে চারিটী মোচা ধরিয়া থাকে। প্রতিষ্ঠিত-মার্কিন-বীজের গাছে মোচা অধিক হয় এবং দানাও বড় হয়। অতি সারাল জমিতে ভুট্টার গাছ নিতান্ত তেজাল হইয়া উঠে, ফলতঃ আশানুরূপ ফলন হয় না। গাছ অতিশয় তেজাল হইয়া উঠিলে কাণ্ডের উপরার্দ্ধ ভাগ কাটিয়া ফেলা উচিত কারণ তাহা হইলে যথাযোগ্য ফলন হইয়া থাকে। ঈদৃশ তেজাল গাছের মূলদেশ ও কাণ্ড হইতে অনেক ফেঁকড়ি. উদ্গত হয়, ফলতঃ মূল গাছের উৎপাদিকাশক্তি খর্ব্ব হয়। গাছের গোড়া বা গাত্র হইতে এইরূপ ফেকৃড়ি জন্মিলে ভাঙ্গিয়া দেওয়া উচিত।

বীজ সুপক্ক হইলে কোন জাতির বর্ণ কাঁচা-সোণার ন্যায়, কোন জাতীর বা লাল রং হয়, আবার কোন জাতীর সাদা রং হয়। পাকা ফলগুলি মোচা সমেত উঠাইয়া, বীজের অন্ত শুষ্ক গৃহে টাঙ্গাইয়া রাখিয়া দিবে। ভূমিতে বা চাতালে কিম্বা ঠাণ্ডা স্থানে পড়িয়া থাকিলে বীজ নষ্ট হইয়া যায়।

লঙ্কা (Chilli or Pepper)

লঙ্কা নিজে তরকারী না হইলেও অধিকাংশই ব্যঞ্জনেই যে ইহার আবশ্যক হইয়া থাকে, সে বিষয়ে সংশয় নাই। লঙ্কার গুণ তীব্রতা। ঝাল না দিলে বহু ব্যঞ্জনই সুস্বাদ হয় না।

পশ্চিম বঙ্গে, বোধ হয় লবণতাহেতু, ততটা ঝাল ব্যবহারের প্রয়োজন

হয় না কিন্তু ২৪-পরগণা, হাওড়া, হুগলী অতিক্রম করিলে লঙ্কা ঝালের ব্যবহার সমধিক দেখা যায়।

পূর্ব্ববঙ্গে ইহার যথেষ্ট আবাদ হয় এবং তথাকার চাষীগণ ইহার চাষে যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকে।

লঙ্কা চাষের জন্ম মাঠান ও উচ্চ জমির আবশ্যক। উন্মুক্ত ও রোদ-পিঠে জমিতে লঙ্কা ভাল জন্মে।

বৈশাখ মাসে ঈষচ্ছায়াবিশিষ্টস্থানে হাপোর করিয়া বীজ বপন করিবে। অতঃপর বিচালী দ্বারা ঢাকিয়া দিলে ভাল হয়। এইরূপে ২।৩ দিন চাপা থাকিলে বীজগুলি অপেক্ষাকৃত শীঘ্র অঙ্কুরিত হয়। সময়ে সময়ে আবশ্যক মত জলসেচন করিবে। ৬।৭ দিনের মধ্যে ছারা দেখা যায়। তখন মধ্যে মধ্যে শলাকা দ্বারা মাটি উস্‌কাইয়া, এবং গাছের ঘনতা ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে চারাদিগকে স্থায়ীরূপে ক্ষেত্রে বসাইতে হইবে।

ইতিপূর্ব্বেই মাটি তৈয়ার করিয়া রাখিতে হইবে। দেড় হাত অন্তর শ্রেণীর মধ্যে দুই হাত অন্তর, এক-একটী চারা রোপণ করিতে হইবে। এই সময়ে যথেষ্ট বর্ষা থাকে সুতরাং ক্ষেত্রে জল দিবার প্রয়োজন হয় না, তবে চারা বসাইবার পরে যদি বৃষ্টির অভাব হয়, তাহা হইলে গাছে জল দিতে হইবে। মাটি কঠিন হইয়া গেলে জমি কোপাইয়া মাটি ভাজিয়া দেওয়া আবশ্যক। গাছে ফল দেখা গেলে গাছের গোড়ায় বিট লবণ দিলে ফল বড় হয় এবং ফল অধিক হয়। গাছের গোড়ায় লবণ দিবার পর বৃষ্টির সম্ভাবনা না থাকিলে ক্ষেত্রে জলসেচন করা উচিত, কারণ তাহা হইলে লবণ অচিরে গলিয়া গিয়া গাছের আহরণোপযোগী হইয়া থাকে। বিঘা প্রতি দশ সের লবণ লাগে। লবণের সহিত সমভাবে মাটি মিশাইয়া লওয়া উচিত।

লঙ্কায় আবাদে জমি শীঘ্র নিস্তেজ হইয়া পড়ে, অতএব এক জমিতে বারংবার ইহার আবাদ করা উচিত নহে কিন্তু যদি করিতে হয়, তাহা হইলে জমিতে উত্তমরূপে সার দিতে হইবে। খোঁয়াড় ও গোয়ালবাড়ীর আবর্জ্জনা লঙ্কার পক্ষে উত্তম সার।

বাঙ্গলা দেশে অনেক প্রকার লঙ্কা জন্মে, কিন্তু তাহার নাম না থাকায় স্বতন্ত্ররূপে নির্দ্দেশ করা কঠিন। 'ধানী' নামক এক জাতীয় লঙ্কা আছে তাহা ধান্তের ন্যায় ক্ষুদ্র, কিন্তু অপরিমিত ঝাল। ঝালের জন্যই লঙ্কার ব্যবহার।

এক জাতীয় লঙ্কা ফলনকালে উর্দ্ধমুখ থাকে, এই জন্ত ইহা সূর্য্যমুখী লঙ্কানামে অভিহিত। ইহা তীব্র ঝাল। ঝাল ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা থাকিলেও কোন কোন দেশে অপরিমিত লঙ্কা ব্যবহৃত হয়। পূর্ব্ববঙ্গে প্রচুর লঙ্কা ব্যবহৃত হয়, কিন্তু সে ব্যবহারের সাফল্য আছে কারণ তথাকার রন্ধন প্রণালীর বিশেষত্ব হেতু সেই উৎকট ঝাল ব্যঞ্জন, চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে গলাধঃকরণ করা চলে, কিন্তু দাক্ষিণাত্যে যে ঝাল ব্যবহৃত হয় তাহার পরিমাণ বা উপমা নাই, উপরন্তু সে দেশের লোক রন্ধনবিদ্যাকুশল নহে, নানাপ্রকার ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতে জানে না, রাশি রাশি লঙ্কা উদরস্থ করিয়াই সে দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা পরিতৃপ্ত। লঙ্কা ভক্ষণ সম্বন্ধে মহীশূর ও মান্দ্রাজ চিরদিন মনে থাকিবে।

ইংলণ্ড ও আমেরিক হইতে নানা জাতীয় সুঠাম লঙ্কার বীজ প্রতি বৎসর এদেশে আমদানী হয়। ইহার গাছগুলি এক বা দেড় ফুটের অধিক উচ্চ হয় না। উক্ত লঙ্কার ফলগুলি দেড়-ইঞ্চ হইতে তিন ইঞ্চ লম্বা হয় এবং চারি পাঁচ ইঞ্চ পরিধিবিশিষ্ট হয়, কিন্তু তাদৃশ ঝাল হয়। অধিক কি, তাহার কয়েকটি জাতিতে আদৌ ঝাল নাই বরং অতিশয় মিষ্ট। ইহার বীজ শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে গামলায় বপন করিতে হয়। চারা উদ্গত

হইয়া চারি অঙ্গুলি উচ্চ হইলে ওটিতে এক হাত অন্তর রোপন করিতে হয়। পৌষ-মাঘ মাসে গাছে ফল ধরে। ফল পাকিয়া উঠিলে গাছের শোভা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ব্যবহার অপেক্ষা সৌন্দর্য্যের অনেকে ইহা রোপণ করেন। অনেকে আবার টবে গাছ পুতিয়া রাখেন। ছোট টবে ছোট গাছে বড় বড় সুরঞ্জিত ফল দেখিবার জিনিষ বটে।

সেলেরি (Celary)

চাষীগণ ইহাকে সিলুড়ী কহিয়া থাকে। উত্তমরূপে পাট ও তদ্বির না করিলে সেলেরি ভাল উৎপন্ন হয় না। পুরা তেজে যখন ইহা বাড়িতে থাকে, তখন কিঞ্চিম্মাত্রও বাধা পাইলে ইহার স্বাদ খারাপ হয়। শ্রাবণ মাসের প্রথম ভাগে গামলায় বীজ বপন করিতে হয়। বীজ অঙ্কুরিত হইতে ২।৫ সপ্তাহ পর্য্যন্ত সময় লাগে। চারাগুলি এক ইঞ্চ পরিমাণ বড় হইলে গামলা হইতে তুলিয়া ভাঁটিতে রোপ করিবে। ভাদ্র মাসে দ্বিতীয়বার বীজ বপন করিবে। এই সময়ের রোপিত বীজ অঙ্কুরিত হইতে পূর্ব্বের ন্যায় অধিক সময় লাগে না এবং চারা জন্মে তাহাও অতি শীঘ্র বাড়িয়া থাকে, অধিক কি, ইহার ফসল পূর্ব্বরোপিত বীজের ফসল হইতে ১৫।২০ দিন পশ্চাতে থাকে মাত্র। চারাগুলি যখন ৭।৮ অঙ্গুলি দীর্ঘ হইবে, তখন তাহাদিগকে জুলির মধ্যে পুতিয়া দিতে হইবে। ক্ষেত্র মধ্যে চারি ফুট ব্যবধানে এক ফুট গভীর ও আঠার ইঞ্চ চওড়া করিয়া জুলি প্রস্তুত করিতে হইবে। জুলির মাটি অন্যত্র না ফেলিয়া তাহার পার্শ্বেই জমা করিয়া রাখিলে পরে কাজ আসিবে। এই জুলি মধ্যে পুরাতন গোয়াল-বাড়ীর অথবা আস্তাবলের আবর্জ্জনা দিতে হইবে। উপরোক্ত সারের মধ্যে কোন

পোকা-মাকড় না থাকে তাহা দেখা উচিত। জুলিগুলিকে উক্ত সার দ্বারা ৮।৯-ইঞ্চ পূর্ণ করিয়া ৯-ইঞ্চ অন্তর এক-একটি চারা পুতিয়া দিবে এবং যথানিয়মে তাহাতে জলসেচন করিবে। সময়ে সময়ে তাহার গোড়া নিড়েন দ্বারা পরিষ্কার ও আল্‌গা করিয়া দেওয়া উচিত।

গাছগুলি যখন এক ফুট উচ্চ হইবে কিম্বা পূর্ণাবস্থার সন্নিকটে হইবে, তখন তাহার গোড়ায় মাটি উচ্চ করিয়া দিবে কিন্তু গোড়ায় মাটি দিবার পূর্ব্বে যাবতীয় শুষ্ক ও ছোট পাতা কাটিয়া ফেলিয়া গাছের গোড়ায় এরূপভাবে মাটি দিতে হইবে যে, কেবল গাছের পত্রাংশ মাত্র দেখা যায়। অবশিষ্ট সমুদায় নিম্নাংশ ঢাকা থাকা আবশ্যক। গোড়া অনাবৃত থাকিলে উপরিভাগ বিবর্ণ ও শক্ত হইয়া যায়। অনেকে আবার গাছের গোড়ায় বাঁশের খোলা বা কলা-বস্‌না দিয়া থাকেন। যে কোন উপায়েই হউক, গাছের গোড়া ঢাকিয়া দিতে হইবে। এইরূপে ১৫।২০ দিবস ঢাকা থাকিলে আবৃতাংশ শুভ্র ও কোমল হয় এবং তখনই ব্যবহারের উপযোগী হয়। সেলেরিতে উত্তম সালাদ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

আমাদা (Mango-ginger)

ইহা আর্দ্রকের জাতিবিশেষে। গাছের আকার, প্রকৃতি এবং গেঁড়—অবিকল আর্দ্রকের ন্যায়। মূলে কাঁচা আম্রবৎ গন্ধ থাকায় ইহার নাম আমাদা হইয়াছে। ইংরাজীতে ইহাকে 'ম্যাঙ্গোজিঞ্জার' কহে। বৈজ্ঞানিক নাম Curcuma amada.

গেঁড় বা মুখী খণ্ড খণ্ড করিয়া রোপণ করিলে চারা জন্মে। সারবান জমিতে তিন ফুট চওড়া চৌকা করিয়া ফাল্গুন মাস হইতে বৈশাখ মাস মধ্যে উক্ত চৌকায় এক হাত অন্তর এক-এক খণ্ড গেঁড় পুতিয়া দিতে

হইবে। ১০।১২ দিন মধ্যে অঙ্কুর উদ্গত হয়। যাবৎ না বর্ষা আগত হয়, তাবৎ উহাতে মধ্যে মধ্যে জল সেচন করিতে হইবে। ঈষচ্ছায়াযুক্ত-স্থানে আমাদা ভাল জন্মে। তাহা বলিয়া গাছতলায় আবাদ করা উচিত নহে। শীতকালে গাছ মরিয়া যায়, তখন মূল উঠাইয়া লইতে হয় কিন্তু না উঠাইয়া পুনরায় পর বৎসর তাহাতেই গাছ জন্মে। তখন আবশ্যক-মত উঠাইয়া লইলেও চলে। অম্বল বা চাটনীতে ইহার রস দিলে আঘ্রাণ কাঁচা আম্রর ন্যায় হইয়া থাকে।

মেথি (Common fenu greek)

মেথির বৈজ্ঞানিক নাম Trigonell Fœnum Groecnm। মেথির ডগা ও কচিপাতা তরকারীরূপে ব্যবহৃত হয় এবং ইহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ ব্যঞ্জনাদির মসলা মধ্যে পরিগণিত। এদ্ব্যতীত ঔষধাদিতেও ব্যবহৃত হয়।

ছোট ছোট চৌকায় আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে বীজ পাতলা ভাবে ছড়াইয়া বপন করিতে হয়। চারা উপ্ত হইলে মধ্যে মধ্যে জলসেচন করা ও মাটি খুসিয়া দেওয়া ভিন্ন অপর কোন পাট নাই।

গাছগুলি অল্লাধিক বড় হইয়া উঠিলে মধ্যে মধ্যে ডগা কাটিয়া ব্যবহার করিতে পারা যায়।— বীজ করিবার জন্য স্বতন্ত্র গাছ থাকা উচিত। যে সকল গাছ হইতে ডগা কাটিয়া লওয়া হয় তাহাতে অধিক দানা কিম্বা ভাল দানা জন্মে না—স্মরণ রাখা উচিত।

ধন্যা বা ধনিয়া (Coriander)

পানে ও রন্ধনকার্য্যে যে ধনে মসলারূপে ব্যবহৃত হয়, ইহা তাহাই। ইহার শাকে অতি সুগন্ধ থাকায় অনেক তরকারীতে নিয়োজিত হইয়া থাকে।

উদ্যানের সাধারণ জমিতে পটি করিয়া তন্মধ্যে বীজ বুনিতে হয়। কার্ত্তিক মাসে বীজ বপন করিতে হয়। যাবৎ গাছ না জন্মে তাবৎকাল আবশ্যকমত জল সেচন করিতে হইবে। গাছ জন্মিলে ২।৪ দিবস অন্তর প্রচুর পরিমাণে জল দেওয়া আবশ্যক। গাছগুলি ৫।৬ ইঞ্চ উচ্চ হইলেই কাটিয়া লইবে। এরূপ যতবার কাটিবে ততবারই উহা গজাইবে। গাছ একেবারে উপড়াইয়া লইবে না, কেন না, তাহা হইলে উহার আর গজাইবার উপায় থাকে না। ধনের দানা জন্মাইতে হইলে গাছ কাটিবে না। ফাল্গুন মাসে দানা সংগ্রহ করিতে হয়।

পুদিনা (Mint)

পুদিনার পাতায় অতি সুগন্ধ। ইহাতে সুন্দর চাঠ্নী তৈয়ার হয় এবং অন্যান্য তরকারীতে দিলে তাহাও অতি সুগন্ধবিশিষ্ট হইয়া থাকে। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম—mentha viridis.

যে জমিতে কিছু এঁটেল-মাটির ভাগ অধিক, তাহাতে পুদিনা ভাল জন্মে। আষাঢ় মাসে পটি মধ্যে ইহার ডগা বা শিকড় কাটিয়া পুতিয়া দিলে ৮।১০ দিনের মধ্যে শিকড় জন্মে। পটি অতি ঘন না হয়, এজন্য এক ফুট অন্তর শ্রেণী মধ্যে ছয় ইঞ্চ অন্তর ডগা বসাইতে হয়। গ্রীষ্মকালে প্রতিদিন এবং শীতকালে সপ্তাহে দুই দিন জল দিতে হয়। যেখানে রোপণের জন্য ডগা বা মূল পাইবার পক্ষে অসুবিধা, তথায় বীজ বপন

করিতে হইবে। আশ্বিন মাসে পটিতে বীজ বপন করিলেই চলিবে। পুদিনা একবার জন্মিলে একস্থানে বহুদিন থাকে কিন্তু প্রতিবৎসর স্থানান্তর করিয়া দিলে ভাল হয়, কিম্বা পুরাতন পটির জঙ্গলাদি পরিষ্কার করিয়া উত্তমরূপে নূতন মাটি ও সার দিলে চলে। ইহাপেক্ষা নূতন পটি করিয়া দেওয়া সহজ বলিয়া আমাদিগের মনে হয়। পাতা শুষ্ক করিয়া রাখিয়া দিলেও অনেক কাজে লাগে।

পিপারমেণ্ট (Peppermint)

পিপারমেণ্টের গাছগুলি পুদিনার ন্যায় ছোট ছোট। ইহার তদ্বির সবই পুদিনার ন্যায়। আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে বীজ বপন করিতে হয়, কিম্বা ডগা কাটিয়া ছোট চৌকা বা পটিতে ছয় ইঞ্চ অন্তর রোপণ করিতে হয়। বৈকালের রৌদ্র না লাগে এরূপ স্থান হইলেই ভাল হয়। চৌকায় প্রায়ই জলসেচন করা আবশ্যক এবং মধ্যে মধ্যে কিম্বা প্রতিবার ডগা সংগ্রহ করিবার পরে, চৌকায় অল্প সার ছড়াইয়া দিতে হয়। বলা বাহুল্য, মধ্যে মধ্যে নিড়াইয়া ঘাস-মুথা বাছিয়া ফেলা আবশ্যক, নতুবা তৃণাদি জন্মিয়া গাছগুলিকে ঢাকিয়া ফেলে, ক্রমে মারিয়া ফেলে। একখণ্ড চারি হাত চওড়া ও আট হাত লম্বা পটি থাকিলে, একটী গৃহস্থের উপযোগী পিপারমেণ্ট বারমাস পাওয়া যাইতে পারে।

আষাঢ় মাস হইতে আশ্বিনের শেষ পর্য্যন্ত প্রতি মাসে একবার করিয়া ডগা কাটিতে পারা যায়। পরে দুই মাস অন্তর ডগা পাওয়া যাইবে। ডগা মাটিতে সংলগ্ন হইয়া থাকিলে আপনা হইতে উহার গ্রন্থিতে শিকড় জন্মে এবং সেই শিকড় সংযুক্ত ডগা জমিতে রোপণ করিলে অতি শীঘ্র চারা জন্মে। সর্ব্বদা ডগার আবশ্যক না থাকিলে কর্ত্তিত ডগা ছায়ায় শুষ্ক

করতঃ কাগজের মোড়কে রাখিলে ভবিষ্যতে ব্যবহার করা চলে। পিপারমিণ্টের পত্র জলে সিদ্ধ করতঃ চুয়াইলে মনোহর পিপারমেণ্ট সার বা নির্যাস বাহির হয়। উক্ত সার বা নির্য্যাস এবং ইহার গাছ অনেক অসুখের সময় কাজে লাগে। ইহা একটি মসলার মধ্যে গণ্য, সুতরাং চাট্নী প্রভৃতিতে পুদিনার ন্যায় ব্যবহার করা চলে। টব বা গামলায়ও ইহার সংক্ষিপ্ত আবাদ হইতে পারে।

টাইম (Thyme)

সাহেবদিগের ব্যবহার্য্য একপ্রকার শাক। তাহা ব্যতীত মশলার জন্যও টাইমের আবাদ হইয়া থাকে। ইহার কোমল পত্র ও ডগা শাকরূপে, কিম্বা ব্যঞ্জনাদি সুগন্ধ করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

ভাদ্র-আশ্বিন মাসে হাপোরে বীজ হইতে চারা উৎপন্ন করিতে হয়। চারাগুলি স্থানান্তরিত হইবার যোগ্য হইয়া উঠিলে অনতিগভীর জুলির মধ্যে এক হাত হইতে দেড় হাত অন্তর এক-একটী চারা রোপণ করিয়া যথারীতি পালন করিতে হয়। মাটি খুব সারাল হওয়া প্রয়োজন। মাটী সর্ব্বদা ঈষৎ রসা থাকে ইহা টাইমের পক্ষে বিশেষ স্পৃহনীয়!

গাছগুলি ৮৷১০ অঙ্গুলি উচ্চ হইয়া উঠিলে গোড়া ঘেঁসিয়া কাটিয়া লইতে হয়। গাছগুলি কর্ত্তিত হইবার পরে জুলির মাটি উস্কাইয়া চূর্ণ করিয়া দিতে হয়। এইরূপে সম্বৎসর মধ্যে ৩৷৪ বার কাটিতে পারা যায়। কর্ত্তিত গুল্ম শুকাইয়া রাখিতে হয়। বিস্তৃত আবাদ করিলে লাভবান হওয়া যায়।

দ্বাদশ অধ্যায়

নটে-শাক (Amaranthus)

নটে-শাকের কতকগুলি জাতি আছে, তন্মধ্যে চাঁপা-নটে, কন্‌কা-নটে ও পদ্ম-নটে প্রধান। ইহাদিগের কচি পাতা ও ডগা অতি উপাদেয় সামগ্রী। বারমাসই ইহা জন্মিয়া থাকে কিন্তু বর্ষা ও শীতকালে যাহা জন্মে তাহাই উৎকৃষ্ট।

ইহার জন্য জমি খুব সারবান ও রসাল হওয়া আবশ্যক। জমি সারবান ও রসাল হইলে গাছ খুব শীঘ্র বাড়িয়া উঠে। গাছ শীঘ্র শীঘ্র বাড়িলে অতি কোমল হইয়া থাকে। এইজন্য ইহার জমিতে যথেষ্ট পরিমাণে গোয়ালের আবর্জ্জনা দিতে হইবে। বেলে বা দোঁ-আঁশ মাটি অপেক্ষা মাটি ঈষৎ এঁটেল হইলে নটে শাকের পক্ষে ভাল হয়। বেলে বা তজ্জাতীয় মাটি শীত ও গ্রীষ্মকালে শীঘ্রই নীরস হইয়া পড়ে সুতরাং তাহাতে সর্ব্বদাই জলসেচনের আবশ্যক হয়। উপরন্তু এরূপ মাটির শাকের স্বাদ ভাল হয় না।

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে জমি উত্তমরূপে প্রস্তুত করিয়া পটিতে পাতলা করিয়া বীজ বপন করিতে হয়। মাটি সরস না থাকিলে প্রতিদিন জলসেচন করিবে। চারা ঘনভাবে জন্মিয়া অল্পাধিক চারা পটি হইতে তুলিয়া লইবে। প্রত্যেক গাছের জন্য চারিদিকে অন্ততঃ ৫।৬ ইঞ্চ এবং অপর জাতির জন্য এক ফুট স্থান থাকা আবশ্যক। চারা বাহির হইলে সপ্তাহে দুই-তিন দিন পটিতে উত্তমরূপে জলসেচন করিবে এবং মাটিতে যো পাইলে নিড়ান করিয়া দিবে। পটি মধ্যে তৃণাদি জন্মিলে শাক বাড়িতে পারে না।

বীজ অঙ্কুরিত হইবার ৫।৬ সপ্তাহ মধ্যে শাক কাটিতে পারা যায়। ইহার গাছ একবারে না উপড়াইয়া গোড়ায় ২।৩ অঙ্গুলি রাখিয়া উপরিভাগ কাটিয়া লইবে। এইরূপ যতবার কাটিয়া লইবে ততবার নূতন ফেঁকড়ি বাহির হইবে। অধিক দিবস না কাটিলে শাক শক্ত হইয়া যায় ফলতঃ ভক্ষণে তত আরাম পাওয়া যায় না। দুই তিনবার কাটিবার পরে তরল-গোবর-সার কিম্বা খৈল-পচা জল দিতে পারিলে ভাল হয়। শাক কাটিয়া লইবার পরে জলাভাব হইলে গাছ শুষ্ক ও শীর্ণ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। অতএব, জমি যাহাতে সর্ব্বদা সরস থাকে তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। উল্লিখিত প্রণালীতে প্রতি মাসেই বীজ বপন করা যাইতে পারে এবং বারমাসই শাক খাওয়া চলিতে পারে। অন্যান্য নটে-শাকের আবাদ-প্রণালীও এইরূপ।

ডেঙ্গো (Amaranthus Lividus)

বর্ষাকালে ইহা একটী বিশেষ তরকারী বলিলেও চলে; ইহার কচি পাতা ও শাখা-প্রশাখা তরকারীতে ব্যবহৃত হয়। ডেঙ্গোর গাছ যত বড় হইতে থাকে ততই মিষ্ট হয় কিন্তু গাছ অধিক বড় হইলে, পাতা তাদৃশ কোমল থাকে না এবং শাখা-প্রশাখা শক্ত ও ছিবড়া-বিশিষ্ট বা তন্তুক হইয়া যায়। উচ্চ, উর্ব্বরা ও রসা ভূমিতে যে সকল ডেঙ্গো জন্মে তাহা প্রায় আড়াই বা তিন হাত উচ্চ হয় এবং একটী বড় গাছ কলিকাতার বাজারে দুই পয়সা বা ততোধিক মূল্যে বিক্রয় হয়। বর্ষাকালের ডেঙ্গো তাদৃশ মিষ্ট না হইয়া পান্‌সে হয় কিন্তু অপর সময়ের শাক সুমিষ্ট ও উপাদেয় হয়।

বিগত সন ১৩০২ সালে ভ্রমণোদ্দেশে বরিশাল গিয়া তথায় যেরূপ

সুদীর্ঘ ডেঙ্গো দেখিয়াছি কুত্রাপি তাদৃশ দেখি নাই। সেখানে গাছ গুলি সচরাচর পাটগাছের ন্যায় ৭।৮ হাত দীর্ঘ হয় কিন্তু আস্বাদ বড় পান্‌সে।

বেলে বা দো-আঁশ অপেক্ষা দুধে-এঁটেল মাটিতে ডেঙ্গো ভাল জন্মে। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাস বীজবপনের সময়। বুনিবার পূর্ব্বদিবস হাপোরে উত্তমরূপে জল দিয়া রাখিতে হয়। বপনের দিন মাটি উস্কাইয়া ঝুর করিয়া বীজ বপন করিবে। অতঃপর সমস্ত রাত্রি অনাবৃত রাখিয়া পরদিবস সকালে বিচালী, চেটাই বা দরমা দ্বারা হাপোর ঢাকিয়া দেওয়া এবং অপরাহ্ণে তাহা খুলিয়া দেওয়া আবশ্যক। ২।৩ দিন এইরূপ করিলে বীজ অঙ্কুরিত হইতে বিলম্ব হয় না। বপিতাবস্থায় হাপোর অনাবৃত থাকিলে বায়ুমণ্ডলের চাপে মাটি দৃঢ় হইয়া যায়, অতঃপর রৌদ্রোত্তাপে মাটি শুকাইয়া ও ফাটিয়া যায়। চড়াই পাখীতেও খাইয়া যায় এই সকল কারণে ক্ষুদ্র বীজ অঙ্কুরিত হইতে বিলম্ব ঘটে। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে ঈষৎছায়াযুক্ত স্থানে হাপোর করিয়া বীজ বপন করিবে। জলসেচন করিয়া হাপোর সর্ব্বদা ভিজা রাখিবে। ৪।৫ দিনের মধ্যে বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। বুঝিয়াই দুই বা তিন দিবস অন্তর উত্তমরূপে জলসেচন করিবে। ইতিমধ্যে যে পটিতে চারা বসাইতে হইবে তাহা কোপাইয়া ও মাটি চূর্ণ করিয়া এবং সার মিশ্রিত করিয়া রাখিতে হইবে। মাটিতে উত্তম-খৈল-ও গোবর-সার মিশাল করিতে হয়। তদনন্তর আষাঢ় মাসে ২।১ পসলা বৃষ্টি পড়িলে চারাগুলি উঠাইয়া পটিতে দেড়হাত অন্তর পুতিয়া দিবে এবং যাবৎ উত্তমরূপে বর্ষা আগত না হয়, তাবৎ মধ্যে মধ্যে জলসেচন করিবে। বর্ষারম্ভ হইলে আর জল দিবার আবশ্যক হয় না। গাছের গোড়ায় জল না দাঁড়ায়, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবে। গাছগুলি এক হাত উচ্চ হইলে ডগা কাটিয়া লইবে। এরূপ করিলে গাছ অধিক

লম্বা না হইয়া শাখাপ্রশাখা ও পত্রবিশিষ্ট হইয়া থাকে। গাছগুলি বেশ শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট এবং ঝাড়াল হইলে প্রয়োজনমত ক্ষেত্র হইতে তুলিয়া আনা এবং রন্ধন করিয়া ভোজন কর।

সুপক্ক ডেঙ্গোর গোড়া স্থূল, তন্তুদ বা ছিবড়েও শাঁসাল হয়। এই অবস্থায় ডাঁটা চর্ব্বনে আরাম পাওয়া যায়। যাঁহারা ডাঁটা চর্ব্বনকে বর্ব্বরতা বা বর্ব্বরতার জের মনে করেন তাঁহারা অন্য উপায়ে উহার সত্ব আস্বাদন করিতে পারেন। যথানিয়মে ডাঁটা সিদ্ধ করিয়া উহা হইতে শাঁস বাহির করিয়া একখণ্ড বস্ত্রে ছাঁকিলে উত্তম নির্য্যাস পাওয়া যায়। অতঃপর সেই কাতে ঈষৎ সর্ষপ তৈল, লবণ ও মরিচের গুড়া মিশাইলে উপাদেয় ভোজ্য হইয়া থাকে। উহার সহিত ২।৪ বিন্দু কাগজী লেবুর রস দিলে আরও রসনা তৃপ্তিকর হয়।

কাটোয়া অঞ্চলে এক প্রকার ডেঙ্গো জন্মে, তাহা স্বভাবতঃ খর্ব্ব কিন্তু ঝাড়াল হয়। উক্ত ডেঙ্গোর ডাঁটা খুব মিষ্ট ও শাঁসাল হয়। বৈশাখ মাসের মধ্যে সরস হাপোরে ইহার বীজ পাত দিয়া যথানিয়মে উৎপন্ন করিয়া, চারাগুলি স্থানান্তর করণযোগ্য বড় হইলে, ক্ষেতে বা পটিতে ১ বা ১॥ হাত ব্যবধানে সেগুলিকে যত্ন সহকারে রোপণ করিবে। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাস খরানী রদিন সুতরাং জমিতে যথেষ্ট জলসেচন করা উচিত।

লাল-শাক (Amaranthus gangetious)

লাল-শাক,—নানা জাতীয় নটে, ডেঙ্গো প্রভৃতির সমবর্গীয় উদ্ভিদ। লালশাক গাছগুলির প্রকৃতি ঈষৎ চেঙ্গা। রন্ধন করিলে উহা হইতে প্রচুর রং নির্গত হয় এবং ভক্ষণকালে হাতে রং লাগিয়া যায়। অতি মুখরোচক ও কোমল শাক বলিয়া সকলের প্রিয়।

যে সকল উদ্ভিদ হইতে শাক অর্থাৎ কচি পত্র, কাণ্ড প্রভৃতি ব্যবহার করিতে হয় তাহাদিগের আবাদের জন্য মাটি রসধারক, দোয়াঁশ ও সারাল হওয়া প্রয়োজন। ঈদৃশ মাটির গাছ অতি বৃদ্ধিশীল হয়, তাহার ফলে পত্রদণ্ডাদি অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার ও রসাল হয় এবং তাহার তন্তুতা কম হয়। অন্যথা গাছের বৃদ্ধি মন্থর হয়, তন্নিবন্ধন অনেক দিন জমিতে না থাকিতে পাইলে আহরণোপযোগী হয় না। এইরূপে দীর্ঘকাল বাহিরে থাকিবার ফলে উদ্ভিদের অবয়ব,—পত্র, ডগা প্রভৃতি শক্ত হইয়া যায়, সেই সঙ্গে কোমলতা আস্বাদও বিকার প্রাপ্ত হয়। এই সকল কারণে শাক জাতীয় উদ্ভিদের জন্য নির্দ্দিষ্ট জমিতে গোবর, খৈল, গবাদি পশুশালায় সঞ্চিত পুরাতন সার সমধিক পরিমাণে নিয়োজিত করা উচিত। কেবল তাহাই নহে। কোদাল দ্বারা ৮।১০ ইঞ্চ মাটির ভিতর পর্য্যন্ত কুদ্দালিত এবং উত্তমরূপে চূর্ণীত করিয়া উপরোক্ত সার প্রসারিত করতঃ মাটি ও সার উত্তমরূপে মিশাইয়া ফেলিতে হইবে।

ফাল্গুন-চৈত্র মাস হইতে আষাঢ় মাসের শেষ ভাগ পর্য্যন্ত বীজ বুনিতে পারা যায়। ফাল্গুন হইতে জ্যৈষ্ঠমাস্ পর্য্যন্ত সাধারণতঃ মাটি বড় নীরস থাকে সেইজন্য এ সময়ে বীজ বপন করিতে হইলে বপনের পূর্ব্বদিন বীজ পাতনের জন্য নির্দ্দিষ্ট পটিতে—আয়তন বুঝিয়া ২।৪ ঘড়া জলসেচন করিয়া রাখিলে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কুদ্দালিত সমগ্র মাটি সরস হইয়া উঠে।

লাল-শাকের বীজ অতি ক্ষুদ্র, চিক্কণ মসিবর্ণের এবং পিচ্ছিল। উহার বীজ সমভাবে বপন করা যায় না, এই জন্য বপনের পূর্ব্বে উহার সহিত ৫।৭ গুণ মাটি মিশাইলে বীজগুলি পাতলা হয় এবং এই অবস্থায় সেই বীজ-মিশ্রিত মাটি পাতে ছড়াইলে বীজ সকল ঘনভাবে পতিত না হইয়া ছড়াইয়া পড়ে, ফলতঃ অঙ্কুরিত হইলে স্থানাভাব হয় না।

অতঃপর পটির মাটিকে একবার বিচলিত করিয়া একখণ্ড তক্তা বা কাগজ দ্বারা চাপিয়া দিবার পর বীজগুলি ধীরে ধীরে পাতলাভাবে ছড়াইয়া দিয়া, পুনরায় তাহার উপর কাগজ প্রসারণ পূর্ব্বক তদুপরি হস্ত পরিচালনা করিতে হয়। এইরূপে আবরিত হইলে মৃত্তিকার স্ফীতি কমিয়া যায়, মাটি ও বীজ অল্পাধিক দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হয়, মাটির রস তন্মুহূর্ত্ত হইতেই বীজ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নিদ্রিত ভ্রূণের পুষ্টিসাধনে প্রবৃত্ত হয়। অতঃপর ঝুরা বা লঘু মাটি কিম্বা অনতিশুষ্ক পাতাসার বা গোবর-মাটি দ্বারা বীজ-তলা ঢাকিয়া দিতে হইবে। এক্ষণে আরও একবার পূর্ব্ববৎ কাগজ প্রসারণ পূর্ব্বক তদুপরি হস্তচালনা করিবে। ক্ষুদ্র বীজ বপনের ইহাই প্রকৃষ্ট উপায় এবং নিয়ম। এ সময়ে বীজরোপিত স্থানে সাক্ষাৎ সূর্য্যোত্তাপে এবং বৃষ্টির দাপটে ক্ষতি হয়,—বীজ অঙ্কুরিত হইতে বিলম্ব হয়, রসের অভাব হয় ইত্যাদি। কিন্তু যাহাতে সেরূপ ঘটিতে না পারে তদুদ্দেশ্যে পূর্ব্বাহ্নে বীজ-পাতের উপরে বিচালী প্রসারিত করিয়া দিতে হয়। এইরূপে বিচালী আবৃত রাখিলে মাটির রস ও উত্তাপের সমতা রক্ষিত হয় এবং যে উত্তাপ উৎপন্ন হয় তাহার অধিকাংশ যথাস্থানে থাকে, ফলতঃ অঙ্কুরোদ্গমের সুবিধা হয়।

তিন দিনের মধ্যে বীজ অঙ্কুরিত হইয়া ভূপৃষ্ঠোপরি কল্ উদ্গত হয়। এক্ষণে বিচালীর আবরণ অপসৃত করা আবশ্যক। অতঃপর অপরাহ্নে অতি সাবধানে জলসেচন করিতে হইবে। বারিপাতের দাপটে কোমল চারা আহত হইতে পারে এই জন্য জলসেচনে সতর্কতার প্রয়োজন। এক্ষণে যত্নের সহিত লালনপালন করিলে ২০।২২ দিনের মধ্যে চারাগুলি ২।৩ অঙ্গুলি উচ্চ হইয়া উঠিবে এবং বলসঞ্চয় করিবে। উক্ত ২০।২২ দিন কাল বীজ-তলায় থাকিলে মধ্যে মধ্যে উত্তমরূপে জলসেচন করিবে এবং মাটি বসিয়া গিয়াছে মনে হইলে বংশ-শলাকা দ্বারা মাটি খুঁড়িয়া দিতে

হইবে। খুঁড়িবার সময় চারাগাছের কোনরূপ অনিষ্ট না হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

চারাগুলি ৩।৪ অঙ্গুলি বড় হইয়া উঠিলে উত্তম সারাল পটীর মধ্যে এক হাত অন্তর সারিতে আধ হাত হইতে পৌনে ১-হাত ব্যবধানে চারা রোপণ করিতে হইবে। সূর্য্যাস্তকালই চারা রোপণের উত্তম সময়। এক্ষণ হইতে মধ্যে মধ্যে প্রচুর পরিমাণে বারিসেচন করিয়া সমগ্র মাটি উত্তমরূপে ভিজাইয়া দেওয়া উচিত। এইরূপে জলসেচন করিলে ১০।১৫ দিন অন্তর জলসেচন করিলে চলিতে পারে, নতুবা প্রতিদিন জলসেচন করিতে হয়। প্রথমোক্ত উপায়ই অবলম্বনীয়।

জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে প্রায় বৃষ্টি হইয়া থাকে সুতরাং এ সময়ে বীজবপন করিতে হইলে বীজ-পাত আবরিত হওয়া উচিত নতুবা বৃষ্টিতে বপিত বীজ এবং মাটি—উভয়ই বিচলিত হইতে পারে।

পূতিকা বা পুঁই (Malabar Nightshade)

আবাদী পূতিকার দুইটী জাতি আছে—লাল-পুঁই, ও সাদা বা হরিৎ-পুঁই। অন্য এক জাতীয় পুঁই যেখানে-সেখানে স্বতঃই জন্মে, তাহার নাম —বন-পুঁই এবং তাহা অব্যবহার্য্য। পুঁই,—গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালের লতা। বর্ষাকালের গাছ স্বভাবতঃ দীর্ঘ, তেজাল ও প্রসারিণী-লতা হইয়া থাকে। মাটি সারাল হইলে ডাঁটা, ডগা ও পাতা স্থূল, রসাল ও শাঁলাল হয়। এ সময়ের লতাদিগকে কুটিরের চালে, কোটার ছাদে কিম্বা মাচান বা বেড়ায় সংলগ্ন করিয়া দিলে বিস্তর শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট হইয়া সুবিস্তৃত লতা হয়। গ্রীষ্মকালের গাছে প্রচুর জল সেচন করা প্রয়োজন। উভয় সময়েই মাটি সারাল হওয়া উচিত। গৃহস্থালীর পুরাতন ওঁচলা, খোঁয়াড় বা গোয়াল-ঘরের আবর্জ্জনা—ইহার উত্তম সার।

হাপোরে চারি অঙ্গুলি অন্তর বীজ পুতিয়া চারা উৎপন্ন করিয়া চারাগুলি ৪।৫টী পাতাযুক্ত হইলে ক্ষেতের স্থানে স্থানে মাদা করিয়া রোপণ করিতে হইবে কিম্বা সারবন্দিভাবে ৫।৬ হাত অন্তর রোপণ করিলেও চলে। ইহাদিগের জন্য মাচান করিয়া দেওয়া উচিত। গ্রীষ্মকালের গাছের জন্য মাচান না করিলেও চলিতে পারে কারণ সে সময় তৃণাদির তত প্রাদুর্ভাব থাকে না। গ্রীষ্মকালের গাছে প্রচুর জলসেচন করিতে হইবে।

পুতিকা পালনের জন্য একটী প্রণালী আছে। এতদর্থে নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে নিয়মিত স্থান ব্যবধানে এক হাত চওড়া এবং আধ হাত বা পৌণে এক হাত গভীর একটী নালা খনন করিতে হয়। অতঃপর বীজ বপনের কিছুদিন পূর্ব্বে গোশালা, আস্তাবোল প্রভৃতির সম্মার্জ্জিত জঞ্জাল দ্বারা তাহা পূর্ণ করিয়া মাটি চাপা দিয়া রাখিতে হয়। অতঃপর যথাসময়ে সেই সারিতে ৪।৫ হাত অন্তর বীজ কিম্বা চারা পুতিয়া দিবে। গ্রীষ্মকালে উক্ত সারি জল প্লাবিত করিয়া দিতে হইবে। পটি, মাদা, প্রভৃতি সর্ব্বদা নিস্তৃণ রাখিবার চেষ্টা করা উচিত।

পুঁইগাছ পিচ্ছিল রস বা লালা পূর্ণ, ভোজনকালেও তাহা বুঝা যায়। কুট্টিত শাকে লবণ মাখাইয়া কটাহে বা হাঁড়িতে সিদ্ধ করিলে উহা হইতে অনেক রস নির্গত হইয়া আসে। স্মরণ থাকে যে, উহা বিনা জলে এবং পাত্রের মুখ ঢাকিয়া সিদ্ধ করিতে হইবে। এইরূপে ক্ষণকাল সিদ্ধ হইলে যে রস নির্গত হয় তাহা ফেলিয়া দিলে শাকের পিচ্ছিলতা অনেকটা কাটিয়া যায়। অনন্তর সেই সিদ্ধ শাক লইয়া তৈল মসলাদি দ্বারা ব্যঞ্জন রন্ধন করিতে হয়।

বিলাতী-কুমড়া বা মিঠে-কুমড়া (Pumpkin)

বিলাতী-কুমড়া সংস্কৃত ভাষায় কর্ক্কারু নামে অভিহিত, কিন্তু কর্কারু শব্দের বিবরণপাঠে কুষ্মাণ্ড বুঝায়, অথচ কুষ্মাণ্ড অর্থে আমরা সাঁচি বা চাল-কুমড়া বুঝিয়া থাকি। এ সম্বন্ধে কিছু সন্দেহ রহিল। ইহা ভারতের দেশজ উদ্ভিদ কি না তাহাও বলা যায় না। ইহার সঙ্গে বিলাতী শব্দ সংযোজিত হইল কেন তাহাও বুঝা যায় না। যাহা হউক, আমাদের কার্য্যসিদ্ধির জন্য বিলাতী বা মিঠে কুমড়া শব্দ ব্যবহার করিব। ইহার হিন্দী নাম—কাদিমা বা মিঠেকদু। কুমড়ার আকার জাতি এবং পরিচর্য্যানুসারে এক-আধ-সের হইতে এক মণের অধিক বড় ফল হইয়া থাকে, কিন্তু যে সকল গাছে বৃহৎ ফল তাহাতে অধিক ফলন হয় না। বৃহদাকারের কুমড়া কর্ম্ম বা যজ্ঞ-বাড়ীতে সাশ্রয় দেয়; কিন্তু গৃহস্থবাড়ীর ব্যবহারের জন্য বৃহৎ অপেক্ষা মাঝারি আকারের কুমড়া স্পৃহনীয়।

এক গাছে বৃহদাকার ফল ৩।৪টীর অধিক হয় না, এবং সে ৩।৪টী ফলও পরস্পর সমতুল্য হয় না। বিগত ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে দ্বারবঙ্গরাজের রাজনগরের সব্জীবাগানে একটী কুমড়া গাছে ৪টী মাত্র ফল হইয়াছিল। উক্ত ফল কয়টীর মধ্যে একটীর ওজন আটচল্লিশ সের এবং অপর ৩টীর প্রত্যেকের ওজন ২৫।৩০ সের মাত্র হইয়াছিল। কিরূপ স্থান ও কিরূপ মাটিতে জন্মিয়াছিল বলিয়া রাখি কারণ তাহা পাঠকদিগের কাজে লাগিতে পারিবে। পুষ্করিণী খোদিত ভরাট মাটিতে উহা আপনিই জন্মিয়াছিল। কেহ বীজ বা গাছ রোপণ করে নাই, দৈবক্রমে বীজ কিরূপে তথায় আসিয়া পড়িয়াছিল। গাছটী একটী বেলগাছের নিম্নে জন্মিয়াছিল সুতরাং তাহাকে সেই বেলগাছেই নিয়ন্ত্রিত করিয়া দেওয়া হয়।

কুমড়ার আকার এক প্রকার নহে,—কোন জাতির ফল ছোট তাকিয়া

বা বালিশের ন্যায়, কোন জাতির ফল গোলাকার, আবার কোন জাতির লম্বা বা গোল হইয়া খাঁজ বা পল-বিশিষ্ট ফল হয়। যাহা হউক, ইহাতে কিছু আসিয়া যায় না। ফসলের সময়ানুসারে কুমড়াকে ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিভাগ করা যায়। এক জাতি বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে ফলে, অপর জাতি আষাঢ় হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত; তৃতীয় জাতি কার্ত্তিক হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ফলিয়া থাকে, সুতরাং বিবেচনা করিয়া বিশেষ বিশেষ জাতীয় কুমড়ার আবাদ করিলে বারমাস ফল পাওয়া যাইতে পারে। বৈশাখী-কুমড়ার বীজ মাঘ মাসের প্রথম ভাগে, শারদীয় কুমড়ার বীজ বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে, এবং মাঘী কুমড়ার বীজ আষাঢ় মাসে, বপন করিতে হইবে। ঋতু-বিশেষে কুমড়া লতিকার বৃদ্ধির ইতরবিশেষ হইয়া থাকে, সেইজন্য বৈশাখী জাতীয় গাছের লতিকা অপেক্ষা কম বৃদ্ধিশীল। গ্রীষ্মকালে একদিকে সূর্য্যের প্রখর উত্তাপ, অন্যদিকে ভূগর্ভে রস কম থাকে, এই দুই কারণে এ সময়ের গাছ অধিক বাড়ে না। উক্ত জাতীয় গাছের জন্য ৭।৮ হাত অন্তর ১-হাত ব্যাসের এক হাত গভীর গর্ত্ত করিয়া যথানিয়মে মাদা বা থালা করিতে হইবে। সেই থালার মাটির সহিত খোঁয়াড়ের আবর্জ্জনা উত্তমরূপে মিশাইয়া দৃঢ়রূপে চাপিয়া দিতে হয়। অতঃপর, মাদার উপর ত্রিকোণাকারে অর্থাৎ তিনদিকে তিনটী বীজ পুঁতিয়া দিতে হয়।

শারদীয় জাতির গাছসমূহ বর্ষা পায়, সেই জন্য অতিশয় দ্রুতবৃদ্ধি-শীল হয়। ইহাদিগকে যথাসময়ে উল্লিখিত নিয়মে ১০-হাত অন্তর থালায় বপন করিবে। মাঘী-জাতীয় কুমড়ার জন্য এই নিয়ম অবলম্বনীয়। বর্ষাকালে ইহারা শীঘ্র শীঘ্র তৃণাদি আগাছা দ্বারা ঢাকিয়া যায়, ফলতঃ তাহাদিগের বৃদ্ধির ক্ষতি হয়; কিন্তু মাদার মাটি সারাল হইলে গাছগুলি খুব শীঘ্র ক্ষেত্রময় প্রসারিত হইয়া পড়ে, তখন আর তৃণাদি জঙ্গল উহা-

দিগের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে না, বরং তাহাদের বিস্তারের ফলে তৃণাদির বৃদ্ধি একবারে স্থগিত হইয়া যায়।

মাচায় কুমড়া গাছের সুবিধা হয় না, কারণ কুমড়ার গাছই স্বভাবতঃ অতিশয় ভারী। অতঃপর কয়েকটি কুমড়া জন্মিলেই মাচান নামিয়া পড়ে কিম্বা ভাঙ্গিয়া পড়িবার সম্ভাবনা। এইজন্য কুমড়ার ন্যায় বৃহৎ ও ভারী লতিকাদিগকে ভূপৃষ্ঠেই প্রসারিত হইতে দেওয়া ভাল।

ভূমিতে বপন করিবার পূর্ব্বে বীজগুলি ১০।১২-ঘণ্টা জলে নিমজ্জিত রাখিলে শীঘ্রই অঙ্কুরিত হয়। চারাতে প্রয়োজনমত প্রতিদিন কিম্বা ২।১ দিন অন্তর অপরাহ্নে প্রচুররূপে জল দিবে। বর্ষাকালে গাছে জল দিতে হয় না। যাবৎ বর্ষা আগত না হয় তাবৎ জল দেওয়া বিধি।

গ্রীষ্মকালে গাছের জন্য মাচা আবশ্যক হয় না, কারণ তখন মাটি শুষ্ক থাকে সুতরাং গাছে ফল ধরিলে কোন অনিষ্ট হয় না; কিন্তু বর্ষার গাছে মাচা করিয়া না দিলে অথবা ঘরের চালে গাছ উঠাইয়া না দিলে ভূশায়ী ফল সকল ভূমির আর্দ্রতাহেতু পচিয়া যায়। খৃষ্টীয় ১৮০২ সালে মুরসিদাবাদে রেইল্‌বাগে বর্ষাকালে কয়েকটী গাছে বড় বড় এবং প্রচুর কুমড়া হইয়াছিল, কিন্তু ভূমির নিম্নতানিবন্ধন মাটি নিরন্তর সিক্ত থাকিত বলিয়া বিস্তর ফল খারাপ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু কয়েকটী ফলের নিম্নে টালি ও ইষ্টক পাঁতিয়া দিবার বন্দোবস্ত করায় সেগুলি রক্ষা পাইয়াছিল। বৃহৎ ক্ষেত্রে উহা সুবিধাজনক নহে। তবে দেখিতে হইবে, যেন জমিতে জল সঞ্চিত না হয়, কিম্বা জঙ্গলাদি না জন্মে।

গাছ হইতে যত শীঘ্র ফল সংগ্রহ করিয়া লওয়া যায় তত অধিক ফল জন্মে, সুতরাং ফলের পরিপুষ্টি শেষ হইলেই তাহাকে ঘরে আনা উচিত। ভবিষ্যতের ব্যবহারের জন্য অধিক দিন রাখিতে হইলে সুপক্ক ফল রাখা কর্ত্তব্য।

সুপক্ক ফল গৃহমধ্যে শিকায় ঝুলাইয়া রাখিলে অনেক দিবস পর্য্যন্ত ভাল থাকে। ভোজনের পক্ষে কচি ও অর্দ্ধপক্ক ফলই উপাদেয়। পাকা ফল দেখিতে বড় হয় সত্য, কিন্তু সে সময়ে উহাতে একটা অপ্রীতিকর গন্ধ হয়। সুপক্ক কুমড়া মিষ্ট হয়। চৈত্র মাস হইতে আশ্বিন-কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত কুমড়া যজ্ঞ বা কর্ম্মবাড়ীর প্রধান তরকারী,—অধিক কি কুমড়া না থাকিলে হয় ত এই কয় মাস কোন ক্রিয়া-কলাপ সম্পন্ন হইত না।

সাঁচি বা চাল-কুমড়া (White gourd)

সংস্কৃত ভাষায় ইহা কুষ্মাণ্ড নামে অভিহিত। ইহা হইতেই কবিরাজ মহাশয়গণ কুষ্মাণ্ড-খণ্ড প্রভৃতি প্রস্তুত করেন। সাঁচি-কুমড়াতে যে কেবল তরকারী হয় তাহা নহে। সাঁচি কুমড়া খণ্ড খণ্ড করিয়া সিদ্ধ করতঃ চিনিতে পাক করিলে যে বরফী হয়, তাহা অনেক রোগের ঔষধ ও পথ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পুরাতন কুমড়ার মূল্য অধিক, সেই জন্য অনেকে উক্ত কুমড়া গৃহমধ্যে শিকায় ঝুলাইয়া কিম্বা ঘরের চালে রাখিয়া দেয়। পল্লীগ্রামে প্রায় সকল গৃহস্থের চালেই কুষ্মাণ্ড গাছ দেখা যায় বলিয়া ইহার অপর নাম চালকুমড়া।

সাঁচিকুমড়ার বীজ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে বপন করিতে হয়। সাধারণ বাগান বা উচ্চ জমিতে ৫।৬-হাত অন্তর এক-একটী মাদা তৈয়ার করিয়া দুইটী সুপক্ক বীজ বপন করিবে। মাটি সরস হইলে ৫।৬ দিন মধ্যে বীজ হইতে চারা উদ্গত হয়। বপিত হইবার পূর্ব্বে বীজগুলিকে ১০।১২ ঘণ্টাকাল ভিজাইয়া লইতে পারিলে বীজ অপেক্ষাকৃত শীঘ্র অঙ্কুরিত

হইয়া গেলে কাষ্ঠ বা বংশ শলাকা দ্বারা উঙ্কাইয়া দিতে হইবে। গাছের জন্য মাচা করিয়া দিবে কিম্বা ঘরের চালে গাছ উঠাইয়া দিবে। মাচায় গাছ উঠিলে যখন তাহাতে ফল হইবে, তখন প্রত্যেক ফলের জন্য একটী শিকা করিয়া দিবে নতুবা ফলের ভারে গাছ ঝুলিয়া পড়ে অথবা প্রবল বাতাসে ছিঁড়িয়া যাইতে পারে।

সাঁচি-কুমড়া যখন ছোট থাকে, তখন তাহার গাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূক্ষ্ম লোম বা সোঁয়া থাকে, কিন্তু ফল বড় হইলে ক্রমে তাহা ঝরিয়া গিয়া কুমড়ার সমগ্র গাত্রে এক প্রকার চক-খড়ির গুঁড়ার ন্যায় পদার্থ দেখা যায়। তখন ইহাতে হাত দিলে সেই গুঁড়া হাতে লাগিয়া যায়। শ্রাবণ-ভাদ্র মাস হইতে কুমড়া ফলিতে থাকে। তরকারীতে ভক্ষণ করিতে হইলে কচি অবস্থাতেই গ্রহণ করা ভাল। পাকা কুমড়ার শস্য বা শাঁস বাহির করিয়া স্ত্রীলোকেরা নানাবিধ বড়ি তৈয়ার করিয়া থাকেন। উক্ত বড়িকে কুমড়া-বড়ি কহে। তরকারির সহিত কুমড়া-বড়ি অতি উপাদেয় হইয়া থাকে।

তেলাকুচা (Coccina grandis)

তেলাকুচা গাছ যথা-তথা স্বতঃই জন্মে বলিয়া উহা ঔদ্যানিক উদ্ভিদ-রূপে পরিগণিত হয় নাই। নিম্নবঙ্গে বারমাসি নানাবিধ তরিতরকারী উৎপন্ন হয় বলিয়া তেলাকুচা সদৃশ উদ্ভিদ আমাদের নিকট অবজ্ঞাত। বেহার অঞ্চলে, অনেকের বাগানে বা অঙ্গিনায় তেলাকুচা যত্নপূর্ব্বক রোপিত হয়, এবং তাহার লতিকা ও ফল তরকারিতে ব্যবহৃত হয়।

তেলাকুচার বীজ ক্রয় করিতে পাওয়া যায় না, সুতরাং সুপক্ক ফল [illegible] বীজ [illegible] বপন করিলে সহজেই চারা উৎপন্ন

হইতে পারে। ফাল্গুন-চৈত্র ও বৈশাখ—এই তিন মাসের মধ্যে যে কোনও সময়ে বীজ বুনিলে চারা উৎপন্ন হয়। চারা গাছে ৫।৬টী পাতা জন্মিলে প্রাচীর বা বেড়ায় নিয়ন্ত্রিত করিয়া দিতে হয়। ইহার অন্য কিছু পাট নাই।

সাধারণতঃ আনাচে-কানাচে তেলাকুচা গাছ স্বতঃই উৎপন্ন হয়। সেই গাছের গেঁড় বা মূল আনিয়া রোপণ করিলেও চলিতে পারে। গাছ বড় হইলে গোড়া হইতে যে সকল ফেঁকড়ি জন্মে তাহা কাটিয়া রোপণ করিলেও চারা উৎপন্ন হয়।

লাউ, ঝিঙ্গে প্রভৃতি কোন কোন সব্‌জীর একটী নিকৃষ্ট জাতি আছে তাহাদিগের ফলের স্বাদ তিক্ত হইয়া থাকে। সেইরূপ তেলাকুচারও একটী তিক্ত জাতি আছে, সুতরাং বিস্বাদ জাতির গেঁড় বা বীজ ব্যবহার করা উচিত নহে। গাছের বীজ বা গেঁড় রোপণ করিতে হইলে অগ্রে তাহার ফল চাকিয়া দেখা উচিত।

গাছের গোড়ায় সাধারণ সার ওঁচলা বা আবর্জ্জনা দিলেই চলিতে পারে। রাজ-দ্বারভাঙ্গার রাজনগরের সব্‌জীক্ষেত্রের একপার্শ্বে একখণ্ড ভূমিতে নিয়মিতরূপে প্রতি বৎসরই তেলাকুচার আবাদ করিতে হইত। ইহার ফল এবং কচি ডগা ও পাতা তরকারীতে ব্যবহার্য্য। সুপক্ক ফল গৃহপালিত পক্ষীদিগের খাদ্য।

একবার রোপণ করিলে ২।৩ বৎসর গাছ বাঁচিয়া থাকে এবং যথাসময়ে ফল প্রদান করে। প্রথম বৎসরে ফলন শেষ হইলে, পর বৎসর মাঘ মাসে গাছের মূল শাখাগুলির এক হাত আন্দাজ রাখিয়া অবশিষ্টাংশ ছাঁটিয়া দিতে হইবে।

কাঁকুড় (Cucumis melon var. Utilissimus.)

কাঁকুড়,—শসা, ফুটী প্রভৃতির সমবর্গীয় জাতিবিশেষ ; কিন্তু তরমুজের ন্যায় পাকা খাইতে তাদৃশ সুমিষ্ট লাগে না। এই জন্য সচরাচর তরকারীতে ব্যবহার হয়। কচি-কচি কাঁকুড় কাঁচা খাইতে মন্দ লাগে না।

পলি-পড়া চর ভূমিতে কাঁকুড় ভাল জন্মে। আশ্বিন মাসে চর হইতে জল সরিয়া গেলে এবং মাটিতে যো হইলে কাঁকুড় বীজ বপন করিতে হয়। অতি উত্তমরূপে জমি চষিয়া আড়াই হাত অন্তর ৪।৫ ইঞ্চ গভীর জুলি করিবে ও দুই জুলির মধ্যবর্ত্তী স্থান ঈষৎ উচ্চ করিবে এবং দুই দিক ঢালু করিবে। তদনন্তর সেই জুলির মধ্যে ২।৩ হাত অন্তর ২।৩টী বীজ বপন করিবে। মাটি রশ না থাকিলে দুই-এক দিবস তাহাতে জলসেচন করিতে হইবে এবং তাহা হইলেই বীজ শীঘ্র অঙ্কুরিত হইয়া উঠিবে। ইহাতে জল আর আবশ্যক হয় না।

চৈত্র-বৈশাখ মাসে আর এক দফা কাঁকুড়ের বীজ রোপিত হয়। এ সময়ের কাঁকুড় বর্ষাকাল পর্য্যন্ত ফলিয়া থাকে। ইহার বিশেষ কোন পাট নাই।

ঝিঙ্গে (Luffa acutangula)

ইহাকে রাম-তরাইও কহে। বর্ষাকালের ইহা একটী প্রধান তরকারি মধ্যে গণ্য। কচি ঝিঙ্গের আস্বাদ পটোলের ন্যায়। উহার এক একটী ফল এক হাত বা পাঁচ পোয়া পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয়। ফল অতিরিক্ত বড় হইলে কিম্বা অনেক দিন গাছে থাকিলে ছিবিড়াবিশিষ্ট হইয়া যায় এবং বীজগুলিও শক্ত হইয়া যায়। ঝিঙ্গের কচি অবস্থায় চড়-চড়িতে

মাঘ মাসে ভুঁয়ে ঝিঙ্গের এবং বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে পালা-ঝিঙ্গের বীজ বপন করিতে হয়। ভুঁয়ে ঝিঙ্গের লতা অধিক দীর্ঘ হয় না; সুতরাং ভূপৃষ্ঠোপরি লতাইয়া থাকে, কিন্তু পালা-ঝিঙ্গের লতা বিস্তৃত হয় এবং বর্ষায় অতি বৃদ্ধিশীল হয়, এইজন্য ইহাদিগকে মাচায় নিয়ন্ত্রিত করিয়া দেওয়া উচিত। ভুঁয়ে-ঝিঙ্গের জন্য ক্ষেতে ৪।৫ হাত অন্তর মাদা করিয়া প্রত্যেক মাদায় ২।৩টী বীজ বপন করিবে এবং অন্যান্য বীজের ন্যায় ইহাতেও জলসেচন করিবে। ঝিঙ্গে লতাইবার স্থান দেওয়া উচিত। মাচাতে ফল লম্বা হয়, আর জমিতে যে সকল গাছ লতাইয়া যায়, তাহাদিগের ফলের কোন নিয়ম নাই, তবে মাচার ফলের ন্যায় অধিক লম্বা হয় না। পুষ্করিণীর কিনারায় গাছ পুতিয়া জলের উপরে মাচা করিয়া দিলে সে গাছ খুব তেজাল হয় এধং তাহাতে অধিক এবং বড় বড় ফল হয়। যেখানে দুই চারিটী গাছের প্রয়োজন সেখানে মাচায় উঠাইয়া দেওয়া ভাল, কিন্তু যথায় অধিক গাছ রোপিত হয়, তথায় সকল গাছের জন্য মাচা করিয়া দেওয়া অসম্ভব, সুতরাং জমিতেই লতাইতে দেওয়া উচিত। এই জন্য জমি সর্ব্বদা পরিষ্কার থাকা নিতান্ত প্রয়োজন।

ঝিঙ্গের মধ্যে অন্য এক জাতি আছে, তাহার ফল অতিশয় তিক্ত হইয়া থাকে। এইজন্য পরিচিত লোকের নিকট হইতে ভাল জাতির বীজ সংগ্রহ করিতে হইবে। নিজের ক্ষেত্রের যে বীজ রাখিবে তাহা যেন ভাল জাতির হয়। ক্ষেত্রে যদি তিক্ত ঝিঙ্গের গাছ জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার মুলোৎপাটন করিয়া ফেলিয়া দিবে, নতুবা ভ্রম ক্রমে তাহার বীজও ভাল জাতির বীজের সহিত মিশিয়া যাইতে পারে।

পটোল (Trichosanthes dioeca)

বাঙ্গালী গৃহস্থের পক্ষে পটোল একটী উপাদেয় তরকারি। কিন্তু ইহার আবাদে পরিশ্রম ও সাবধানতার আবশ্যক। হিন্দী ও ইংরাজীতে ইহা পলবল (pulwal) নামে অভিহিত।

সচরাচর দুই জাতীয় পটোল দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, এক জাতীয় ধূসর বর্ণের, তাহার নাম—মুরসিদাবাদী পটোল। ইহার বিশেষ স্বাদ নাই, কিন্তু বাজারে এই জাতীয় পটোলেরই যথেষ্ট আমদানী হয়, ইহার মূল্যও অপেক্ষাকৃত সুলভ। মুরসিদাবাদ অঞ্চলে এই জাতীয় পটোলেরই প্রাদুর্ভাব অধিক, আবাদও অধিক। ইহার খোসা বা ত্বক অপেক্ষাকৃত স্থূল। অপর জাতীয় ডোরাদার পটোল সকলের আদরের বস্তু। এই জাতির নাম,—বালির পটোল। ইহার স্বাদ মধুর, বাস প্রীতিকর। বাঙ্গালার মধ্যে কাঁচড়াপাড়ার পটোল স্বনামখ্যাত কিন্তু অনেক জেলায় আবাদ হইয়া থাকে। ডোরাদার পটোল ভর্জ্জিত হইবার সময় যে সুন্দর গন্ধ প্রসারিত হয় তাহা লোভনীয়। ভাজা, ডালনা দম, কালীয়া ছোঁকা, চাট্নী, মাংস—সকল প্রকারেই পটোল নিয়োগযোগ্য। এবং যে কোন ব্যঞ্জনে সংযোজিত হউক, তাহা অতি উপাদেয় হয়। ইহার একটী বিশেষত্ব এই যে, সকল ব্যঞ্জনেই ইহা আপন বিশিষ্টতা স্বাদ ও সুগন্ধ দ্বারা প্রতিপন্ন করে।

নবদ্বীপে এক জাতীয় পটোল জন্মে, তাহা স্বতন্ত্র জাতীয় বলিয়া মনে হয়। উক্ত পটোল খর্ব্বাকার, তত শাঁসাল নহে, কিম্বা তেমন সুঘ্রাণ নহে। চেষ্টা করিলে বালির পটোল অনায়াসে উৎপন্ন করিতে পারা যায় অথচ স্থানীয় লোকেরা সেই খর্ব্বাকৃতি, স্থূল ত্বক সুগন্ধ বিহীন পটোলের আবাদ করে কেন তাহা বুঝা যায় না।

এবং ঈদৃশ জমিতে পটোল যেরূপ বৃহৎ, সুস্বাদ ও সুগন্ধ হয়, অন্য কুত্রাপি সেরূপ হয় না। তাহা ব্যতীত ভূগর্ভোত্থিত নূতন মাটিও পটোলের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

দ্বারভাঙ্গা-রাজের বছৌর পরগণার অন্তর্বর্ত্তী রাজনগরে একখণ্ড পটোল-ক্ষেত ছিল, তাহার আয়তন ৭।৮ বিঘা। কমলা নদী হইতে ৪০০ হাত দূরে অবস্থিত, মাটি স্বভাবতঃ বেলে। উক্ত-ভূমি খণ্ডের এক দিকে একটী পুষ্করিণী খোদিত হইয়াছিল এবং মাটি উক্ত ক্ষেত্রের একাংশে প্রসারিত করা হইয়াছিল। কলিকাতা হইতে ডোরাদার জাতীয় অর্থাৎ বালির পটোলের গেঁড় আনাইয়া তাহাতে আবাদ করিয়াছিলাম। সেই জমিতে যেরূপ পটোল উৎপন্ন হইত, এরূপ পটোল কোথাও দেখি নাই। সেই সকল পটোল দীর্ঘে ৬-ইঞ্চ এবং মধ্যস্থলের বেষ্টনী ৫-ইঞ্চ হইতে ৬-ইঞ্চ হইয়াছিল। তাহার স্বাদও এমন উপাদেয় হইয়াছিল যে, তাহা বর্ণনা করা যায় না। ইহা দেশের মাটির গুণ।

পটোলের মূল ভূগর্ভে এক হাত হইতে দুই হাত পর্য্যন্ত নিম্নে প্রবেশ করে। এই নিমিত্ত পটোল-ক্ষেতের মাটি গভীর, হাল্কা ও বেলে হওয়া স্পৃহনীয়। মাটি কঠিন, ভারি বা ভাসা হইলে তাহাতে পটোলের আবাদ করিয়া সুবিধা হয় না। অপরন্তু সাধারণ জমি অপেক্ষা পটোল-ক্ষেত উচ্চ হওয়া উচিত। বর্ষাকালে যে জমি জলে ডুবিয়া যায়, অথবা যে জমি স্বভাবতঃ সিক্ত এবং মাটি আটাল,—পটোলের পক্ষে তাহা অতি নিকৃষ্ট। এইজন্য স্বভাবতঃ উচ্চ, শুষ্ক ও লঘু জমিতে পটোলের আবাদ করা উচিত। বালুকা-প্রধান দোয়াঁশ মাটি পটোলের পক্ষে প্রশস্ত।

ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে বৃহৎ গাছ না থাকে, এরূপ স্থানে পটোলের আবাদ করা উচিত,—অন্ততঃ ক্ষেতের পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিক মুক্ত থাকা আবশ্যক। উদ্ভিদ মাত্রেরই পূর্ব্বদিকের আলোক বিশেষ উপকারী এবং দক্ষিণদিকের

আলোক উত্তাপবিশিষ্ট, সুতরাং তদ্দ্বারা জমিতে যথেষ্ট উত্তাপ ও আলোক পৌঁছে।

সাধারণতঃ কার্ত্তিক মাসে পটোল রোপণ করিতে হয়, কিন্তু বারমাস পটোলের আমদানি রাখিতে হইলে দুই খণ্ড ক্ষেতের ব্যবস্থা করা উচিত এবং তাহা হইলে এক খণ্ড ক্ষেতে কার্ত্তিক মাসে, অপর খণ্ডে পৌষমাসের শেষে আবাদ করিতে পারা যায় এবং তাহা হইলেই বারমাস পটোল পাওয়া যাইতে পারে। পটোল অগ্রে উৎপন্ন করিবার বাসনা থাকিলে অথবা তাহা বিক্রয় করিয়া লাভবান হইতে হইলে, যাহাতে পটোল অগ্রে জন্মে, সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। মাঘ-ফাল্গুনে পটোল অনেক দামে বিক্রয় হয়। যে কৃষক সকলের অগ্রে বাজারে পটোল আমদানী করিতে পারে সে বিশেষ লাভবান হয়। অসময়ের পটোল প্রতি মণ ২৬।২৫৲ টাকায় বিক্রয় হয় কিন্তু যে সময়ে প্রচুর জন্মে তখন তাহার প্রতি মণ দশ আনা বার আনা বা এক টাকা হয়। অতএব লাভের জন্যই হউক, আর সাংসারিক ব্যবহারের জন্যই হউক, যাহাতে উহা অগ্রে জন্মে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

পটোল আবাদের জন্য বর্ষাকালে বারম্বার সুগভীর চাষ দিয়া জমিতে 'পচান' দিতে হয়। জঙ্গলাদি পচিয়া গেলে এবং বারম্বার মাটি উলটপালট হইলে ক্ষেত্রের উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধি হয়। অতঃপর বারম্বার হলচালনা দ্বারা মাটি চূর্ণ করিতে হইবে। তৎপরে ক্ষেত্রে জুলি টানিয়া, জুলি-পরস্পর মধ্যস্থিত স্থানসমুদায় ঈষৎ উচ্চ ও ঢালু করিতে হয়; তিন হাত আঁতর * বা ব্যবধান রাখিয়া পটোলের জুলি প্রস্তুত করা উচিত এবং সেই জুলি আধ হইতে পৌনে এক হাতের অধিক গভীর করিবার প্রয়োজন হয় না।

---

* আঁতর,—অন্তর শব্দের অপভ্রংশ।

যে মাটি উঠিবে তাহা দ্বারাই জুলি-পরস্পর-মধ্যবর্ত্তী স্থান উচ্চ করিলেই জুলি কাটিয়া চলিতে পারে।

বর্ষা উত্তীর্ণ হইলে কার্ত্তিক মাসের মধ্যে গেঁড় বা গোড়া রোপণ করা উচিত। উহার মূল ২।৩ অঙ্গুলি দীর্ঘ থাকিলেই চলে, অধিক দীর্ঘ রাখিবার আবশ্যক হয় না।

পটোলের আবাদ পত্তনে তিনটী উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে :— ১ম—গেঁড় রোপণ, ২য়,—বল্লরি লতা রোপণ, এবং ৩য়,—লতাগুচ্ছ রোপণ। পটোলের আবাদ করিবার জন্য উল্লিখিত তিনটি উপায়ের মধ্যে যে কোনটী অবলম্বন করিলেই চলে, কিন্তু প্রথমটীই বিশেষ কার্য্যকরী এবং প্রচলিত।

গেঁড়-রোপণ।—ঈষৎ শিকড় সমেত গাছকে গেঁড় * কহে। পুরাতন ক্ষেত হইতে গেঁড় সংগ্রহ করিয়া যথাস্থানে এক-একটী গেঁড় মাটিতে পুতিয়া দৃঢ়রূপে মাটি চাপিয়া দিবে; গেঁড়ের শিরোভাগ যেন মাটিতে চাপা না পড়ে—এমন করিয়া রোপণ করিতে হইবে; অতঃপর তাহার শিরোভাগ কতকগুলি টুকরা বিচালী দ্বারা ঢাকিয়া দেওয়া উচিত। ১০।১৫ দিন এইরূপ থাকিলে গেঁড়ের শিরোভাগ হইতে ফেঁকৃড়ি উদ্গত হয়, তখন বিচালী অপসৃত করিতে পারা যায়, কিন্তু তাহা না করিলেও কোন ক্ষতি নাই। গেঁড়গুলি পুরাতন, স্থূল ও পরিপুষ্ট হওয়া প্রয়োজন। নূতন ও শীর্ণ গেঁড় হইতে গাছ জন্মিতে পারে কিন্তু তাহা আশানুরূপ বৃদ্ধিশীল ও ফলপ্রদ হয় না।

বল্লরি-রোপণ।—পটোলের পুরাতন লতা রোপণকে বল্লরি রোপণ কহে। লতা সংগৃহীত হইলে ২।৩ গাছা লতা লইয়া জুলির মধ্যে লম্বিতভাবে রাখিয়া মাটি চাপা দিবে। এস্থলে জুলি ৮ অঙ্গুলি গভীর হওয়া

---

* পটোলের মূলকে 'গেঁড়' কহে।

উচিত। যাহা হউক, বল্লরি রোপিত হইলে জুলির মাটি ঈষৎ চাপিয়া দিতে হয়। ১০।১৫ বা ২০ দিনের মধ্যে লতিকা গাত্রের গ্রন্থিসমূহ হইতে ফেঁকড়ি বাহির হইয়া ভূপৃষ্ঠে দেখা দেয়।

গুচ্ছ রোপণ।—গুচ্ছি রোপণের অভিপ্রায় বল্লরি-রোপণ হইতে স্বতন্ত্র নহে, প্রণালী বিভিন্ন মাত্র। এতদুদ্দেশ্যে ২।৩ গাছা লতা জড়াইয়া গুচ্ছি বাঁধিতে হয় মাত্র। অনন্তর জুলির মধ্যে ২।৩ হাত অন্তর, ৮ অঙ্গুলি গভীর গর্ত্ত মধ্যে সেই গুচ্ছি পুতিয়া দিবে। ইহাই গুচ্ছি রোপণ।

লতিকা অপেক্ষা গেঁড় রোপণ করিলে শীঘ্র ও অধিকতর তেজাল গাছ জন্মে। যে সকল লতায় পটোল জন্মে না, চলিত ভাষায় তাহাকে বাঁজা বা 'ফেলা' লতা কহে। এই সকল লতার গেঁড় বা গ্রন্থি হইতে যে গাছ জন্মে, তাহারা অফলা বা বাঁজা হয়, সুতরাং ঈদৃশ লতা রোপণ করা উচিত নহে। ঈদৃশ লতায় ফল জন্মে না, কারণ তাহাতে যে সমুদায় পুষ্প জন্মে, তাহারা পুংজাতীয়। এ জাতীয় গাছের স্বতন্ত্র চৌকা বা পটি থাকিলে তাহা হইতে পত্র বা ডগা সংগ্রহের জন্য ফলবতী গাছ ভাঙ্গিতে হয় না। কচি-ডগা ও ফেঁক্ড়িতে কয়েকটি উপাদেয় তরকারী হয়।

ফলন্ত লতাসমন্বিত ক্ষেত্র মধ্যেও কখন কখন ২।৪ টা গাছ অফলা হইয়া যায়। দৈব ঘটনার উপর মানুষের হাত নাই এবং ইহার কোন কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না। অনেক পুরুষ ও রমণী বন্ধ্যা আছে তাহার কারণ কেহ নির্দ্দেশ করিতে পারে নাই। গাছের বন্ধ্যাত্বও আমরা স্বীকার করিয়া লইব। ক্ষেত্রমধ্যে এরূপ গাছ আদৌ থাকিতে দেওয়া উচিত নহে। রোপণকালে পটোলের লতার উপর অধিক মাটি চাপা না পড়ে, কেননা তাহা হইলে, নূতন অঙ্কুর মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উঠিতে বিলম্ব হয় এবং অনেক সময়ে উঠিতে পারে না। গাছ উদ্গত হইলে, নিড়ানি-করণ ভিন্ন অন্য বিশেষ পাট নাই। ক্ষেত্র প্রতি মাসে একবার নিড়ান করা

আবশ্যক। নিড়ানি করিবার জন্য বালক বা স্ত্রীলোক নিযুক্ত করিলে অল্প খরচ লাগে। চাষীদিগের মধ্যে এরূপ সংস্কার আছে যে, রাত্রিবাস-কাপড় পরিহিত হইয়া পটোল ক্ষেতে প্রবেশ করিলে ফসলের ক্ষতি হয়, ইহা একটা বাজে কথা। মধ্যে মধ্যে গাছের গোড়ায় মাটি আলগা করিয়া দিতে হইবে। লতাগুলি পরস্পর জড়িত না হয়, এজন্য সময়ে সময়ে উহাদিগকে সরাইয়া দেওয়া আবশ্যক। ক্ষেত্র মধ্যে আদৌ তৃণাদি জন্মিতে দেওয়া নহে।

পটোলের গাছ দুই তিন বৎসর ফসল প্রদান করে কিন্তু প্রথম বৎসর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফসল জন্মে। দ্বিতীয় বৎসর তদপেক্ষা ঈষৎ কম ফলে কিন্তু ফল বড় হয়। নূতন আবাদ করিতে হইলে, যে ক্ষেত্রে একবার পটোল জন্মিয়াছে, তৎপর বৎসরেই তাহাতে আবার পটোল না দিয়া অন্য ক্ষেত্রে দিতে পারিলে ভাল হয়। সর্ব্বাগ্রে নূতন পটোল আমদানী করিতে হইলে পূর্ব্ব বৎসরের আবাদকে বজায় রাখিতে হয় এবং সে ক্ষেত্রকে আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে কুদ্দালিত করতঃ জঙ্গলাদি পরিষ্কার করিয়া দিতে হয় এবং সেই সঙ্গে শুষ্ক পুরাতন লতাগুলিকে ছাঁটিয়া দেওয়া উচিত।

এক বিঘা পটোলের ক্ষেত্র হইতে বৎসরে ১০০৲ টাকারও অধিক আয় হইতে পারে এবং সম্বৎসরে ২০।২৫ টাকা ব্যয় হইলেও যথেষ্ট লাভ থাকে।

উচ্ছে (Bitter gourd.)

উচ্ছের আস্বাদ তিক্ত হইলেও ইহাতে নানাবিধ উৎকৃষ্ট ব্যঞ্জনাদি হইয়া থাকে। নিতান্ত বেলে-মাটি ব্যতীত অপর সকল মাটিতেই প্রায়

ইহা জন্মিয়া থাকে। ক্ষেতের যথাবিধ পাট করিয়া তিন হাত ব্যবধানে এক-একটী মাদা করিয়া তন্মধ্যে ৩।৪টী হিসাবে বীজ বপন করিয়া দুই এক দিন অন্তর বৈকালেই জলসেচন করিবে। ছয়-সাত দিনের মধ্যে বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। গাছ বাহির হইলে মধ্যে মধ্যে গোড়ার মাটি 'খুসিয়া' দিতে হইবে। কার্ত্তিক মাস হইতে বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত বীজ বপন করিতে পারা যায়।

আকার ভেদে উচ্ছের দুইটী জাতি আছে ১ম,—গোলাকার; ২য়,—পুলি-পিষ্টক সদৃশ লম্বা, গোল এবং উভয় পার্শ্ব ক্রম-সূক্ষ্ম। এতদুভয়ের স্বাদ মধ্যে কোনই প্রভেদ নাই।

চারাগুলি ঈষৎ বড় হইয়া উঠিলে যদি তন্মধ্যে শীর্ণ গাছ দেখা যায় তাহা হইলে তাহা তুলিয়া ফেলিয়া দিবে। এক মাদায় কতকগুলি গাছ থাকিলে পরে ডগাগুলি পরস্পর জড়াইয়া যায়, সুতরাং তাহাতে ফল অধিক হয় না। এইজন্য প্রতি মাদায় দুই তিনটীর অধিক গাছ থাকা ভাল নহে। ইহা লতানিয়া গাছ। ইহার জন্য অনুচ্চ মাচা করিয়া দিলে মন্দ হয় না। কিম্বা তাহাদিগের অবলম্বনের জন্য মাদা বেষ্টন পূর্ব্বক কঞ্চি বা অন্য পালা দিলে চলিতে পারে। এ সময়ে বর্ষা থাকে না, সুতরাং ভূমিতে লতাইয়া গেলেও ক্ষতি নাই। ফাল্গুন মাস হইতে ইহাতে ফল ধরিতে থাকে। উচ্ছের নামান্তর 'উচ্ছে'। কিন্তু উচ্ছে শব্দটী পূর্ব্ববঙ্গে চলিত।

করলা (Balsam apple.)

করলা,—উচ্ছে জাতীয় এবং ইহার ফলও উচ্ছের ন্যায় কিন্তু উচ্ছে অপেক্ষা অনেক বড় হয়। এক একটী করলা এক ফুট দীর্ঘ হয়। বাগানের সাধারণ জমিতে করলা জন্মিয়া থাকে, তবে ইহা বর্ষা কালে ফলে,

এজন্য জমি কিঞ্চিৎ উচ্চ না হইলে গোড়ায় জল বসিয়া গাছের অনিষ্ট করে। করলা দুইবার বপন করিতে পারা যায়। চৈত্র মাসের প্রথম হইতে জ্যেষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত বীজ বপন করিবে এবং প্রয়োজন বুঝিলে প্রতিদিন জল দিবে। ইহার জন্য মাচান আবশ্যক। চৈত্র-বৈশাখে রোপিত গাছে আষাঢ় মাস হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত ফল পাওয়া যায়। দ্বিতীয় দফায় শ্রাবণ মাসে বীজ বপন করিলে অগ্রহায়ণের শেষ ভাগ হইতে ফাল্গুন-চৈত্র মাস পর্য্যন্ত ফল পাওয়া যায়। অবর্ষার সময় গাছে জলসেচন করা উচিত।

গাছের গোড়ায়, কিম্বা বীজ পুতিবার অগ্রে, মাদায় পুরাতন গোবর-সার বা পোড়া মাটি দিলে ইহার বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে। বর্ষাকালে গাছের গোড়ার মাটি উচ্চ করিয়া দেওয়া আবশ্যক এবং সময়ে সময়ে তৃণ-জঙ্গলাদি পরিষ্কার করিয়া দিতে হইবে। ভূমিতে গাছ লতাইয়া গেলে বর্ষার জলে মাটির আর্দ্রতায় ফল পচিয়া যায়।

করলা ও করেলী ইহারা জাতি এক হইলেও কালভেদে ইহারা আবাদিত হয়। গ্রীষ্মকালে যাহার আবাদ হয়, তাহার নাম—করলা, এবং বর্ষাকালে যাহার আবাদ হয় তাহা করেলী নামে অভিহিত।

ধুঁদুল (Luffa Egyptica)

হিন্দুস্থানবাসীগণ ইহাকে ঘীয়া-তরি কহে। ধুঁদুল বৃহৎ লতানিয়া গাছ, মাচা বা গাছের উপরে ভাল থাকে। ইহার ফল এক হাত দীর্ঘ হইয়া থাকে। ধুঁদুল অতি মিষ্ট তরকারী, পাকিয়া গেলে তন্তু-বিশিষ্ট হইয়া যায় কিন্তু তাহা হইলেও অব্যবহার্য্য নহে, বরং পাকা ধুঁদুলের ব্যঞ্জন ঘণ্ট, ডালনা, চচ্চড়ী প্রভৃতি অতি মুখরোচক হয়। ধুঁদুলের গাছ

বৃহজ্জাতীয় লতা, সুতরাং ইহার মাচা মজবুদ হওয়া আবশ্যক। সাধারণ জমিতে মাদা করিয়া বীজ বপন করিবে এবং যাবৎ বর্ষা, আগত না হয় তাবৎ গোড়ায় রস থাকা আবশ্যক। চৈত্র হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত বীজ বপন করিবার সময়। ইহার জন্য অন্য বিশেষ পাট্ নাই।

সুপক্ক ধুন্দুলের ছাল সদৃশ আবরণ স্নান বা গাত্রধাবনে ব্যবহৃত হয়। উক্ত জালতী দ্বারা গাত্র মর্দ্দন করিলে গাত্র পরিষ্কার হয় মর্দ্দনকালে আরামও অনুভুত হয়।

চিচিঙ্গে (Snkae gourd.)

চিচিঙ্গে লতানিয়া উদ্ভিদ সুতরাং মাচায় উঠাইয়া দিতে হয়। ইহার দুইটী জাতি আছে, তন্মধ্যে একটি তিক্ত, অপরটী ব্যবহারোপযোগী। তিক্ত জাতির নাম,—তিত্-চিচিঙ্গে। তিক্ত জাতির ফল প্রায় ছোট অর্থাৎ এক ফুট আন্দাজ লম্বা হয়, আর অন্য জাতির ফল বড়ও হয়, ছোটও হয়। বড় জাতির ফল দেড় হইতে দুই হাত লম্বা হয় এবং তাহার গাত্রে লম্বা ভাগে সাদা দাগ থাকে। বর্ষাকালে ইহার ফল। তিক্ত জাতীয় গাছ রাখিয়া কোন ফল নাই, কারণ উহার ফল ব্যবহারে আইসে না। মাচার নীচে ৪।৫ হাত অন্তর এক একটি মাদা করিয়া, ফাল্গুন মাসের শেষভাগ হইতে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ ভাগ পর্য্যন্ত বীজ বপন করিতে পারা যায় কিন্তু অগ্রে বপন করায় লাভ আছে। যাবৎ বর্ষা আগত না হয়, তাবৎ প্রতিদিন বা দুই এক দিবস অন্তর গাছের গোড়ায় জল দিবে। অগ্রে রোপিত গাছে বর্ষাকালেই ফল হয়, আর পশ্চাৎ রোপিত গাছে আশ্বিন-কার্ত্তিক পর্য্যন্ত ফল থাকে।

ঢেঁড়স (Lady's finger.)

ঢেঁড়সের ফল পল্ বা কোণবিশিষ্ট এবং ৪-ইঞ্চ হইতে ৯-ইঞ্চ পর্য্যন্ত লম্বা হয়। ক্ষেত্র মধ্যে দুই হাত অন্তর মাদা করিয়া তন্মধ্যে বীজ বপন করিতে হইবে। প্রতি মাদায় ২টী করিয়া বীজ দিবে এবং গাছ বাহির হইলে প্রতি মাদায় সতেজ একটি মাত্র গাছ রাখিয়া অপর চারা উঠাইয়া ফেলিবে অথবা হাপোরে চারা জন্মাইয়া চৌকায় বা পটীতে রোপণ করিলে চ'লতে পারে। মাদায় পুরাতন গোবর সার বা পড়া মাটি দিলে গাছ তেজাল হয় এবং প্রচুর ফল প্রদান করে। মাঘ হইতে আষাঢ়-শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত বীজ বপন করা যাইতে পারে। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে যে বীজ বপন করা যায়, তাহার গাছ অধিক বড় হইবার পূর্ব্বে ফল ধরিতে আরম্ভ হয়। এমন কি অনেক গাছ ৮।১০ অঙ্গুলি উচ্চ না হইতেই তাহার ফল ধরে। এই সকল ছোট গাছের ফুল ছিঁড়িয়া দেওয়া উচিত। এ সময়ের গাছে প্রচুর জলসেচন করা কর্ত্তব্য। বর্ষার গাছ ৫।৬ ফুট উচ্চ এবং ঝাড়াল হইয়া অনেক ফল প্রদান করে। ইহারা আষাঢ় মাস হইতে ফল প্রদান করিয়া থাকে।

ঢেঁড়স গাছের ত্বক হইতে এক প্রকার তন্তু বা পাট বাহির হয়, তাহা অতি শুভ্র, চিক্কণ ও শক্ত। যে প্রণালীতে পাট গাছ হইতে তন্তু বাহির করা যায় সেই উপায়ে ঢেঁড়স গাছ হইতেও পাট বাহির করিতে হয়। পাট তৈয়ার করিতে হইলে পাটের ন্যায় ঘনভাবে বীজ বুনিতে হয় নতুবা গাছে প্রশাখা জন্মে, ফলতঃ তাহা হইতে দীর্ঘ পাট উৎপন্ন হয় না। গাছে ফুল ধরিলে গাছ কাটিয়া পাটের ন্যায় কাচিয়া লইলেই তন্তু বাহির হয়।

মেস্তা বা লাল-অম্বরী (Red sorrel.)

ইহা মেস্তা-পাট নহে, ঢেঁড়স জাতীয় গাছ। বর্ষাকালে হাপোরে চারা উৎপন্ন করিয়া ক্ষেত্রে ২।৩ হাত ব্যবধানে তিন হাত অন্তর এক-একটি চারা রোপণ করিতে হয়। কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ হইতে মাঘমাস পর্য্যন্ত মেস্তা গাছ ফল প্রদান করে। ফলের আকার কস্তরা বা ঢেঁড়সের ন্যায়। ফলগুলি সুপক্ক হইলে সুন্দর সিন্দুরবর্ণ প্রাপ্ত হয়। আস্বাদ অম্লাক্ত। ইহাতে অম্বল ও নানাবিধ চাটনী প্রস্তুত হয়। সুপক্ক ফল সিদ্ধ করিয়া উহার শাঁস বাহির করিয়া সমপরিমাণ চিনি সমেত উত্তাপে অল্পক্ষণ পাক করিলে সুন্দর চাটনী বা Marmalade প্রস্তুত হয়। শিশি বা বোতল মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে দীর্ঘকাল ব্যবহার করিতে পারা যায়।

প্রতি বৎসর বীজ বপন করিয়া আবাদ করিতে হয়। আবাদের বিশেষ কিছু পাট নাই।

শজিনা (Horse-radish-tree)

শজিনা গাছের কচি পাতা ও ডগা, ফুল ও ফল ব্যঞ্জনের অন্তর্গত। শজিনার যে দীর্ঘ সুঁটী জন্মে তাহাকে শজনা-খাড়া কহে। শজনা গাছ একবার আজ্জাইলে দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া প্রতি বৎসর যথাসময়ে ফুল-ফল প্রদান করে।

সুপক্ক ফলের বীজ বুনিয়া চারা উৎপাদন করিতে হয়। সে চারা গাছ বড় হইয়া ফুল ফল প্রদান করিতে ২।৩ বৎসর সময় লাগে; কিন্তু ৩।৪ হাত দীর্ঘ আধ-পাকা ডাল পুতিলে এক বৎসর পরেই আওলাত মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে এবং এই উপায়েই সাধারণতঃ গাছ উৎ-

পাদিত হইয়া থাকে। পল্লীগ্রামে অনেকে শজনা ডাল সংগ্রহ করিয়া বেড়া রচনা করেন, ক্রমে সেই সকল ডাল জমিতে শিকড় বিস্তার করে এবং তাহা হইতে শাখা প্রশাখা উদ্গত হইয়া তাহাতেই ফুল-ফল জন্মে।

বৎসরের মধ্যে যে কোনও মাসে ডাল রোপণ করিতে পারা যায়, কিন্তু বসন্তকালই ডাল পুতিবার সময়। এই সময়ে পুরাতন গাছ ছাঁটিয়া দিতে হয়। সেই ছাঁটা ডাল যথা স্থানে স্থায়ীভাবে পুতিয়া দিয়া ডালের শেষাগ্রভাগে এক তাল গোবর-মিশ্রিত মাটির পিণ্ড দ্বারা ঢাকিয়া দিতে হয়। এরূপ করিলে উপরের কর্ত্তিত স্থান শুষ্ক হইতে পায় না, ফলতঃ শীঘ্রই গোড়ায় শিকড় নামে এবং কাণ্ডে শাখাপ্রশাখা নির্গত হয়।

কাণ্ড বা ডাল রোপণ করিতে হইলে আধ হাত হইতে এক হাত গভীর গর্ত্ত করিয়া তাহাতে কাণ্ডটী যত্নসহকারে পুতিয়া দিলে এক মাসের মধ্যে উহাতে শিকড় জন্মে। অতঃপর ইহার আর কোন পাট নাই।

বীজ হইতে চারা উৎপন্ন করিতে হইলে চৈত্র-বৈশাখ মাসে সুপক্ক ডাঁটার শুষ্ক বীজ লইয়া হাপোরে চারা উৎপন্ন করিতে হয়। চারাগুলি অল্পাধিক বড় হইয়া উঠিলে আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে যথাস্থানে স্থায়ীরূপে রোপণ করিবে।

ফল প্রদান শেষ হইলে শজনা গাছ প্রতি বৎসর ছাঁটিয়া দিতে হয়। গাছ ছাঁটিয়া দিলে বহু নূতন শাখাপ্রশাখা জন্মে, গাছ বিস্তৃত হয়, ফলও অধিক হয় এবং ডাঁটা সুতার হয়। সচরাচর ফাল্গুন-চৈত্র মাসেই গাছ ছাঁটা যায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

চুবড়ী-আলু (Yam)

চুবড়ী-আলুর কয়েকটী জাত আছে, কিন্তু তাহাদিগের আকার ভিন্ন আর কিছুতেই বিশেষ প্রভেদ দৃষ্ট হয় না। ইহাদিগের আকার গোল আলুর মত নিয়মিত নহে। কোনটী লম্বা, কোনটী গোল, কোনটী বাঁকা ইত্যাদি নানা আকারের হইয়া থাকে। জমির ভালরূপ পাট্ হইলে এক-একটি আলুর কন্দ বা মূল ৪।৫ সের অপেক্ষা বড় হয়।

চুবড়ী-আলুর জমি উচ্চ এবং দোঁ-আঁশ মৃত্তিকাবিশিষ্ট হওয়া আবশ্যক। মাটি একহাত হইতে দেড় হাত গভীর করিয়া কোদলাইয়া, পরে লাঙ্গল ও মই দ্বারা পূর্ণ করিতে হইবে। এই সকল কার্য্য মাঘ মাসের মধ্যে শেষ করিয়া মাঘ-ফাল্গুনে বীজ-আলু পুতিয়া দিতে হইবে।

সচরাচর কেহ ইহার আবদ করে না। আঁদাড়ে-জঙ্গলে স্বতঃই জন্মিয়া থাকে। চাষীরা তাহা হইতে আলু সংগ্রহ করিয়া বাজারে বিক্রয় করে। আবাদী-ফসলের ন্যায় আবাদ করিলে ক্রমে উহা উপাদেয় তরকারীরূপে গণ্য হইবে, সে বিষয়ে সংশয় নাই।

চুপড়ী-আলুর গাছ দীর্ঘপ্রসারী, ভারি ও স্থায়ী লতা। ক্ষেত্রের বেড়া বা পগারের নিকট স্থানে স্থানে মাদা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে বীজ বা গেঁড় পুতিয়া দিতে হয়। মাদার মাটি আলগা করিয়া তাহার সহিত বাগানের পুরাতন জঞ্জাল-চূর্ণ মিলিত করিয়া দিলে ভাল হয়। যাঁহাদিগের ক্ষেত বা বাগানের বেড়া বা পগার নাই তাঁহাদিগকে মাঠেই আবাদ করিতে হইবে। এরূপ স্থানে আবাদ করিতে হইলে মাদার আয়তন তিন

হাত বেষ্টন বা এক হাত ব্যাস ও এক হাত গভীর হওয়া উচিত। শ্রেণী-মধ্যে ৮।১০ হাত অন্তর মাদা করিয়া গেঁড় রোপণ করিতে হইবে গাছগুলি ঈষৎ বড় হইয়া উঠিলে প্রত্যেক মাদাকে কেন্দ্র করিয়া ঈষদ্দূরে তিন দিকে তিনটী খুঁটা পুতিয়া খুঁটার উপরিভাগ টানিয়া একত্রে বাঁধিয়া দিলে তাহাদিগের সুন্দর অবলম্বন হয়।

চীনদেশে যে প্রণালীতে ইহার আবাদ হয় সেই প্রণালীতে আমি ২।৩ বৎসর ইহার আবাদ করিয়াছিলাম। এতদর্থে ছোট আলুগুলি হাপোরে ঘন করিয়া রোপণ করিতে হয়। ১০।১৫ দিনের মধ্যে রোপিত বীজ হইতে ফেঁকড়ি উদ্গত হয়, তখন প্রয়োজনমত জলসেচন করিতে হয়। ফেঁকৃড়িগুলি ৪।৫ হাত দীর্ঘ হইলে, লতিকাগুলিকে খণ্ড-খণ্ড করিয়া কর্ত্তন করিতে হয়। ইহাদিগকে ‘কলম’ কহে। প্রত্যেক খণ্ড বা ‘কলমে’ তিনটী গ্রন্থি থাকা নিতান্ত আবশ্যক।

ইতিমধ্যে জমিতে তিন হাত অন্তর জুলি পরস্পরের মধ্যবর্ত্তী-স্থানে ভেলি নির্ম্মাণ করিয়া রাখিতে হইবে। কলম প্রস্তুত হইলে উল্লিখিত ভেলির মধ্যস্থলে ৪।৫ অঙ্গুলী চওড়া এবং ৪ অঙ্গুলী গভীর জুলি খোদিত করিয়া তাহার মধ্যে এক-হাত অন্তর-অন্তর এক-একটী কলম, উত্তরাভি-মুখে হেলাইয়া বা শায়িত করিয়া দিবে। উপরিভাগের শেষ গ্রন্থিটী মাটিতে ঢাকিয়া না যায় তাহা স্মরণ রাখিতে হইবে। ১০।১৫ দিনের মধ্যে কলমে ফেঁকৃড়ি উদ্গত হয়।

এক্ষণে দেখিতে হইবে ক্ষেত্র তৃণাদিতে না ঢাকিয়া যায়। প্রত্যেক গাছের একটী মাত্র কাণ্ড রাখিতে হইবে। মূল-লতা হইতে ফেঁকৃড়ি (laterl shoots) উদ্গত হইলে বা মুখরিত হইবার উপক্রম করিলে তাহাদিগকে ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। স্থূলতঃ, প্রত্যেক গাছে একটী মাত্র ফেঁকৃড়ীহীন কাণ্ড থাকিবে।

ফাল্গুন মাসে কোন হাপোরে কলমের জন্য গেঁড় রোপণ করিলে বৈশাখ মাসে কলম পাওয়া যায়। বৈশাখ মাসে অনর্থক বিলম্ব না করিয়া কলম রোপণ করিলে পৌষ-মাঘ মাসে আলু উঠাইতে পারা যায়।

অন্য প্রণালীতে আবাদ করিতে হইলে, যথারীতি জমি তৈয়ার করিয়া তিন হাত অন্তর জুলির উভয়পার্শ্বের মাটি তুলিয়া ভেলি তৈয়ার করা উচিত। মাটি যত ফুস্কো হইবে কন্দ তত বড় হইবে। মাটি হইলে সরাল কন্দের আকার বড় হয়, কন্দের শাঁস মোলায়েম হয়। এই জাতীয় আলুর পক্ষে বাগানের লতা-পাতা ও গোশালার পুরাতন মিশ্র-সার বিশেষ উপযোগী। অতঃপর ক্ষুদ্র বীজ-আলু পূর্ব্বাহ্নে মুকাইয়া লইয়া ভেলির মধ্যস্থলে সমশ্রেণীতে একহাত অন্তর রোপণ করিবে। গাছগুলি তিন হাতের অধিক দীর্ঘ হইতে না দিলে প্রত্যেক গাছ ঝাড় বাঁধিবে এবং দাঁড়া গাছ (standard) হইবে, ফলতঃ তাহাদিগের জন্য কোন অবলম্বনের প্রয়োজন হইবে না।

গাছের গোড়া সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিতে হইবে। বর্ষায় মাটি দৃঢ় হইয়া গেলে যো-মত মাটি আল্‌গা করিয়া দিতে হইবে।

চুপ্‌ড়ী আলুর ভিতর পিচ্ছিল লালার বাহুল্যহেতু অনেকে পছন্দ করেন না, কিন্তু তাহা দূর করিবার উপায়—আলুগুলিকে অগ্রে উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া আধঘণ্টা কাল ছাই মধ্যে রাখিয়া দিলে উক্ত লালা দূর হয়। অতঃপর তাহাকে যথাবিধি কুটিয়া রন্ধন করিতে হইবে।

রাঙ্গা-আলু (sweet potato)

রাঙ্গা-আলুর আকার লম্বা, মধ্যস্থল স্থূল এবং শেষাগ্রভাগদ্বয় শৃঙ্গের ন্যায় ক্রমসূক্ষ্ম হইয়া থাকে। ইহার ত্বকের বর্ণ লাল বা ঘোর গোলাপী

বলিয়া ইহার নাম রাঙ্গা-আলু হইয়াছে। রাঙ্গা-আলু সিদ্ধ করিলে মোমের ন্যায় কোমল হয়। ইহার স্বাদ মিষ্ট এবং গন্ধ মনোহর, কিন্তু ঈষৎ তীব্র।

রাঙ্গা-আলু লতানে ভূশায়ী উদ্ভিদ। ভূগর্ভ মধ্যে ইহার শিকড়ে যে কন্দ জন্মে তাহাই রাঙ্গা-আলু। আলুর জন্য যেরূপ হালকা মাটির আবশ্যক, রাঙ্গা-আলুর জন্যও অবিকল সেইরূপ মাটির প্রয়োজন। মাটি নিতান্ত বেলে না হয় অথচ হাল্‌কা হয়, এরূপ মাটি প্রশস্ত। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে ক্ষেত পাতিবার সময়। ইহার আবাদকল্পে পুরাতন গাছের লতা রোপণ করিতে হয়। লতার অভাব হইলে কন্দকে মুখরিত করিয়া রোপণ করা এ সময়ের আবাদের জন্য ডাঙ্গা-জমির আবশ্যক। আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে নাবাল জমিতে কিম্বা নদীর চর বা সৈকতে আবাদ করিতে পারা যায়।

রোপণের কাল সমাগতপ্রায় হইলে বিলম্ব না করিয়া শীঘ্র শীঘ্র জমি তৈয়ার করিতে হইবে। রাঙ্গালু সদৃশ কন্দ-জাতীয় উদ্ভিদের জন্য জমি কর্ষণ গভীর করিতে হইবে। বিঘা প্রতি ৮।১০ বার কর্ষণ ও মৃত্তিকা চূর্ণন যেমন প্রয়োজন, মাটিতে সার সংযোজিত করাও সেইরূপ প্রয়োজন। অতঃপর জ্যৈষ্ঠ মাসের ভিতরে চৌকার মধ্যে দীর্ঘ-ভাগে ৭।৮ ইঞ্চ গভীর জুলির মধ্যে পুরাতন গাছের পরিপুষ্ট লতিকা শায়িত করিয়া দিতে হয়। কন্দ রোপণ করিতে হইলে জুলির মধ্যে ২।৩ হাত অন্তর এক এক খণ্ড মুখরিত কন্দ শায়িত করিয়া মাটি চাপা দিতে হইবে। জুলি পরস্পরের ব্যবধান ২॥০ বা ৩ হাত হইলেই চলিবে।

লতা বা কন্দ, যাহাই রোপিত হউক, জুল ভরাট করিবার সময় ৭।৮ অঙ্গুলি পরিমাণ স্থূল করিয়া মাটি দিলে ভাল হয়। চারা সকল ভূপৃষ্ঠ ছাড়িয়া উঠিলে জুলির অবশিষ্ট অংশ ভরাট করিয়া দেওয়া উচিত। বর্ষা হইলে জুলির মাটি বসিয়া যায় এবং জুলিতে জল সঞ্চিত হয়। যাহাতে

জুলিতে জল দাঁড়াইতে না পারে এই উদ্দেশ্যে পার্শ্বদেশ হইতে মাটি তুলিয়া গাছের গোড়া ঢাকিয়া সমগ্র জুলি উচ্চ করিয়া দিতে হইবে।

রাঙ্গা-আলুর ক্ষেত পাতনে আর একটি উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে। লতিকা কিম্বা কন্দ প্রয়োজনারূপ পরিমাণ সংগ্রহ করিতে না পারিলে লতিকার পুরাতন দণ্ড সকলকে খণ্ড খণ্ড করিয়া জুলির মধ্যে বসাইলে চলে। খণ্ডসমূহের প্রত্যেকটিতে ৩টি গ্রন্থি থাকা আবশ্যক। এস্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সেই লতা খণ্ড বা কলমগুলিকে উত্তর পূর্ব্বদিকে ঈষৎ হেলাইয়া পুতিয়া দেওয়া আবশ্যক, কারণ তাহা হইলে লতার উপরিভাগে রৌদ্রের উত্তাপ তত অধিক লাগিতে পায় না। এতদ্ব্যতীত, গাছ হেলাইয়া পুতিলে শীঘ্র শীঘ্রই শিকড় জন্মিয়া শাখাপ্রশাখা বিশিষ্ট হয়। ক্ষেত্র না জলময় হয়, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা উচিত।

গ্রীষ্মের আবাদী ক্ষেত্রের কন্দ কাত্তিক মাস হইতেই তুলিতে পারা যায় কিন্তু অগ্রহায়ণ বা পৌষ মাস পর্য্যন্ত মাটিতে থাকিতে পাইলে কন্দগুলি বড়, পরিপুষ্ট ও সমধিক মিষ্ট হয়। আশ্বিন-কার্ত্তিকে রোপিত ক্ষেত্রের কন্দ মাঘ-ফাল্গুন মাসে তুলিতে পারা যায়।

রাঙ্গালু সাতিশয় পুষ্টিকর সামগ্রী। বাঙ্গালা দেশের ন্যায় দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত দেশে ইহার আবাদ বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি হইলে সামান্য দুর্ভিক্ষে গরীব দুঃখী লোকে ইহা খাইয়া প্রাণধারণ করিতে পারে। ইহা কাঁচ খাইতে মন্দ লাগে না।

শঙ্করকন্দ-আলু (Batatas Edulis)

শঙ্করকন্দ-আলু, রাঙ্গা-আলু অপেক্ষা বড় হয়। ইহার স্বাদ মিষ্ট, কি পূর্ব্বোক্ত আলুর ন্যায় সুস্বাদ বা সুঘ্রাণবিশিষ্ট নহে, এজন্য বাঙ্গালীর হেঁসে

ইহার তাদৃশ আদর নাই, কিন্তু রাঙা-আলুর ন্যায় ইহা পুষ্টিকর আনাজ। হিন্দুস্থানবাসীগণের মধ্যে যথেষ্ট ব্যবহার আছে।

শঙ্করকন্দ আলুর বর্ণ সাদাটে। ইহার চাষ ও আবাদ-প্রণালী অবিকল রাঙ্গা-আলুর ন্যায়। অগ্রহায়ণ মাস হইতে ইহা ব্যবহারোপযোগী হয়। সেই সময় ইহাকে মাটি হইতে তুলিয়া লইতে হইবে।

ইতিপূর্ব্বে যে কয়েক জাতীয় আলুর কথা বলা হইয়াছে, তাহা ব্যতীত আরও অনেক প্রকার জঙ্গলী আলু জঙ্গলে জন্মিয়া থাকে, অরণ্যবাসী স্থানীয় লোকেরা তাহা ব্যবহার করিয়া থাকে।

কিছুদিন পূর্ব্বে গ্রন্থকার উক্ত আলু হইতে পালো প্রস্তুত করিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ইহা পুষ্টকর। পালো প্রস্তুত করিলে আলু অপেক্ষা লঘু হয়। ইহার গুণাগুণ পরীক্ষা করিবার জন্য কোন কোন ডাক্তারকে উক্ত পালো দেওয়া হয়। তাঁহারা বলেন যে রুগ্ন ব্যক্তি ও শিশুদিগের পক্ষে উক্ত পালো উত্তম খাদ্য। পালো প্রস্তুত করিবার প্রণালী নিম্নে লিখিত হইল :—

কাঁচা পালো।—রাঙ্গালু ও শঙ্করকন্দ আলু—উভয় প্রকার কন্দ হইতেই পালো প্রস্তুত করিতে পারা যায়। কতগুলিকে পরিষ্কার জলে উত্তমরূপে চৌত করিয়া পাতলা চাকা চাকা করিয়া কাটিয়া রৌদ্রে ২।৩ দিবস উত্তমরূপে শুষ্ক করিবার পর, হামানদিস্তা, ঢেঁকি বা জাঁতায় কুট্টন পূর্ব্বক চূর্ণ করিতে হয়। পরে ছাঁকনীতে ছাঁকিয়া লইলেই কাঁচা পালো হইল। সাগু বা বার্লির ন্যায় জলে সুসিদ্ধ করিলেই তাহা ব্যবহারোপযোগী হয়।

পাকা বা সিদ্ধ পালো। বিধৌত কন্দগুলি জলে উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া ছাল বা খোসা ছাড়াইয়া ফেলিতে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে কুট্টন করিলেই পাকা

পালো প্রস্তুত হইল। সিদ্ধ করিবার পর হইতে কুট্টনকাল পর্য্যন্ত তাবৎ কার্য্য ক্ষিপ্রতাসহকারে করিতে হয়। একদিন মধ্যে সকল প্রক্রিয়া সমাহিত না হইলে পালোতে অম্লগন্ধের সঞ্চার হয়। সিদ্ধ পালো ঈষৎ গরম জলে গুলিয়া ব্যবহার করা চলে। ইহার সহিত দুগ্ধ চিনি প্রভৃতি মিশ্রিত করিলে উত্তম হালুয়া প্রস্তুত হয়।

মানক বা মানকচু (Colocasia Indica)

মানকচু এ দেশের একটী উপাদেয় তরকারী, কিন্তু দুষ্ট মানকচু ভক্ষণকালে মুখে কণ্ডুতি হয় এবং ওষ্ঠাধার হইতে জিহ্বা ও তালু পর্য্যন্ত কুট-কুট করে। এমন মান ও ওল ভক্ষণ করিয়াছি, যাহার কণ্ডুতি যন্ত্রণায় দ্বাদশ ঘণ্টার অধিক কাল কষ্ট পাইতে হইয়াছে। প্রবীণ গ্রন্থকারের উপদেশ,—মান বা ওল মুখে 'লাগিলে' বিজ্ঞের মত চুপ করিয়া থাকা উচিত এবং কাহারও নিকট ব্যক্ত করা উচিত নহে। সকল মানই যে কণ্ডুরা তাহা নহে, কারণ এরূপ মানও যথেষ্ট আছে যাহা ভাতে বা ব্যঞ্জনে অতি উপাদেয় ও মোলায়েম হয়)

মানক বা মানকচু কন্দজ হইতে উদ্ভিদ, ইহার কন্দই ভক্ষণীয়। কোন কোন জেলায় মানক বিশেষের পত্র-বৃন্ত ও পত্র ব্যঞ্জনে নিয়োজিত হইয়া থাকে। জমির অবস্থান মাটির প্রকৃতি ও আবাদ পরিচর্য্যা এতত্রয়ের দোষে বা গুণে মানের সাদের তারতম্য হইয়া থাকে। নাবাল, ভিজা ও আওলা জমিতে আবাদ করিলে নির্দ্দোষ ও উত্তম জাতীয় মানক ও বিকৃত বিস্বাদ, তন্তুময় ও কণ্ডুরা হইয়া পড়ে। আবার উচ্চ, শুষ্ক ও উন্মুক্ত স্থানে আবাদিত হইলে দুরন্ত মানক দোষশূন্য ও লোকপ্রিয় হইয়া থাকে। ফলতঃ মানের আবাদের জন্য উচ্চ জমি, দোয়াঁশ ও অবাধ রৌদ্রের

প্রয়োজন। অন্যপ্রকার জমিতে আবাদ করিলে মানকন্দ বৃদ্ধিশীল ও নরম হইতে পারে, কিন্তু তাহা শিক্‌ড়ে পান্‌সে কিম্বা কণ্ডুরা বা চুলকণা দায়ক হইবার আশঙ্কা থাকে।

আবাদের জন্য 'মুখী' কিম্বা চারা রোপণ করিতে হয়। ক্ষেত্র হইতে মানক সংগৃহীত হইবার পর ৩।৪ সপ্তাহ মধ্যে সেখানে বহু চারা জন্মে। ৩।৪টী পত্রবিশিষ্ট চারা সহজলভ্য হইলে এবং তাহা সংগ্রহ করিতে পারিলে মন্দ হয় না। 'মুখী' বা চারার অভাবে মান-কন্দকে চক্রাকারে খণ্ড খণ্ড করিয়া প্রত্যেক খণ্ডকে ৩।৪ টুক্‌রা করিলে চলিতে পারে। সকল টুক্‌রার বহির্ভাগে বা ত্বকে একটী 'চোক' থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। উক্ত চোকই ভাবী উদ্ভিদ্,—ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে। মুখী বা চোক হইতে কি উপায়ে চারা উৎপাদন করিতে হয় তাহা প্রস্তাবান্তরে বলিয়াছি। মাঘ-ফাল্গুন মাসে মুখী বা চোকদিগকে জাগ্ দিয়া কিম্বা হাপোরে রোপণ করিয়া মুখাইয়া লইতে হইবে। অতঃপর ভূমিতে স্থায়ীভাবে রোপণ করিতে হয়।

স্থান, জমি, মৃত্তিকা এবং মানের জাতিত্ব অনুসারে কোন মান দূরে-দূরে, কোন মান ঘন-ঘন রোপণ করিতে হয় এবং তাহা উৎপাদকের বিচার্য্য। কিন্তু পূর্ব্ব-অভিজ্ঞতা না থাকিলে এক হাত অন্তর সারিতে পৌনে এক হাত হইতে দেড় হাত অন্তর চারা রোপণ করিতে পারা যায়।—মানকন্দ ভূগর্ভে প্রবেশ করে না, উপরিভাগ বৃদ্ধি পায় এবং কন্দের গাত্রের চারিদিক হইতে শিকড় সকল উদ্গত হইয়া ভূমিকে যেন ধরিয়া থাকে ফলতঃ কন্দ ভূশায়ী হইতে পায় না। কন্দ যত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে, ততই তাহাকে ঢাকিয়া দিতে হয়। কন্দ ঢাকিবার জন্য কাঠের ছাই উত্তম উপকরণ, পার্শ্বদেশস্থিত অর্থাৎ শ্রেণী পরস্পর মধ্যবর্ত্তী স্থানের মাটি ব্যবহার করিতে পারা যায়। মাটি বা ছাই

দ্বারা কন্দ ঢাকিবার অন্যতম উদ্দেশ্য, কন্দের নিম্নদেশ হইতে উদ্ভিদের বল সঞ্চারিত হয়, ফলতঃ বৃদ্ধি অধিক হয়।

মান গাছ অতিশয় বৃদ্ধিশীল হইলে কন্দের গাত্রস্থ শিকড় অল্পাধিক কাটিয়া দেওয়া উচিত নতুবা পত্রে সংখ্যা ও আকার অত্যধিক বৃদ্ধি পায়, কন্দ শীর্ণ হয়।

মানক দুই-তিন বৎসর ক্ষেতে থাকিতে পাইলে কন্দ সকল দীর্ঘ ও স্থূল হইবার অবসর পায়। মানকের আবাদ করিয়া ২।৩ বৎসর অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন হয় না। মাঘ মাসের শেষভাগ হইতে প্রত্যেক তিনটী গাছের মধ্যের গাছটী তুলিয়া লইয়া, সেই স্থানে একটী চারা রোপণ করিলে এই চারা দ্বিতীয় বৎসর ব্যবহারোপযোগী হয়। অতঃপর দ্বিতীয় বৎসর, প্রথম বৎসরের রোপিত গাছের কন্দ বৃহত্তর হইয়া থাকে এবং তখন তাহা উঠাইয়া লইলে বড় কন্দ পাওয়া যায়। এইরূপে প্রতি বৎসর কন্দ উত্তোলন এবং খালি স্থানে নূতন চারা রোপণ করিলে একই ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল আবাদ হইতে পারে, কিন্তু এ স্থলে বক্তব্য এই যে, এই স্থানে সমজাতীয় গাছ দীর্ঘ থাকিলে, তথায় সে জাতীয় গাছ রোপণ করা উচিত নহে, কিন্তু উদ্যান-কাণ্ডে তাহা অপ্রচলিত নহে; কারণ উদ্যান-কাণ্ডের সকল আবাদই কৃত্রিমতার উপর নির্ভরপর। ক্ষেত্রে সারপ্রদান কৃত্রিমতার প্রধান অঙ্গ। সুতরাং যে স্থান হইতে কন্দ উত্তোলন করিয়া পুনরায় নূতন চারা রোপণ করিতে হয়, তথায় সার সংযোজিত করা একান্তই কর্ত্তব্য।

এইরূপে যে সকল আসন শূন্য হয়, তথায় চারা রোপণ না করিলেও চলিতে পারে। যে কন্দটী উত্তোলিত হয়, তাহাদের শিরোভাগ হইতে পত্রগুলি কাটিয়া রোপণ করিলে কার্য্য আরও সহজ হয়।

কন্দ সকল দীর্ঘকাল জমিতে থাকিলে নিম্নাংশ বিকৃতাকার হইয়া

যায়, ফলতঃ তাহা ব্যবহারে আসে না, এই জন্য কোন কন্দ তিন বৎসরের অধিককাল ক্ষেত্রে রাখা উচিত নহে। কন্দজ ফসল লাভজনক। তরকারিরূপে উপাদেয় ও পুষ্টিকর এবং অনেক রোগে, বিশেষতঃ শোথ রোগে—মান-মণ্ড অতিশয় ফলপ্রদ।

শোলা-কচু (colocasia sornicats)

স্থানবিশেষে ইহা বাঁশপোল-কচু নামে অভিহিত। দো-আঁশ মাটিতে ইহা ভাল জন্মে। মাঘ মাসে জমি উত্তমরূপে চষিয়া ও তাহাতে মই দিয়া মাটি চূর্ণ করিয়া ফাল্গুন মাসে আধ হাত বা তিনপোয়া ব্যবধানে চারা বা গেঁড় পুতিয়া দিবে। ইহার আবাদের কোন বিশেষ পাট নাই, তবে মধ্যে মধ্যে জমি কোপাইয়া দিবে। হুগলী, বর্দ্ধমান, মুরশিদাবাদ প্রভৃতি অনেক জেলায় ইহার আবাদ হইয়া থাকে। শ্রাবণ মাস হইতে কচু তুলিয়া ব্যবহার করা যাইতে পারে।

পঞ্চমুখী-কচু (Colocasia sp.)

ময়নমনসিং জেলায় এবং আসামের নানা স্থানে পঞ্চমুখী কচু যথেষ্ট জন্মে। উক্ত কচুর পার্শ্বদেশে স্বতন্ত্র 'মুখ' উদ্গত হইয়া যে কচু জন্মে তাহাদিগের নিম্নাংশ মূল-কচুর সহিত একত্রেই থাকে। আসামের অনেক হাটে বাজারে যথেষ্ট পরিমাণে ইহার আমদানী হয়। ইহার শাঁশ জেলা ক্ষীরের ন্যায় অতি কোমল, স্বাদও তেমনি উপাদেয়।

আসাম প্রদেশে ইহার আবাদের যথেষ্ট বা পাট নাই, সুতরাং অতি সহজে জন্মে। তেজপুর হইতে নাগা-পাহাড় পর্য্যন্ত সকল স্থানেই এই পঞ্চমুখী-কচু যথেষ্ট পরিমাণে জন্মিতে দেখা যায়।

মাঘ-ফাল্গুন মাসে কচুর চোক এবং শিরোভাগ কাটিয়া ঈষৎ ছায়াযুক্ত স্থানে পাত বা হাপোর দিলে ১৫।২০ দিবসের মধ্যে তাহা অঙ্কুরিত হয়, অতঃপর তাহাতে পাতা দেখা দেয়। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে দুই-এক পসলা বৃষ্টি হইলেই ক্ষেতে বা চৌকায় এক-হাত অন্তর রোপণ করিতে হইবে। গাছের গোড়ায় উদ্ভিজ্জ-সার ও ছাই দিলে বিশেষ উপকার হয়। প্রথম বৎসর অপেক্ষা দ্বিতীয় বৎসরে শস্য অপেক্ষাকৃত অধিক সু-তার হয়। অগ্রহায়ণ হইতে ফাল্গুনমাস পর্য্যন্ত কচু তুলিবার সময়।

পঞ্চমুখী না হইলেও মান্দ্রাজ প্রদেশে এক জাতীয় কচু জন্মে তাহার কোমলতাও অতি সুন্দর অতি মোলায়েম।

মুকী-কচু (Alocasia sp.)

মুকী-কচু বাঙ্গালায় নগণ্য তরকারীরূপে পরিগণিত ছিল কিন্তু এক্ষণে যেরূপ দিনকাল পড়িয়াছে, সকল তরকারী যেরূপ মহার্ঘ্য ও দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে তাহাতে মুকী-কচুকে আর অবহেলা করা চলে না। মুকী-কচুর আকার তাদৃশ বড় না হইলেও নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে। বিভিন্ন আনাজের সহিত মিশ্রিত ভাবে রন্ধন করিলে উত্তম তরকারী হয়।

মাঘ মাসের প্রথম ভাগে জমি তৈয়ার করিয়া এক হাত অন্তর আল বা দাঁড়া করিয়া, সেই দাঁড়া বা আলের উপর এক হাত ব্যবধানে মুকীগুলিকে পুঁতিয়া দিতে হইবে। এই সময়েই অর্থাৎ পশ্চিমে বাতাস বহিলেই মুকীগুলি মুখাইয়া উঠে। মুকীগুলিকে বপনাগ্রে মুকাইয়া লইলে আরও ভাল হয়।

মুকাইবার জন্য মুকীগুলিকে কোন স্থানে শুষ্ক মাটিতে কিম্বা চাঙ্গারি

বা বাক্সের মধ্যে প্রসারিত করিয়া বিচালী চাপা দিয়া রাখিলে ৮।১০ দিন মধ্যে মুখীগুলির চোক ফুটে। এইরূপ অবস্থাপন্ন হইলে রোপণের সময় হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

নিম্নতল রসা জমিতে মুকীর আবাদে জল সেচনের প্রয়োজন হয় না; কিন্তু উচ্চতল ও পাহাড়ী দেশ বা জেলায় মুকী ক্ষেতে জলসেচন অবশ্য প্রয়োজনীয়। বর্ষা সমাগত হইলে দাঁড়াগুলি মাটি দিয়া মেরামত করিয়া দিতে হইবে নতুবা বর্ষা প্রকোপে মাটী সরিয়া বা ধুইয়া বাহির হইয়া পড়ে, তাহাতে গাছের ক্ষতি হয়। আটাল জমির মুকীর পটিতে গোয়ালের আবর্জ্জনা বা ছাই দিতে পারিলে ভাল হয়।

উক্ত-কচুর পটিতে তৃণ-জঙ্গলাদি আদৌ না জন্মিতে পারে সে বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

আষাঢ়-শ্রাবণ মাস হইতে উহাদিগকে উৎপাটিত করিতে পারা যায়, কিন্তু তখন কন্দগুলি নিতান্ত ছোট থাকে। কার্ত্তিক মাসই উৎপাটনের উত্তম সময়। দীর্ঘকাল জমিতে থাকিতে পাইলে কন্দ বড় হয়, পরিপুষ্ট হয়, সু-তার হয়।

পরবর্ত্তী আবাদের কয়েক পাঁতি গাছ রক্ষিত হইলে মন্দ হয় না কারণ আগত প্রায় পৌষমাসে সব গাছ মরিয়া যায় এবং যথাস্থানে থাকিয়া মাঘ-ফাল্গুনের মুখরিত হইবার প্রয়াস পায়। এই সময়েই জমি হইতে মুকী তুলিয়া নূতন পটিতে রোপণ করিলে চলিতে পারে।

ইহার বিস্তৃত আবাদ লাভের বিষয়। ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বে মুকী-কচু বাজারে অতি অল্পই আমদানী হইত কিন্তু এক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা ঈষৎ অধিক আমদানী হয়, কিন্তু পরিমাণ অল্প এবং মূল্য অত্যধিক,—প্রতি সের মুকী ৵০ আনা হইতে ৶০ আনাতে, কোন কোন সময় ।০ আনাতে বিক্রীত হয়। পূর্ব্বে আমুর মূল্য এত অধিক ছিল না।

ওল (Telinga potato.)

ওলের আদিম উৎপত্তিস্থান সিংহল ও মলকস্ দ্বীপ-পুঞ্জ। কিন্তু এক্ষণে ভারতবর্ষের অনেক স্থানে ইহার আবাদ হয়। বোম্বাই ও মান্দ্রাজ অঞ্চলে ইহার প্রভূত আবাদ হয়। হাবড়ার সন্নিকটে সাঁতরাগাছি ওলের জন্য বিখ্যাত; কিন্তু তাহা অপেক্ষা বিখ্যাত রসনাতৃপ্তিকর— মান্দ্রাজ ও মহীশূরের ওল। এখানকার ওল অতি সুস্বাদ হয়। ওল অতি সারবান্ ও পুষ্টিকর তরকারী। ভাল জাতীয় ওল অতি উপাদেয় তরকারী; কিন্তু অন্য এক জাতীয় দুষ্ট ওল আছে, খাইলে মুখ চুলকাইয়া থাকে। স্থানীয় মাটীর দোষে অনেক সময়ে ভাল ওল খারাপ হইয়া যায়। ভালরূপে আবাদ করিলে এক-একটী ওল ৪।৫ সের ওজনের হয়। ওলের গাত্রে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলুর ন্যায় 'মুখী' জন্মে তাহাই বীজের জন্য ব্যবহৃত হয়।

ইহার মাটি দো-আঁশ, হাল্কা, জমি উচ্চ ও গভীর হওয়া আবশ্যক। পৌষ মাসের প্রথমভাগে অতি উত্তমরূপে কোদলাইয়া মাটি চূর্ণ করিবে। পরে, মাঘ মাসের শেষ ভাগে ক্ষেত্রমধ্যে এক বা দেড় বিতস্তি অন্তর একটী একটী 'মুখী' রোপণ করিবে। যাবৎ না 'মুখী' সমূহ অঙ্কুরিত হয় তাবৎ মধ্যে মধ্যে জলসেচন করিবে। অঙ্কুরিত 'মুখী' রোপণ করিতে পারিলে আরও ভাল হয়। মুখী অঙ্কুরিত করিবার উপায় স্থানান্তরে লিখিত হইয়াছে। তৎপরে অন্য কোন পাট নাই, কেবল মধ্যে মধ্যে গাছের গোড়া পরিষ্কার করিয়া দেওয়া আবশ্যক। জমিতে পুরা এক বৎসর হইতে দুই বৎসর কাল থাকিতে পাইলে ওলের আকার বড় হয়, কিন্তু অনেকেই শ্রাবণ-ভাদ্র মাস হইতে ব্যবহার করেন। রসা-জমিতে যে ওল জন্মে তাহাতে ছিব্ড়া হয় এবং তাহা খাইলে প্রায় মুখ চুলকাইয়া থাকে।

শীতকালে ওলের গাছ নিস্তেজ হইয়া ক্রমশঃ মরিয়া যায় এবং চৈত্র-বৈশাখ মাসে পুনরায় সেই সকল গাছের গোড়ায় আবার নূতন চারা উদ্গত হয়। সেই সকল চারা পুনরায় রোপণ করিতে পারা যায়। বিঘা প্রতি ১০০ হইতে ২৫০ মণ পর্য্যন্ত ওল উৎপন্ন হয়-এবং প্রতি মণ এক টাকা হিসাবে সচরাচর বিক্রীত হইয়া থাকে।

মাদ্রাজ ও মহীশূরের প্রদেশদ্বয়ে উৎকৃষ্ট ওল উৎপন্ন হইয়া থাকে। মহীশূরে অবস্থানকালে প্রায়ই ওল ব্যবহার করিতাম। বাল্যকালে একবার সুপ্রসিদ্ধ ওল ভক্ষণ করিয়া সারাদিন মুখের যন্ত্রণায় অধীর হইয়াছিলাম—সেই অবধি আমি ওল ভক্ষণ দূরের কথা, উহা দেখিলেই আমার ভয় হইত। যাহা হউক মহীশূর প্রদেশে এবং মাদ্রাজে যে ওল খাইয়াছি সেরূপ ওল কুত্রাপি জন্মে না বলিয়া মনে হয়। সুবিধা থাকিলে সেই অঞ্চল হইতে বীজ-ওল বা ‘মুখী’ আনাইয়া আবাদ করিলে ভাল হয়। সুসিদ্ধ ওল ক্ষীরের ন্যায় কোমল ও নির্দ্দোষ হয়।

নানা দেশ হইতে উৎকৃষ্ট ফলফুল ও তরিতরকারির বীজ, ফল বা চারা আনাইয়া দেশ মধ্যে প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করা উচিত। ইহাতে যে কেবল নিজেরই লাভ হয় তাহা নহে, সেই সকল সামগ্রী নিজ ক্ষেত্রে উৎপন্ন করিয়া আবাদের জন্য বিতরণ বা বিক্রয় করিলে প্রকৃত স্বদেশী হইতে পারা যায় বলিয়া আমার মনে হয়। সে চেষ্টা আমাদের কবে হইবে?

চতুর্থ অধ্যায়

তরমুজ (Water melon)

স্থানীয় জল-বায়ুর উপর তরমুজের গুণাগুণ নির্ভর করে এবং উহাকে স্থানীয় ফল বলিলেও বলা যায়। জমি ও আবহাওয়ার তারতম্যে কোথাও ফল ভাল, সুমিষ্ট ও রসাল হয়, আবার কোথাও জঘন্য হইয়া থাকে। ভাল জাতীয় তরমুজ অন্য দেশে গিয়া নিকৃষ্টতা প্রাপ্ত হইতে শুনা গিয়াছে এবং পরীক্ষা করিয়াও তাহা দেখা গিয়াছে। আমি নানা স্থান হইতে ভাল জাতীয় তরমুজের বীজ আনয়ন করিয়া আবাদ করিয়াছিলাম, কিন্তু যথাকার বীজ তথাকার ফলের সমতুল্য ফল উৎপন্ন করিতে পারা যায় নাই। তাই বলিয়া ইহার আবাদের বিষয়ে অবহেলা করা কোনমতে উচিত নহে। চর ও পলি-পড়া জমিতে তরমুজ ভালরূপ জন্মে। বর্ষাকালে নদীর জল নামিয়া গেলে যে চর দেখা যায়, তাহা অতিশয় সারবান। অনেক জমিতে বর্ষাকালে জল দাঁড়ায়, কিন্তু সে সকল জমিও কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে শুষ্ক হইয়া যায়। এরূপ জমি তরমুজের পক্ষে ভাল। অতিরিক্ত এঁটেল বা ঠাণ্ডা জমিতে তরমুজ ভাল জন্মে না। সকলের পক্ষে উপরোক্ত প্রকারের জমি পাওয়া সম্ভব নহে, তবে দেখিতে হইবে যে, জমি নিতান্ত এঁটেল, ঠাণ্ডা বা ভিজা না হয়। কার্ত্তিক মাসে জমির জল শুষ্ক হইয়া গেলে উত্তমরূপে ক্ষেত্র তৈয়ার করিয়া ৪।৫ হাত ব্যবধানে মাদা করিয়া প্রত্যেক মাদায় ২।৩টী বীজ পুতিতে হয়। এস্থলে বক্তব্য এই যে, তরমুজ আবাদের বিশেষ পাট আছে। মাদাটীর জন্য দুই

কতক মাটি ফেলিয়া দিয়া বা উপরে আলি বাঁধিয়া দিয়া মাদার ভিতরের মাটির সহিত পলি মাটি বা পাঁক বা অন্য সার মাটি মিশাইয়া লইয়া সমগ্র মাটিকে উত্তমরূপে চাপিয়া দিতে হয়। অতঃপর বীজ পুতিবার পূর্ব্ব দিবস গর্ত্ত হইতে অর্দ্ধেক মাটি উঠাইয়া পার্শ্বে রাখিয়া দিতে হয় এবং গর্ত্ত মধ্যে দুই-এক কলসী জল ঢালিয়া দিতে হয়। পর দিবস জল শোষিত হইয়া যো হইলে গর্ত্তের মাটির উপরিভাগ ঈষৎ সঞ্চালিত করিয়া বীজ পুতিতে হইবে। কয়েকদিন পরে গাছ জন্মিবে এবং ক্রমশঃ বড় হইতে থাকিবে। তখন, উপরিস্থ সঞ্চিত মাটি গর্ত্তের ভিতর দিয়া গাছের কাণ্ডাংশ যতদূর সম্ভব—ঢাকিয়া দিবে। পুনরায় চারাগুলি ক্রমশঃ আরও বড় হইয়া উঠিলে আর একবার মাটি দিবে। এইরূপে ২।৩ বার মাটি দিলে গাছগুলি ভূপৃষ্ঠোপরি আসিয়া পৌছিবে, তখন আর কিছু করিতে হইবে না। আমি নানাবিধ উপায় অবলম্বনেও তরমুজের আবাদ করিয়া আশানুরূপ ফল না পাইয়া, ইহার আবাদের গুহ্যতত্ত্ব জ্ঞাত হইবার জন্য রাজনগরে থাকিতে বিশেষ চেষ্টা করি। পরে তথা হইতে ৭।৮ ক্রোশ দূরে অর্থাৎ যেখানে তরমুজের প্রভূত আবাদ হয় তথা হইতে উক্ত উপায় শিক্ষার্থ লোক পাঠাইয়া দিই। সেই বৎসর হইতে উল্লিখিত উপায়ে যথেষ্ট উপকার পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে অনেক ঝঞ্চট আছে, কিন্তু কোন্ কাজ বিনা ঝঞ্চটে সম্পন্ন হয় বা মনের মত ফলপ্রদ হয়? মৎস্য শিকার করিতে গেলে কাদা মাখিতে হয়, এ কথাটী স্মরণ রাখা উচিত। এস্থলে [illegible] একটি গুহ্য তত্ত্ব আছে। লতিকা যাহাতে দীর্ঘে বাড়িতে পারে [illegible] বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে! এতদর্থে লতিকার মুখাগ্রভাগ কোন [illegible] না পায়—এজন্য তাহাদিগকে পথ ছাড়িয়া দিতে হইবে। আর [illegible] প্রত্যেক গাছে ২।৩টির অধিক লতা থাকিতে দিবে না, উপর [illegible] কয়টী মূল-লতিকার আদৌ ফেঁকড়ি জন্মিতে দিবে না। অত্যা[illegible]

সংখ্যক ফল জন্মিলে, কয়েকটী মাত্র রাখিয়া অপরগুলি ভাঙ্গিয়া দিতে হয়।

লাউয়ের ন্যায় ভিজা খড়ের মধ্যে বীজ বাঁধিয়া মৃত্তিকামধ্যে পুতিয়া অঙ্কুরিত করিয়া লইলে ভাল হয়, অন্যথা সেই মাদাতেই বীজ পুতিয়া দেওয়া যাইতে পারে। অঙ্কুরিত বীজ পুতিতে হইলে মাদার মাটি উত্তমরূপে চূর্ণ ও হাল্‌কা করিয়া, তন্মধ্যে বীজগুলিতে নিক্ষেপ করতঃ সাবধানে মাটি চাপা দিতে হইবে। অতঃপর সেই অঙ্কুরের উপরে পাতলা ভাবে হাল্‌কা মাটি চাপা দিবে এবং দুই-এক দিন কোন পাতা দ্বারা মাদাগুলি ঢাকিয়া রাখিবে। সদ্য অর্থাৎ অনঙ্কুরিত বীজ বপন করিতে হইলে এত অধিক কষ্ট করিতে হয় না সত্য, তবে তাহাতে বীজ মাদা মধ্যে ২।৩টী হিসাবে পুতিয়া দিবে এবং আবশ্যকমত তাহাতে মাটি চাপা দিবে ও জলসেচন করিবে। এই সময়ে মাটিতে অধিক রস থাকে না এবং রৌদ্রের উত্তাপ অধিক হয়, এজন্য মাদায় প্রতিদিন সায়ংকালে উত্তমরূপে জলসেচন করিবে। ভাল বীজ পাঁচ-ছয় দিনের মধ্যে অঙ্কুরিত হয়, তখন হইতে ইহার কোন মতে না মাটিতে রসের অভাব হয়। গাছ সকল ভূমিশায়ী হইয়া লতাইতে আরম্ভ করিলে আর উহাদিগের জলের প্রয়োজন হয় না।

জোনাকি-পোকা (Red spider) ইহার পরম শত্রু। গাছ অঙ্কু-[illegible] পোকা আসিয়া জুটে এবং মনে হয় যেন বীজের অঙ্কুরোদগমের সঙ্গে [illegible] মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। ইহাদিগের কয়েকটীতে এক-[illegible] একটী বড় চারাকে উদরস্থ করিতে পারে। প্রথমতঃ উহারা পাতা [illegible] তাহার গ্রন্থী হইতে কাণ্ড পর্য্যন্ত খাইয়া ফেলে। তীব্র তামাকের [illegible] গুঁড়া অথবা কাঠের ছাই গাছের গোড়াও পাতার উপর [illegible] দিলে অনেক পরিমাণে ইহারা দমনে থাকে। চারাগুলি যতদিন [illegible] শৈশবাবস্থায় থাকে, ততদিন উহাদিগকে ভয় করিতে হয়।

গাছগুলি কোন রকমে ৮।৯টী পাতাবিশিষ্ট হইয়া লতাইতে আরম্ভ করিলে আর তত ভয়ের কারণ থাকে না। দিনের মধ্যে দুই-তিনবার উক্ত পোঁকাগুলিকে ধরিয়া মারিয়া ফেলিতে পারিলেও অনেক সুবিধা হয়।

মাদাতে যে কয়েকটী বীজ বপন করা গিয়াছিল, তৎসমুদায়ই যদি অঙ্কুরিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রতি মাদাস্থিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট, সবল ও সুপুষ্ট গাছটী মাত্র রাখিয়া অপরগুলিকে তুলিয়া ফেলিয়া দিবে। এক মাদায় একটীর অধিক গাছ কোন মতে রাখা উচিত নহে।

মাদায়-পুষ্করিণীর পাঁক, গোয়াল-বাড়ীর আবর্জ্জনা ও পোড়া মাটি দিয়া বীজ পুতিলে গাছের বিপুল তেজ হয় ও তাহাতে বিস্তর ফল জন্মে।

এক্ষণে মধ্যে মধ্যে গাছের গোড়া খুড়িয়া দেওয়া ভিন্ন কোন পাট নাই। ক্ষেত্র রসা থাকিলে আদৌ জল দেওয়ার আবশ্যক হয় না। বৈশাখ-জৈষ্ঠ্য মাসে ফল পাকিয়া থাকে। ফল টাঙ্গাইয়া রাখিলে অনেক দিবস তাজা থাকে।

যে জাতীয় তরমুজের ছাল পাৎলা, শস্ত পুরু ও বেলে, এবং অভ্যন্তর রস-পূর্ণ ও লাল তাহাই উৎকৃষ্ট তরমুজ। মোটা ছালবিশিষ্ট সাদা তরমুজ তাদৃশ ভাল নহে।

ক্ষেত্র হইতে তরমুজ তুলিয়া আনিয়াই না খাইয়া, বরং উহাকে কয়েক ঘণ্টা শীতল জলে ডুবাইয়া রাখিবার পরে কাটিয়া খাইলে উত্তম লাগে।

নিম্নবঙ্গের মধ্যে গোয়ালন্দে উত্তম ও বৃহদাকার তরমুজ জন্মিয়া থাকে। পশ্চিম অঞ্চলেও ইহার আবাদ হয়। দ্বারবঙ্গের অন্তর্গত রাজনগরের সন্নিকটস্থ কমলা নদীর কিনারায় বৃহদাকার ও অতি সুমিষ্ট তরমুজ

জন্মে। ইহার শাঁস লাল ও সুকোমল এবং ওজনে প্রায় পনর সের হয়। পূর্ব্বে আমার ধারণা ছিল যে, গোয়ালন্দের সন্নিহিত অঞ্চলের তরমুজই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, কিন্তু কমলা নদীর চর ও সৈকতের সংলগ্ন ক্ষেতে যেরূপ সুস্বাদ, সুমিষ্ট ও শাঁসাল তরমুজ দেখিয়াছি ও খাইয়াছি, তাহাতে সে ভ্রম দূর হইয়াছে।

খেঁড়ো (Melon sp.)

খেঁড়ো এক প্রকার তরমুজ জাতীয় ফল। ইহার গাছ লতানিয়া। সচরাচর বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্দ্ধমান জেলায় ইহার আবাদ হইয়া থাকে। ফলের আকার লাউ বা কুমড়ার ন্যায়, বীজগুলি প্রায় তরমুজের ন্যায়। কচি ও পরিপুষ্ট অবস্থার আনাজরূপে ব্যঞ্জনে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু পাকা অবস্থায় শাঁস শক্ত হইয়া যায়, সুতরাং ব্যঞ্জনে ব্যবহার করা চলে না। ফল পাকিয়া গেলে গবাদি পশুদিগকে সিদ্ধ করিয়া খাইতে দিতে হয়।

আবাদ-প্রণালী তরমুজের ন্যায়। কার্ত্তিক মাসে বীজ বপন করিতে হয়। মাটির উর্ব্বরতানুসারে ৫।৬ হাত হইতে ৮।১০ হাত ব্যবধানে মাদা করিয়া প্রত্যেক মাদায় ৩টী বীজ বপন করিতে হয়। সরস মাটিতে ৫।৬ দিনের মধ্যে বীজ অঙ্কুরিত হয়। চারাগুলি ৬।৭টী পাতা-যুক্ত হইলে গোড়ায় মাটি উচ্চ করিয়া দিতে হয়। চৈত্র-বৈশাখে গাছ সকল ফল ধারণ করে।

খরমুজা (Musk-melon)

লক্ষ্ণৌ জেলায় যে খরমুজা জন্মে তাহা সুগন্ধ, মিষ্টতা ও কোমলতার জন্য চিরপ্রসিদ্ধ। বাঙ্গালা দেশেও খরমুজা জন্মিয়া থাকে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত স্থানের ন্যায় সুমিষ্ট সুগন্ধবিশিষ্ট হয় না। প্রতি বৎসর লক্ষ্ণৌ-জাত খরমুজার বীজ বপন করিলে কতকটা তদনুরূপ ফল হইয়া থাকে, কিন্তু সেই বীজোৎপন্ন ফলের বীজ পুনরায় বপন করিলে ফলের আকার ছোট হয় এবং সে সকল গুণও কমিয়া যায়।

চব্বিশ পরগণা, হুগলী, বর্দ্ধমান বা পূর্ব্ব-বাঙ্গাল দেশ অপেক্ষা পাটনা, দারভাঙ্গা মুর্শিদাবাদে যথেষ্ট খরমুজ জন্মে। পূর্ব্বোক্ত স্থানসমূহের ফল তত নিকৃষ্টতা প্রাপ্ত হয় না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমি লক্ষ্ণৌ হইতে বীজ আনাইয়া রৈইস্‌বাগে (মুরসিদাবাদ) আবাদ করিয়াছিলাম, তাহার ফল মন্দ হয় নাই, কিন্তু লক্ষ্ণৌ-জাত ফলের যেরূপ সুগন্ধ, তাহাতে তাং কিছু কম বোধ হইয়াছিল। পাটনা জেলায় অতি সুন্দর খরমুজা জন্মে। উক্ত জেলার মধ্যে মোকামা নামক স্থানে যে খরমুজা জন্মে, তাহা ওজনে প্রায় ৫ সের পর্য্যন্ত হয় এবং তাহার শাঁস যেমন পুরু, আস্বাদ তেমনি মিষ্ট, আঘ্রাণ তেমনি মনোহর।

চর বা বিল জমির জল নামিয়া গেলে বা শুকাইয়া গেলে তাহাতেই খরমুজার আবাদ করা প্রশস্ত। যে জমিতে তরমুজ ভাল জন্মে তাহাই খরমুজার উপযোগী। খরমুজার জমি অপেক্ষাকৃত শুষ্ক হওয়া প্রয়োজন। তরমুজের জমির ন্যায় খরমুজার জমির পাট করিতে হয় এবং যথোপযুক্ত পরিমাণে সার দিয়া তিন হাত অন্তর শ্রেণী করিয়া তিন হাত অন্তর মাদার মধ্যে বীজ বপন করিবে। প্রতি মাদায় ২।৪টি বীজ দিলেই যথেষ্ট। অগ্রহায়ণ মাস বীজ বপনের সময়। ৮।১০ ঘণ্টাকাল বীজগুলিকে

ভিজাইয়া লইলে ৩।৪ দিনের মধ্যে অঙ্কুরোদগম হয় নতুবা ৭।৮ দিন বিলম্ব হয়।

প্রতি মাদায় একাধিক চারা জন্মিলে সবল ও পরিপুষ্ট চারাটী রাখিয়া অপরগুলিকে তুলিয়া ফেলিয়া দিবে। খরমুজা গাছে প্রায় জলসেচন করিতে হয় না, তবে সমুচ্চ ও পাহাড়ী দেশে প্রয়োজন মত জল সেচন করা আবশ্যক। গাছে ফল ধরিলে লতায় আর ফেঁকড়ী বাহির করিতে দেওয়া উচিত নহে। নূতন শাখা বা ফেঁকড়ি মুখরিত হইলেই ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে কিন্তু আসল ডগাটি ভাঙ্গা উচিত নহে। ফল বড় করিতে হইলে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক কয়েকটীমাত্র বিশিষ্ট ফল গাছে রাখিয়া অবশিষ্ট গুলিকে ত্বরায় ভাঙ্গিয়া দিতে হয়।

চৈত্র মাস হইতে ফল পাকিতে আরম্ভ হয়। ফল পাকিলে অতি সুগন্ধ বাহির হয়। বর্ষাকাল পর্য্যন্ত গাছ জীবিত থাকে কিন্তু তখন গাছের ফল ধরিলে ফলের নিম্নে ইষ্টক বা টালি পাতিয়া দিতে হয় নতুবা ঠাণ্ডা লাগিয়া ফল পচিয়া যায়।

ফুটি (Melon sp.)

তরমুজ, কাঁকুড় প্রভৃতির ন্যায় নদীর চর, বিল বা পলি-পড়া জমিতে ফুটির আবাদ করা প্রশস্ত। মাঘ মাসে জমিতে তিন চারিবার লাঙ্গল ও মই দিয়া মাটি তৈয়ার করিতে হয়। অতঃপর ক্ষেত্রের মধ্যে ৩।৪ হাত ব্যবধানে মাদা করিয়া প্রতি মাদায় ৩।৪টী বীজ বপন করিবে। বপনের পূর্ব্বে বীজগুলিকে দ্বাদশ ঘণ্টাকাল আন্দাজ জলে ভিজাইয়া রাখিবার পর মাদায় বপন করিতে হইবে। গাছের গোড়ার মাটি না কঠিন হইয়া যায়, এজন্য মধ্যে মধ্যে নিড়ানি করা আবশ্যক। গাছ বড় হইয়া উঠিলে আর কোন পাটের বিশেষ প্রয়োজন হয় না।

বৈশাখ মাস হইতে গাছে ফল ধরিতে আরম্ভ হয়। ফল পাকিলে ফুটি ফাটিয়া যায় এবং তখনই উহা খাইবার সময়। সুপক্ক ফুটি চিনির সহিত খাইতে হয়। কাঁচা অবস্থায় কাঁকুড়ের ন্যায় ইহাতে তরকারী রন্ধন করিয়া খাওয়া যাইতে পারে।

টেঁপারী (Gooseberry)

কোমল শাখা-প্রশাখা-বিশিষ্ট ইহা একটী বারমেসে উদ্ভিদ। টেঁপারী গাছ প্রায় দুই হাত উচ্চ হয়। ইহার ফল সকলের নিকট উপাদেয় নহে, তবে ছোট ছোট ছেলেরা ইহা খাইয়া থাকে। সাহেবদিগের ইহা Desert fruit মধ্যে পরিগণিত।

গামলায়, বাক্সে অথবা হাপোরে ভাদ্র মাসে বীজ পাত দিয়া চারা উৎপন্ন করতঃ চারাগুলি ৪।৫ অঙ্গুলি বড় হইলে পটিতে রোপণ করিতে হয়। আশ্বিনের শেষ ভাগ হইতে কার্ত্তিকের প্রথম ভাগ মধ্যে রোপণ-কার্য্য শেষ করিতে হয়। ইহার বীজ অতিশয় ক্ষুদ্র, এজন্য একবারে বপন করিলে সুবিধা হয় না। গামলা বা ভাঁটিতে হাল্‌কা মাটি দিয়া যথানিয়মে বীজ বপন করিলে যে চারা জন্মিবে, তাহা ৪।৬ অঙ্গুলি বড় হইলে ক্ষেত্রে তিন ফুট অন্তর শ্রেণী করিয়া তন্মধ্যে দুই হাত অন্তর এক-একটী চারা পুতিতে হয়। চারা গাছগুলি আধ হাত উচ্চ হইলে তাহাদিগের গোড়ায় মাটি উচ্চ করিয়া দিতে হইবে। চৈত্র মাসের শেষ ভাগ হইতে ফল পাকিতে আরম্ভ হয়। শাখা-প্রশাখা লম্বিত হইয়া গেলে ডগা কাটিয়া দেওয়া উচিত কারণ তাহা হইলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক শাখা জন্মে ও ফল অধিক হয়। কিন্তু ফলের আকার বড় করিতে হইলে কতকগুলি কেঁকুড়ি ভাঙ্গিয়া দেওয়া উচিত। ফল ধরিতে আরম্ভ

হইলে গোড়ায় তরল-সার দিলে ভাল হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ পর্য্যন্ত ফল পাওয়া যায়। সময়ে সময়ে গাছের অর্দ্ধ-পক্ক ডগা কাটিয়া রোপণ করিলে চারা জন্মে এবং যথাসময়ে ফল প্রদান করে।

শাঁখালু (Pachyriza)

শাঁখালু,—ফলের মধ্যে গণ্য। লতার মূলদেশে ইহা জন্মিয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে ইহা গাছের অন্তর্ভৌম কন্দ মাত্র। ইহার উপরিভাগের ছাল ও ভিতরের সার অংশ শ্বেত বর্ণের। কন্দগুলি প্রায় শঙ্খের ন্যায় বলিয়া বোধ হয় ইহার নাম শাঁখালু হইয়াছে।

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে ক্ষেত্রে মাদা করিয়া বীজ বুনিতে হয়। প্রথমতঃ ক্ষেত্রকে উত্তমরূপে চষিয়া, পরে তাহাতে দুই হাত অন্তর এক একটী গর্ত্ত করিয়া মাটি চূর্ণ এ সারমিশ্রিত মাটি দ্বারা গর্ত্তগুলি পূর্ণ করতঃ তাহাতে বীজ পুতিতে হইবে। গর্ত্তগুলি দেড় হাত গভীর ও এক বা দেড় হাত ব্যাসযুক্ত হওয়া আবশ্যক, কেন না মাটি যত আল্‌গা থাকিবে, ততই উহার মূল বড় হইবে। নিচু বা রসা জমিতে কন্দ তত মিষ্ট হয় না কিন্তু সরস দো-আঁশ মাটিতে কন্দ যত উৎপন্ন হয় তাহা তত কোমল হয় না। প্রত্যেক মাদায় ফাঁক ফাঁক করিয়া দুইটী বীজ পুতিতে হয়। চারা জন্মিলে প্রতি মাদায় একটীর অধিক গাছ রাখা উচিত নহে। চারা উদ্গত করিতে হইলে, আবশ্যক মত জলসেচন করিবে এবং মধ্যে চারাগুলিকে নিড়ান করিয়া দিবে। ইহার লতা বৃহদাকার হইয়া থাকে, সুতরাং অতি ঘনভাবে মাদা করিবে না, অথবা একটী মাদায় একটীর অধিক গাছ রাখিবে না। বর্ষা সমাগত হইলে গাছে আর জল দিতে হয় না, কিন্তু এই সময়ে যাহাতে ক্ষেত্রে অগাছা জঙ্গল জন্মিতে না

পারে, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে এবং গাছের গোড়ায় মাটি উচ্চ করিয়া দিবে।

শীতকালে লতা সমুদায় বিবর্ণ ও নির্জীব হইয়া আসে। সেই সময় কন্দ উঠাইয়া লইবার সময়। কয়েক মাস মধ্যেই উহা খাইবার উপযোগী হইয়া উঠে। কন্দ না উঠাইলে পর বৎসর পুনরায় তাহা হইতে নূতন গাছ উদ্গত হয় এবং সেই মূল বড় হইতে থাকে, কিন্তু দুই তিন বৎসরে কন্দের শস্য ছিব্‌ড়া-বিশিষ্ট হয় সুতরাং তাহা খাইয়া আরাম পাওয়া যায় না। এজন্য প্রতি বৎসর বীজ বপন করিয়া বৎসর মধ্যেই কন্দ ব্যবহার করা উচিত। দুই তিন বৎসর যে কন্দ মাটিতে থাকিতে পায় তাহা ১০। ১৫ সের পর্য্যন্ত ওজনের হইতে দেখা গিয়াছে।

ষ্ট্রবেরী (Strawberry)

ষ্ট্রবেরী বিলাতী ফল, কিন্তু ইদানীং এদেশে কোন কোন সৌখিনের বাগানে অল্পাধিক পরিমাণে জন্মিতে দেখা যায়। ইহার গাছগুলি আধ হাত উচ্চ হইয়া থাকে। গাছের আকার আমরুল গাছের ন্যায়, পত্রের ধরণ অনেকটা গোলাপ পাতার ন্যায়। উদ্ভিদ্ শাস্ত্রানুসারে ইহা গোলাপের সহিত সমশ্রেণীর অন্তর্গত। কয়েক বৎসর উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ হইতে ইহার কতকগুলি চারা আনয়ন করিয়া রাজনগরে (দ্বারভাঙ্গা) ইহার আবাদ করিয়াছিলাম।

আশ্বিন মাসের মধ্যভাগে ষ্ট্রবেরিগাছ রোপণ করিবার সময়। রোপণ করিবার অন্ততঃ এক মাস পূর্ব্বে জমি গভীররূপে কোদলাইয়া, তাহার মাটি চূর্ণ করতঃ ইহা হইতে তাবৎ ঘাস, মুথা ও আগাছার শিকড় উত্তম-

রূপে বাছিয়া ফেলিতে হয়। ষ্ট্রবেরী,—পটিতে রোপণ করিতে হয়। পটির প্রস্থ ৩-হাত হওয়া উচিত।

গাছ রোপণ করিবার ৪।৫ দিন পূর্ব্বে পূর্ব্বকৃত পটির মধ্যে গর্ত্ত করিয়া গর্ত্তের মাটির সহিত খোঁয়াড় বা আস্তাবলের পুরাতন আবর্জ্জনার সহিত পাতা-সার মিশাইয়া মাটি উত্তমরূপে চূর্ণ করতঃ উক্ত গর্ত্ত পূর্ণ করিয়া রাখিতে হইবে। প্রত্যেক পটির দীর্ঘ ভাগে তিনটী করিয়া শ্রেণী হইবে এবং সেই শ্রেণীর মধ্যে নয়-ইঞ্চ বা একবিতস্তি ব্যবধানে এক-একটী গর্ত্ত করিতে হইবে। পটিগুলি ছয় হইতে আট ইঞ্চ গভীর ও তাহার পরিধি তদনুরূপ হওয়া উচিত। যে দিন গাছ রোপণ করিতে হইবে, সেই দিন প্রাতঃকালে পূর্ব্বকৃত সারিমিশ্রিত গর্ত্তের মাটি একবার উলটপালট করিয়া দেওয়া আবশ্যক। অনন্তর অপরাহ্নে প্রত্যেক গর্ত্তের মাটি ঈষৎ চাপিয়া দিয়া এক একটী গাছ যত্নসহকারে পুতিয়া দিতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে জলসেচন করিতে হইবে। গাছ রোপণের দুই এক দিন পূর্ব্বে যদি বৃষ্টি হইয়া গিয়া থাকে তাহা হইলে মাটি কর্দ্দমাক্ত হইয়া থাকিবে, সুতরাং সে সময় গাছ রোপণ না করিয়া আরও দুই চারি দিন অপেক্ষা করিতে হইবে। মাটির অবস্থা ঝুরা হইলে গাছ রোপণ করিয়া আরাম পাওয়া যায় এবং গাছ সকলও রোপিত হইয়া আরাম পায়। গাছ রোপণ করা হইলে দুই-চারি দিবস দিনের বেলায় গাছগুলিকে রৌদ্র হইতে রক্ষা করিবার জন্য কলার পেটো দিয়া ঢাকিয়া রাখা এবং সায়ংকালে খুলিয়া দেওয়া উচিত। অনন্তর সকালে ও বৈকালে জলসেচন করিলে এবং রৌদ্রের সময় ঢাকিয়া রাখিলে পাঁচ সাত দিবসের মধ্যে গাছগুলি মাটিতে লাগিয়া যাইবে। তখন ইহাদিগকে অন্যান্য গাছের ন্যায় পাট করিলেই চলিবে।

ষ্ট্রবেরি গাছ অতিশয় জলপিপাসু, এজন্য যাহাতে ইহার কোনরূপে

জলের অভাব না হয়, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। গাছ রোপণ করিবার সময় যদি মাটিতে সার না-দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে এক্ষণে গাছের গোড়ায় সার দিয়া মৃত্তিকার সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া দিতে হইবে। যথানিয়মে সেবা করিলে অগ্রহায়ণ মাসের শেষাংশেই প্রত্যেক গাছ হইতে কতকগুলি গাছ বাহির হইয়া প্রত্যেকটী ঝাড়ে পরিণত হইবে।

মাঘ মাসের শেষভাগ হইতে ষ্ট্রবেরি গাছে ফুল ধরে এবং সেই ফুল হইতেই দুই-দশটা সুপক ফল পাওয়া যায়। ষ্ট্রবেরি গাছে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ পর্য্যন্ত ফল ফুল থাকে, কিন্তু বর্ষা পড়িলে আর ফল হয় না। ষ্ট্রবেরি ফল দেখিতে অনেকটা লিচু ফলের ন্যায় কিন্তু তাহা অপেক্ষা সমধিক মনোহর। আস্বাদ অম্লমধুর ও রসনা তৃপ্তিকর ইহার বীজগুলি টেপারি বীজের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র।

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে ষ্ট্রবেরি গাছের গোড়া হইতে দড়ী অর্থাৎ সুদীর্ঘ লতাবৎ ফেঁকড়ি বাহির হয়। ইহাদিগকে ইংরাজীতে Runners বলে। ইহাতে আপাততঃ পাতা থাকে না কিন্তু দুই একটী করিয়া গ্রন্থি থাকে এবং তাহাতে ছোট ছোট চারা গাছ থাকে। দড়া মাটি স্পর্শ করিলে প্রত্যেক গ্রন্থি হইতে শিকড় বাহির হইয়া ভূগর্ভ মধ্যে প্রবেশ করে, পরে প্রত্যেকটী স্বতন্ত্র গাছে পরিণত হয়। আশ্বিনের শেষভাগে এই সকল চারা গাছ স্বতন্ত্র করিয়া আবার স্থানান্তরে রোপণ করিতে পারা যায়। এই সকল ফেঁকড়ি হইতে যে গাছ জন্মে, তাহাদিগকে তথা হইতে উঠাইয়া না-লইলে পটীগুলি আগাছাপূর্ণ হইয়া যায়। সুতরাং তাহাতে ফল হওয়া সুদূরপরাহত হইয়া পড়ে।

দ্বিতীয় বৎসর ইহাদিগকে উত্তমরূপে পাট করিতে হইবে। বর্ষাকালে পটিতে জল না দাঁড়াইতে পারে তাহার সুব্যবস্থা করা বিশেষ প্রয়োজন।

বর্ষার প্রাক্কালে গাছগুলিকে জমি হইতে উঠাইয়া কোন আবৃত স্থানে ছাপোর দিয়া রাখিতে পারিলে খুব ভালই হয় কারণ ইহারা বর্ষার জল বড় সহ্য করিতে পারে না। পরে কার্ত্তিক মাসে যথানিয়মে পটিতে রোপণ করা চলে। তাহা ব্যতীত পৌষ মাসে প্রত্যেক গাছের গোড়ায় পক্ষান্তরে একবার করিয়া তরল সার দিতে পারিলে আরও ভাল হয়। আমি ইহাতে যে তরল সার ব্যবহার করিতাম তাহা অস্থিচূর্ণের সহিত গোবর বা সর্ষপ খৈল সমভাগে মিশ্রিত ও উত্তমরূপে বিগলিত করিয়া লইতাম। উক্ত তরল সার গাছে দেওয়ায় গাছের অবয়ব যেমন সুশ্রী ও পরিপুষ্ট হয়, ফলও তেমনি অপরিমিত হয় এবং বড় বড় হয়। অনেক ফল ওজনে দুই ভরি হইয়া থাকে এবং ফল বড় হইলে লিচু বলিয়া ভ্রম হয়।

গামলায় পালন।—কার্ত্তিক মাসে মাটির গামলায় বা কাঠের বাক্সে ৩।৪টী করিয়া চারা রোপণ করিলে যথাসময়ে তাহারা প্রদান করে, কিন্তু বর্ষার পূর্ব্বেই তাহাদিগকে আবৃত স্থানে রক্ষা করা প্রয়োজন এবং পুনরায় কার্ত্তিক মাসে নূতন পাত্রে নূতন মাটিতে যথানিয়মে রোপণ করিতে হয়।

কেশুর (Eclipta Eredta)

কেশুর, কেশুতী ও কেশুরী—তিন নামেই ইহা অভিহিত হইয়া থাকে। কেশুর এক প্রকার মুথা ঘাসের ন্যায় গেঁড়বিশিষ্ট কিন্তু জলজ উদ্ভিদ। খাল, বিল ও পুষ্করিণীর কিনারায় বর্ষাকালে জন্মিয়া থাকে। যে সকল নাবাল জমিতে জল দাঁড়ায় তথায় কিম্বা পুষ্করিণী ও বিলের কিনারায় জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে গেঁড় পুঁতিয়া দিলে দুই একটা বর্ষার জল পাইলেই গাছ বাহির হয়। স্রোতের জল অপেক্ষা স্থির অর্থাৎ আবদ্ধ

জলে ও পঙ্কিল মাটিতে ভাল জন্মে। আবদ্ধ জল যেমন-যেমন বাড়িতে থাকে, গাছও সেই সঙ্গে বাড়িয়া উঠে। কাঁচা ফলের ন্যায় কেশুরের গেঁড় খাইতে হয়। শীতকালে গাছ মরিয়া যায় এবং তখনই গেঁড় আহরণ করিতে হয়। গেঁড় তুলিয়া না লইলে আবার পরবর্তী বর্ষাকালে সেই স্থানে আপনা হইতে নূতন গাছ জন্মে। ইহার জন্য বিশেষ কিছু পাট নাই।

পঞ্চদশ অধ্যায়

প্রদর্শনী

আজকাল কলিকাতা ও বাঙ্গালাদেশের নানাস্থানে কৃষি-প্রদর্শনী হইয়া থাকে। এই সকল প্রদর্শনীতে নানাবিধ ফল, সব্জী উদ্যান ও ক্ষেত্রজাত অন্যান্য দ্রব্য প্রদর্শিত হয় এবং উৎকৃষ্ট সামগ্রীর জন্য প্রদর্শকগণ পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এরূপ প্রদর্শনীর সব্জী যখন একটা অঙ্গ, তখন এ পুস্তকে তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু না বলিলে পুস্তকের অসম্পূর্ণতা থাকিয়া যায়।

প্রদর্শনীতে জিনিষ প্রদর্শন করিবার কয়েকটী বিশেষ নিয়ম আছে কিন্তু তাহা সাধারণের জানা না থাকায় অনেক সময় প্রদর্শিত দ্রব্য পারিতোষিক পাইবার অযোগ্য হইয়া থাকে। সুতরাং যাঁহারা প্রদর্শনীতে জিনিস পাঠাইতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদিগের পক্ষে সেই নিয়মগুলি জানিয়া রাখা বিশেষ প্রয়োজন।

কোন জিনিষ পাঠাইবার পূর্ব্বে প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষকে অগ্রে জানাইতে হয় এবং তাঁহাদিগের খাতায় প্রদর্শকের নাম এবং কোন্ শ্রেণীতে কোন দ্রব্য প্রদর্শন করিবেন ইত্যাদি লিখাইয়া দিতে হয়। পরে তাঁহারা এ সমুদায় বিশেষ বিবরণ লিখিয়া লইয়া টিকিট দেন। সেই টিকিট অনুসারে দ্রব্য সাজাইতে হয়। জিনিষগুলি এরূপভাবে সাজাইতে হইবে যে, সকল জিনিস যেন স্পষ্টরূপে দেখা যায় এবং সাজাইবার প্রণালী নয়নরঞ্জক হয়।

সব্জী ও তরি-তরকারির মধ্যে কোন ফল-পাকুড় থাকা উচিত নহে। যে সকল ফল কাঁচা খাওয়া

যায় কিন্তু এমন অনেক ফল আছে, যাহা রন্ধন করিয়া খাওয়া যায় বলিয়া উহাদিগকে সব্জীর শ্রেণী মধ্যে কোন মতে গণ্য করা উচিত নহে। আবার কাঁকুড়, মূলা, টমেটো প্রভৃতি কাঁচা অবস্থায় খাওয়া চলে, তাহা বলিয়া ইহাদিগকে ফল বলা যায় না। এইরূপে ভ্রমক্রমে সব্জীর সহিত কোনও ফল মিশাইয়া দিলে প্রদর্শিত দ্রব্য পারিতোষিকের অযোগ্য হইয়া যায়।

তরকারীর আকারের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে চলিবে না। অনেকে মনে করেন যে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আকার হইলেই যথেষ্ট কিন্তু তাহা ভ্রম। প্রত্যেক সব্জীরই গুণবিশেষের জন্য আদর হয় এবং সেই গুণ সব্জী মধ্যে থাকা প্রয়োজন। আকারের সঙ্গে গুণের সামঞ্জস্য রাখিতে হইবে। বাঁধাকপি প্রকাণ্ড আকারবিশিষ্ট হইলে চলিবে না। উহার ভিতর নীরেট ও দৃঢ় হওয়া আবশ্যক। ফুলকপির ফুল বড়, দৃঢ়, শুভ্র, নয়নরঞ্জক ও অপ্রস্ফুটিত হওয়া উচিত। মূলা, শালগম, গাজর প্রভৃতি অতিরিক্ত বড় হইলে ছিবড়াবিশিষ্ট হয় সুতরাং অতিরিক্ত বড় করিবার দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া যাহাতে কোমল ও সুস্বাদ হয়, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। অনেক সব্জী কচি অবস্থায় জলীয়াস্বাদ বা পানসে হয়, সুতরাং তাহাদিগের পূর্ণাবস্থা ভাল। প্রদর্শনীর যোগ্য আলুগুলি সুঠাম, নীরোগ ও সুদৃশ্য হওয়া স্পৃহনীয়।

এতদ্ব্যতীত প্রদর্শকগণের মধ্যে আর একটী ভ্রম দেখা যায়। প্রদর্শনীর তালিকায় দেশী সব্জীর কথা লেখা থাকিলেও তাঁহারা দেশী সব্জীর সহিত বিলাতী সব্জী দিয়া থাকেন, কিম্বা বিলাতী সব্জীর স্থানে দেশী সব্জীও মিশাল দেন। ইহাতেও প্রদর্শিত দ্রব্য পারিতোষিকের অযোগ্য হয়। এই সকল বিষয় বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক প্রদর্শনীতে জিনিষ পাঠাইতে হয়।

প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য ও উপকারিতা

আজও পর্য্যন্ত এদেশে অনেকে প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য ও উপকারিতা উপলব্ধি করিতে পারেন না। প্রদর্শনীতে বিস্তর লোকের সমাগম হয়, কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ রং তামাসা দেখিতে যান, কেহ বা অদ্ভুত সামগ্রী দেখিয়াই সন্তোষ লাভ করেন। উল্লিখিত উদ্দেশ্যে যাঁহারা প্রদর্শনী দেখিতে যান, তাঁহাদিগের তথায় যাওয়া-না-যাওয়া একই কথা, কেন না ইহাতে প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য সংসাধিত হয় না। প্রদর্শনীর মূল উদ্দেশ্য—নানাস্থানের নানাবিধ দ্রব্য নানা লোকের শ্রম ও শিল্পজাত সামগ্রী একস্থানে সংগৃহীত হইলে প্রদর্শকগণের মধ্যে প্রতিযোগিতার ভাব উদ্রিক্ত হয়। অনেক জিনিস একত্রে সমাবিষ্ট না হইলে কোন জিনিষের দোষগুণ বিচার হয় না। এই সকল কারণে প্রদর্শনী মাত্রই জ্ঞানলাভের কেন্দ্রস্বরূপ মনে করা উচিত। শত পুস্তক পাঠ করিয়াও যে জ্ঞানলাভ হয় না, একটী প্রদর্শনী দর্শনে তাহাপেক্ষা অধিক জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। যিনি প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করেন, যিনি প্রদর্শনীর উদ্যোগী, যিনি সাহায্যকারী ইহাদিগের সকলেই প্রসংসার্হ। প্রদর্শনী মাত্রই জাতীয় আয়বৃদ্ধির অমোঘ উপায় বলিয়া জানিতে হইবে।

যাঁহারা তথায় জিনিষ পত্র প্রদর্শন করেন, তাঁহারা সকলেই দেশের হিতকাঙ্ক্ষী। যিনি প্রদর্শনী দেখিয়া কিঞ্চিন্মাত্রও শিক্ষালাভ করেন, তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী।

কলিকাতায় উপনগরীতে দুইটী কৃষি-পুষ্প-প্রদর্শনী হইত। তাহাতে ক্ষেত্রজাত নানাবিধ সব্জী, ফুল এবং গাছপালা প্রদর্শিত হইত। দুইটী প্রদর্শনীর, একটী আলিপুর সোসাইটীর বাগানে, অপর সাত-

পুকুরের বাগানে অধিষ্ঠিত হইত। আলিপুরের প্রদর্শনী এখনও প্রতি-বৎসর অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রদর্শনী সাধারণের অর্থ সাহায্যে অর্থাৎ আলিপুর কৃষি-ও-উদ্যান-সমিতির উদ্যোগে সম্পন্ন হয়। সাতপুকুরের বাগানে যে প্রদর্শনী হইত তাহা কাশীপুর হর্টিকলচারাল ইনষ্টিটিউসনের ওরফে ৺হেমচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের উদ্যোগে ও অর্থব্যয়ে হইত। ৺হেমচন্দ্র মিত্র মহাশয় স্বোপার্জ্জিত বিপুল অর্থ উক্ত মেলা উপলক্ষে প্রতি বৎসর ব্যয় করিতেন। এজন্য তিনি সাধারণের ধন্যবাদের পাত্র। প্রতি বৎসর ফেব্রুয়ারি মাসে এই মেলায় অধিবেশন হইত। কয়েক বৎসর হইল হেমচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের দেহত্যাগ হওয়ায় তৎপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় ও প্রদর্শনী—উভয়েরই তিরোভাব হইয়াছে। কলিকাতা ও তাহার উপকণ্ঠে এত ধনাঢ্য ব্যক্তি থাকিতে হেমবাবুর কীর্ত্তি বিলুপ্ত হইল ইহা বাঙ্গালী জাতির কলঙ্ক।

আজ কাল সহরেই কি, মফঃস্বলেই কি, সব্‌জী যেরূপ দুষ্প্রাপ্য তাহাতে আমাদিগের ধারণ যে, সব্‌জী উৎপাদন একটী বিশেষ লাভজনক ব্যবসা। আমার দুই একটী বিশেষ বন্ধু সব্‌জীর আবাদ করিয়া বেশ দুই পয়সা রোজগার করেন। এই ব্যবসায় অল্প পুঁজিতে আরম্ভ করা যাইতে পারে। ক্ষেত্রজাত সব্‌জী ও তরি-তরকারী নগদ বিক্রয় হয় এবং ফড়েগণ আসিয়া ক্ষেত হইতেই জিনিষ লইয়া যায়, সুতরাং ইহাতে বিলাত বা বাকী পড়িবার আশঙ্কা অতি অল্প। যাহাতে বিলাত পড়িবার আশঙ্কা নাই এবং ফসল জন্মিলেই নগদ পয়সার আমদানী হইয়া থাকে, সে ব্যবসায় অতি অল্প মূলধনেই আরম্ভ করা যাইতে পারে। তবে ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে বাজারে যত শীঘ্র জিনিষ আমদানী করিতে পারা যায় তত অধিক লাভের সম্ভাবনা। বাজারে যে জিনিষের নূতন আমদানী হয় তাহা লোকে আগ্রহ সহকারে অধিক মূল্য দিয়া খরিদ করে এবং যত দিন যায়, অর্থাৎ যতই সে

সব্‌জী পুরাতন হয় ও তাহার অধিক আমদানী হয়, তত তাহার দাম কমিয়া যায়। আমাদিগের নিজের এ বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। তাই বলি সব্‌জী উৎপাদন ও বিক্রয় বড়ই সুবিধাজনক। তবে একটী ও শেষ কথা এই যে, ইহাতে যথেষ্ট অধ্যবসায় থাকা যেমন প্রয়োজন, কষ্ট সহিষ্ণুতাও ততোধিক আবশ্যক।

তরি তরকারীর আবাদ করিয়া চাষীগণ সুস্থমনে দিনাতিপাত করে এবং তাহারা সকলেই মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের অপেক্ষাও সুখে স্বচ্ছন্দে জীবিকানির্ব্বাহ করে।

সম্পূর্ণ